কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

বারো মাসের

করণীয় বর্জনীয়

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

কুরআন সুন্নাহর আলোকে

বারো মাসের

করণীয় বর্জনীয়

কুরআন সুন্নাহর আলোকে

বারো মাসের করণীয় বর্জনীয়

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

উলুমুল হাদিস, মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া, ঢাকা

মুশরিফ, ইফতা বিভাগ, জামেয়া মাহমুদিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

কালান্তর প্রকাশনী

ষষ্ঠ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রকাশকাল : ১ জুলাই ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫০০, US $ 15, UK £ 10

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-8-2

Baro Maser Koronio Borjonio
by **Mufti Rezaul Karim Abrar**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

মাদরাসা সাময়িক বিরতি। ছাত্ররা চলে গেছে যার যার বাড়িতে। আমি থেকে গেলাম। দারস-তাদরিসের ব্যস্ততায় একাগ্রচিত্তে লেখার জন্য দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় না। তিন দিনে অনেক কাজ করা যাবে, এ আশায় বাড়ি যাইনি। বৃহস্পতিবার ফজর পর্যন্ত কাজ করি। দিনে ঘুমানোর ফুরসত পাইনি। মাগরিবের পর ঘুম চেপে ধরল। কমপিউটার বন্ধ করে, বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কিছু সময়ের মধ্যে হারিয়ে যাই ঘুমের রাজ্যে।

সে দিন স্বপ্নে আব্বাকে দেখি। আমি বাড়িতে গিয়েছি। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। লেখালেখির খবর নিলেন। *বারো মাসের করণীয় ও বর্জনীয়* সম্পর্কে তাঁকে বললাম। তিনি প্রাণভরে দুআ করলেন। কিছুক্ষণ পর মুআজ্জিনের সুমধুর সুরলহরিতে ঘুম ভেঙে গেল। উঠলাম। ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ৮টা। আমার শিয়রে শোভা পাচ্ছে আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলির লেখা *লাতায়িফুল মাআরিফ* ও আল্লামা আবদুল হাই লখনবির *আল-আসারুল মারফুআ* গ্রন্থদ্বয়।

শায়খুল হাদিস আল্লামা কুতবুদ্দীন জালালাবাদি রাহ.। আমার বাবা। আমি তাঁর সন্তান। আমার ধমনিতে তাঁর রক্ত বহমান। তিনি ছিলেন উসতাজুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসিন। নিভৃতচারী জ্ঞানতাপস। মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ.-এর বিশেষ স্নেহধন্য। নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে গড়েছেন স্বর্ণমানবের বিশাল কাফেলা। খ্যাতি, মোহ ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে আজীবন বিতরণ করেছেন হেরার আলো। শৈশব-কৈশোর ও যৌবন বড়দের ছায়ায় কাটিয়ে হয়েছেন বটবৃক্ষ। সে বটবৃক্ষের সংস্পর্শে থেকে গড়ে উঠেছেন সাবেক এমপি, খতিবে মিল্লাত আল্লামা আতাউর রহমান খান, মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা আবদুল্লাহ হরিপুরি, শায়খুল হাদিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কিশোরগঞ্জী রাহ., শায়খুল হাদিস আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ, শায়খুল হাদিস আল্লামা মাহমুদুল হাসান, মুনাজিরে ইসলাম আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলিপুরি, শায়খুল হাদিস মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া রাহ., দারুল উলুম করাচির নায়িবে মুফতি আল্লামা আবদুল মান্নান প্রমুখ।

আমি যখন প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র, আব্বা আমাদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরপারের যাত্রী হন। ইনতিকালের আগের রমজানে আমি বাড়িতে ছিলাম। সে রমজানে আমার

অনূদিত ও তাখরিজকৃত প্রথম গ্রন্থ *তারাবির নামাজ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনার* কাজ করেছি। কিছু কাজ তাঁর পাশে বসে করেছি। তিনি দুআ করেছেন; কিন্তু সেটি প্রকাশের আগেই আব্বার ডাক এসে যায়।

সময় তার গতিতে চলতে থাকে। আমরা ধীরে ধীরে শোক কাটিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হই। আব্বার ইনতিকালের পর তিন বছরে আমার লিখিত ও অনূদিত পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশ পেল। সেগুলো প্রকাশের পর বাবা হারানোর ব্যথাটা আমাকে চিনচিনে মোচড় দেয়। আব্বা থাকলে কত খুশি হতেন! চোখের অশ্রুতে সিক্ত করতেন গ্রন্থের পাতা। সারা জীবন তাঁর হাতেগড়া ছাত্রদের কাগুজে সন্তান নিয়ে গর্ব করতেন। যদি নিজের ঔরসজাত ছেলের কাগুজে সন্তান দেখে যেতে পারতেন, তাহলে তাঁর খুশির মাত্রা হতো শতগুণ।

আমার জীবনে আফসোস বলতে এই এক জায়গায়। আব্বাজান রাহ. আমার কোনো কাগুজে সন্তান দেখে গেলেন না! আশা রাখি, তাঁর রুহ হয়তো এ সংবাদ শুনে খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠবে। দুআ করি, আল্লাহ আব্বাজানের কবরকে রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন। তাঁর দেখানো পথে আমাদের আমৃত্যু চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আবরার বিন কুতবুদ্দীন
২ আগস্ট ২০১৭

লেখক-সম্পাদক, ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীর

দুআ

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় খুব স্পষ্টভাবে একটি বিষয় দেখা যায়, বিশেষ ইবাদত-বন্দেগিতে যারা আগ্রহী, যারা আমল, জিকির, দুআ ইত্যাদিতে আনন্দ পান, তাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ফজিলতপূর্ণ দিন, তারিখ, সময় ও মুহূর্ত বা তাৎপর্যময় দিবস ও রজনি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বছরের ১২ মাসের যখনই এ দিবস-রজনি, ক্ষণ ও মুহূর্ত আসুক আল্লাহর নৈকট্য, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভে আগ্রহী বান্দা এসবের খোঁজ ও কদর করেন। ইমানদার নারী-পুরুষের জন্য এসব খুবই আনন্দ ও উদ্‌যাপনের মুহূর্ত। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এসবের স্বরূপসন্ধান একটি প্রশংসনীয় ইলমি খিদমত। পাঠকের হাতের এ গ্রন্থ সে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সংকলিত।

এ গ্রন্থের অংশবিশেষ দেখে বুঝতে পেরেছি, যথেষ্ট পরিশ্রম করে বিশুদ্ধ উৎস থেকে লেখক এটি সংকলন করেছেন। বাংলাভাষী পাঠকের জন্য এটি খুব উপকারী সাব্যস্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে, এর লেখক মুফতি রেজাউল কারীম আবরার একজন প্রতিশ্রুতিশীল গবেষক আলিম। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। বিজ্ঞ আলিম মহলেও এসব গ্রন্থ আলোচিত হচ্ছে। আশা করি, তাঁর নতুন প্রয়াসটিও ব্যাপক সমাদৃত হবে। আমি লেখকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। তিনি নানা কারণেই আমার প্রিয়ভাজন এক প্রতিভাবান তরুণ। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ নেক ও ফলপ্রসূ কর্মময় জীবনের অধিকারী করুন।

নিত্যশুভার্থী
উবায়দুর রহমান খান নদভী
৭ জুলাই ২০১৭

প্রকাশকের কথা

আমাদের রাসুল ﷺ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল; আমরা হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। অন্যান্য উম্মত দীর্ঘ জীবন লাভ করত। নুহ আ. তো সাড়ে ৯০০ বছর উম্মতকে দীনের দাওয়াতই দিয়েছেন। আমরা যাতে স্বল্পসময়ে বেশি আমল করে তাঁদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারি, এ জন্য আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করে বিশেষ কিছু মাস, বিশেষ কিছু দিন ও রাত উপহার দিয়েছেন। সে মাস, দিন ও রাতে আমাদের সামান্য ইবাদতের বিনিময় আল্লাহ অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন।

আমল পরিশুদ্ধ হতে প্রধান শর্ত, তা রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া। কোনো বিশেষ দিন বা রাতকে ফজিলতপূর্ণ মনে করতে হলে দেখতে হবে, সে দিন বা রাতের কোনো ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত কি না। কোনো দিন বা রাতে বিশেষ সালাত বা রোজা রাখতে হলেও দেখতে হবে রাসুল ﷺ থেকে সেটা প্রমাণিত কি না।

আমাদের দেশে বিভিন্ন মাসের বহু আমল প্রচলিত আছে, কুরআন-হাদিসের সঙ্গে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। বহু বিদআতকে অনেক ভাই সাওয়াবের কাজ ভেবে আমল করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে কিছু অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সমাজে ব্যাপক সমাদৃত। প্রয়োজন ছিল এ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণালব্ধ কোনো গ্রন্থ রচনার। আল্লাহপাক মুফতি রেজাউল কারীম আবরার জালালাবাদিকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ তাআলা 'কালান্তর প্রকাশনী'র এ প্রয়াস কবুল করুন।

গ্রন্থটি অনেক দিন বাজারে ছিল না। মূলত সংস্করণের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম। কিছুটা দেরিতে হলেও আপনাদের হাতে এখন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। দলিলের ক্ষেত্রে আগে ইমামগণের বক্তব্যগুলো বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আরবিতেও ছিল; কিন্তু সাধারণ পাঠকের আপত্তির কারণে আরবি বাদ দিয়ে শুধু বাংলা রাখা হয়েছে। আর আমরাও চাই গ্রন্থটি ঘরে ঘরে পাঠ হোক, মসজিদের মিম্বারসমূহে শোভা পাক। যদিও সম্মানিত আলিমসমাজ ও মাদরাসার ছাত্রদের জন্য এটি উপকারী ছিল। আরবি রাখলে অবশ্য গ্রন্থটির কলেবর অনেক বেড়ে যেত, এতে মূল্যও বেড়ে যেত। অধিকাংশ হাদিসের ইবারতে আগে

হরকত ছিল না, এবার হরকত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাষা-বানানেও বেশ কাজ করা হয়েছে। যতটুকু সম্ভব ভাষা সাবলীল করা হয়েছে, প্রচলিত বানানরীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। শিরোনাম-উপশিরোনাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিন্যাস করা হয়েছে। যদিও উপশিরোনামের অধীনে আরও অনেক উপশিরোনাম আছে; কিন্তু সেগুলো সূচিতে উল্লেখ করা হয়নি। প্রতিটি আলোচনার দলিলগুলো নম্বর দিয়ে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে আলোচিত হাদিসেও ক্রমিক দিয়ে সাজানো হয়েছে। কিছু আলোচনা আগে প্রয়োজনের তাগিদে একাধিকবার এসেছিল, সেগুলো সমন্বয় করে এবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মাঝেমধ্যে কিছু বিষয় সংযোজনও করা হয়েছে। টীকা-রেফান্সেগুলোও আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো করে দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি গ্রন্থটির সেটিং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করা হয়েছে। আশা করি এবার হাতে নিলে পাঠক মুগ্ধ হবেন এবং পাঠ করলে আরও বেশি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

লেখকের নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় বের করে তিনি পুরো গ্রন্থে কাজ করেছেন। এরপর কালান্তরের সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য আলী আহমদ, ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালীন অনেক সময় নিয়ে বেশ পরিশ্রম করেছেন এটির পেছনে। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

সূচি

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

জুমুআর ফজিলত ও বিধান # ১৯

এক	: জুমুআ সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন	২১
দুই	: গোসল করে মসজিদে আগে আগে যাওয়া	২৩
তিন	: জুমুআর আগের ও পরের সুন্নাত	২৫
চার	: খুতবা চলাকালে দু-রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া যাবে	৩০
পাঁচ	: সুলাইক গাতফানির ঘটনার ব্যাখ্যা	৩৯
ছয়	: জুমুআর দিন রাসুলের ওপর বেশি বেশি দুরুদ পড়া	৪৩
সাত	: জুমুআর দিন দুআ কবুলের সময়	৪৭
আট	: জুমুআর দিন সুরা কাহাফ তিলাওয়াতের ফজিলত	৫২
নয়	: জুমুআর খুতবা কেন আরবিতে দিতে হবে	৫৩
দশ	: জুমুআর সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি	৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাররাম : করণীয় ও বর্জনীয় # ৬১

এক	: মুহাররামের রোজা	৬৩
দুই	: আশুরার করণীয় ও বর্জনীয়	৬৫
তিন	: আশুরার রোজার অবস্থা	৬৬
চার	: আশুরার রোজা রাখার ফজিলত	৭৪
পাঁচ	: আশুরার ফজিলত-সংক্রান্ত বানোয়াট বর্ণনা	৭৫
ছয়	: আশুরার দিন ভালো খাবার-সংক্রান্ত হাদিসের বিশ্লেষণ	৭৮
সাত	: কারবালা ও আশুরা : একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ	৮২
আট	: কারবালা : প্রতিরোধের প্রথম দৃষ্টান্ত	৯২

তৃতীয় অধ্যায়

সফর : করণীয় ও বর্জনীয় # ৯৯

এক	: সফর মাসকে অশুভ মনে করা	৯৯
দুই	: সফর মাস-সংক্রান্ত জাল হাদিস	১০৩
তিন	: আখেরি চাহার শোম্বা কি উদ্‌যাপনের বিষয়	১০৩
চার	: সফর মাসের শেষ বুধবারে বিশেষ সালাত	১০৮

চতুর্থ অধ্যায়

রবিউল আউয়াল : করণীয় ও বর্জনীয় # ১০৯

এক	: বিদআতের বিশ্লেষণ	১০৯
দুই	: বিদআতের সংজ্ঞা	১১০
তিন	: ইদে মিলাদুন্নবি পালনের ইতিহাস	১২৫
চার	: রাসুল ﷺ জন্ম উপলক্ষ্যে কী করতেন	১২৮
পাঁচ	: 'দাওয়াতে ইসলামি'র লিফলেট : একটি পর্যালোচনা	১৩৭
ছয়	: রাসুলের জন্মদিন কি ১২ রবিউল আউয়াল	১৪২

পঞ্চম অধ্যায়

রবিউস সানি : করণীয় ও বর্জনীয় # ১৪৫

এক	: প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখার বিধান	১৪৫
দুই	: ফাতিহায়ে ইয়াজদাহম : একটি ভুল প্রথা	১৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

রজব : করণীয় ও বর্জনীয় # ১৫১

এক	: সম্মানিত মাসের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ	১৫১
দুই	: সম্মানিত মাসে যুদ্ধবিগ্রহের বিধান	১৫২
তিন	: 'আতিরা' তথা রজবে জবাইকৃত বিশেষ প্রাণী	১৫২
চার	: সালাতুর রাগায়িব : একটি ভিত্তিহীন আমল	১৫৪
পাঁচ	: শবে ইসতিফতা : একটি বিদআতের পর্যালোচনা	১৫৮
ছয়	: রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা	১৬১
সাত	: রজবের বিশেষ দুআ ও ফজিল-সংক্রান্ত দুটি বর্ণনা	১৬২

আট : শবেমিরাজ : কিছু কথা ১৬৫
নয় : শবেমিরাজের বিশেষ সালাত ১৬৭

সপ্তম অধ্যায়

শাবান : করণীয় ও বর্জনীয় # ১৭০

এক : শবেবরাত : একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ ১৭০
দুই : সহিহ হাদিসের আলোকে শবেবরাত ১৭১
তিন : শবেবরাত-সংক্রান্ত আসার ১৮০
চার : শবেবরাত সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য ১৮১
পাঁচ : শবেবরাতের বিশেষ সালাত ১৮৬
ছয় : শবেবরাতের সালাত-সংক্রান্ত কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা ১৮৬
সাত : শবেবরাতের রোজা ১৯০
আট : শবেবরাতে রিজিক ভাগ ও মৃত্যু-পরোয়ানা ১৯২
নয় : শবেবরাতে কবর জিয়ারত ও বাতি জ্বালানো ১৯৪
দশ : শাবানে বেশি বেশি নফল রোজা রাখা ১৯৪

অষ্টম অধ্যায়

রমজান : ১২ মাসের শ্রেষ্ঠ মাস # ১৯৬

এক : রমজানে খুলে যায় জান্নাতের দরজা, বন্ধ করা হয় জাহান্নামের দ্বার ১৯৭
দুই : শাবানের শেষে রাসুলের খুতবা ২০০
তিন : রোজার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই ২০১
চার : যে রমজান পেয়েও গুনাহ মাফ করাতে পারল না, সে হতভাগা ২০৩
পাঁচ : রমজানের বিশেষ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ২০৬
ছয় : রমজান : মুক্তহস্তে দান করার মাস ২০৭
সাত : রমজান : গুনাহ মাফের অফুরন্ত সুযোগ ২০৯
আট : রোজা মানুষের জন্য সুপারিশ করবে ২১০
নয় : শবেকদর : হাজার মাসের শ্রেষ্ঠ রাত ২১০
দশ : তারাবি : রমজানের অন্যতম আমল ২১৫
এগারো : তারাবির রাকআত ২১৭
বারো : তারাবির টাকা : একটি পর্যালোচনা ২২৬
তেরো : সাদাকাতুল ফিতরের বিধান ২৪০

নবম অধ্যায়

শাওয়াল : হজের প্রথম মাস # ২৪৪

এক	: ইদগাহে হেঁটে যাওয়া ও ইদুল ফিতরে ইদগাহে যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া	২৪৪
দুই	: ইদের দিন সাধ্যমতো ভালো কাপড় পরিধান করা	২৪৫
তিন	: কোনো ওজর না থাকলে ইদগাহে সালাত পড়া	২৪৫
চার	: ইদের দিন পরস্পরকে অভিবাদন জানানো	২৪৬
পাঁচ	: সহিহ হাদিসের আলোকে অতিরিক্ত ছয় তাকবির	২৪৭
ছয়	: শাওয়ালের ছয় রোজা এক বছর রোজা রাখার নামান্তর	২৫০
সাত	: ইদুল ফিতরের রাত ও দিনে বিশেষ সালাত	২৫২
আট	: আমরা কেন সৌদির সঙ্গে ইদ করি না	২৫৫
নয়	: সারা বিশ্বে একই দিনে ইদ করা কি ইমাম আবু হানিফার মাজহাব	২৫৭

দশম অধ্যায়

জিলহজ : করণীয় ও বর্জনীয় # ২৬০

এক	: জিলহজের প্রথম দশকের ফজিলত	২৬০
দুই	: আরাফার দিন : বরকতময় একটি দিন	২৬২
তিন	: তাকবিরে তাশরিক : জিলহজের অন্যতম আমল	২৭২
চার	: কুরবানির ইদ : ত্যাগের অনুপম নিদর্শন	২৭৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। রহমতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হোক নবিগণের সম্রাট মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর; উম্মতের মুক্তির চিন্তায় যিনি সারা জীবন ছিলেন তৎপর। বিচারের কঠিন ময়দানে যখন সবাই 'নাফসি নাফসি' বলে নিজের চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে, তিনি থাকবেন আমাদের চিন্তায় অস্থির।

পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন। সময়টি শেষ হলে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। পৃথিবীতে বান্দা যদি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাহলে পরকালে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত লাভ করবে; আর সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে না পারলে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষের কাজের সুবিধার্থে আল্লাহ সময়কে দুভাগে ভাগ করেছেন। এর একটি অংশকে আমরা বলি দিন, অন্য অংশকে রাত। দিন-রাতের আবর্তে সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়। ৩০ দিনে এক মাস। ৩৬৫ দিন বা ১২ মাসে এক বছর।

পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য আল্লাহ রাসুলগণের মাধ্যমে মানুষের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন দিয়েছেন। কিছু ইবাদতের নির্দেশও দিয়েছেন। ইবাদতের মধ্যে কিছু এমন, যেগুলোর সম্পর্ক সূর্যের সঙ্গে, কিছু চাঁদের সঙ্গে। কিছু আমল আছে সর্বদা করতে হয়; যেমন, সালাত। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া ফরজ। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে প্রতিবছর জাকাত আদায় করা ফরজ। আবার কিছু ইবাদত আছে সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট। যেমন, ফরজ রোজা রমজান মাসের সঙ্গে নির্দিষ্ট।

আমাদের রাসুল ﷺ হলেন সকল নবি ও রাসুল থেকে শ্রেষ্ঠ। ঠিক তেমনি তাঁর উম্মত পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ আমাদের অনুগ্রহ করে বিশেষ কিছু দিবস-রজনিকে সম্মানিত করেছেন, যে দিবস বা রজনির মর্যাদা আল্লাহর কাছে অন্য দিবস-রজনি থেকে অনেক বেশি। যেমন : শবেকদর হাজার মাস থেকে উত্তম। আরাফার দিনের রোজা পূর্বাপর দুই বছরের গুনাহের (সগিরা) কাফফারা হয়ে যায়।

এ ছাড়া আল্লাহ নিজে কুরআনে ১২ মাসের ৪ মাসকে 'আশহুরুল হুরুম' তথা 'সম্মানিত মাস' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ১২ মাসের কিছু মাস এমন, যেগুলোর বিশেষ কিছু দিনে নির্দিষ্ট কিছু আমলের ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত। যেমন : মুহাররামের প্রথম দশক, জিলহজের প্রথম দশক, আশুরার রোজা, শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত; যে রাতকে আমরা শবেবরাত বলি ইত্যাদি। কিছু মাসের বিশেষ কিছু আমল যেভাবে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক তেমনি সমাজে কিছু কিছু মাসে বহু আমল প্রচলিত, যেগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট। কুরআন-হাদিসের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজে এগুলোর প্রচলন ঘটাতে জাল করা হয়েছে অনেক হাদিস; অথচ এসব ফজিলতের সঙ্গে রাসুলের দূরতম সম্পর্ক নেই। রাসুল ﷺ থেকে যে মাস বা দিনের ফজিলত প্রমাণিত, সেটার যথাযথ কদর করা যেমন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, তেমনি যে মাস বা দিনের ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়, সে মাস বা দিনে বিশেষ আমল থেকে বেঁচে থাকাও সকল মুসলমানের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে *মকসুদুল মুমিনীন, বারো চান্দের ফজিলত*সহ কিছু অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলোতে ১২ মাসের এমন অনেক মনগড়া আমল উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআন-হাদিসের সঙ্গে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। বহু মনগড়া আমল দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দেশে লোকজন করে আসছে। আমাদের ছোটবেলায় দেখতাম, শবেবরাতে গ্রামের অধিকাংশ ঘরে শিরনি, হালুয়া, রুটি ইত্যাদি বানানো হতো; অথচ শবেবরাতে শিরনি বানানোর কথা সহিহ হাদিসে থাকা দূরের কথা, কোনো দুর্বল হাদিসেও নেই।

আরবিভাষায় এ সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ আছে। আল্লামা আশরাফ আলি থানবি রাহ. উর্দুতেও এ বিষয়ে লিখেছেন। নিজের হাজার দুর্বলতা ও জ্ঞানস্বল্পতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে লেখার প্রয়াস পেয়েছি। প্রিয় উসতাজ মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী এ বিষয়ে লিখতে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘ করুন। ইলমে অপরিপক্ব হওয়ায় ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। কারও চোখে ধরা পড়লে আমাদের জানালে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই আবুল কালাম আজাদের। ছোটবেলা থেকে তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে সামনে এগোতে সহযোগিতা করেছেন। বৃহৎ কলেবরের এ বইটি সাড়া জাগানো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *কালান্তর প্রকাশনী* থেকে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সে-সকল তালিবুল ইলমের, যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে। ইফতা বিভাগের ছাত্র মাওলানা হুসাইন, মাওলানা আবদুল হান্নান, মাওলানা শুয়াইব, মাওলানা মাহবুব, মাওলানা মাহফুয বিভিন্ন গ্রন্থের হাওয়ালা বের করার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাদের উত্তম বদলা দান করুন। হাসান আরীফ ও হাসানুল বান্না তাসনীমের জন্য শুভকামনা। সবাইকে আল্লাহ তাফাক্কুহ ফিদ-দীন ও রুসুখ ফিল ইলম দান করুন। আমিন।

প্রথম অধ্যায়

জুমুআর ফজিলত ও বিধান

সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ দিন জুমুআর দিন। মানুষ এ দিনেই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি নিয়ামত লাভ করেছে। এ ছাড়া সৃষ্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণেই শুক্রবার ফজিলতপূর্ণ। তাই বান্দার শুক্রবারের সালাত আল্লাহর দরবারে অনেক মূল্যবান।

আল্লাহ ইচ্ছা করলেন, তার প্রিয় বান্দারা সপ্তাহে অন্তত একদিন একত্রিত হয়ে তাঁর ইবাদত করুক। তাই তিনি কুরআনে এ দিনের সালাতের ব্যাপারে ঘোষণা করলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

মুমিনগণ, জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। [সুরা জুমুআ : ৯]

রাসুল ﷺ-এর হাদিস থেকে জানা যায়, সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন শ্রেষ্ঠ দিন। এ দিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয় এবং এ দিনই তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়, আবার এ দিনেই বেহেশত থেকে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ দিন অধিক ফজিলতের দিন। এ দিনে তোমরা অধিক পরিমাণে দুরুদ পাঠ করো। তোমরা যখন দুরুদ পাঠ করবে, তখনই তা আমার সামনে পেশ করা হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিউত্তর দিই।

হাদিসে এসেছে, যে বিনা ওজরে তিনটি জুমুআ ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন।

প্রতিমাসেই জুমুআর দিন রয়েছে। এ ছাড়া এ দিনের রয়েছে বিশেষ কিছু আমল। এ জন্য জুমুআর আলোচনা প্রথমেই করা দরকার।

প্রত্যেক উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলা সপ্তাহে বিশেষ একটি দিন দিয়েছেন, যে দিনের মর্যাদা, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অন্য দিনের তুলনায় বেশি, যে দিন লোকেরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিশেষ কিছু আমল করবে। কোনো কোনো উম্মতের জন্য আল্লাহ শনিবার নির্ধারণ করেছিলেন। কোনো উম্মতের জন্য রবিবার; আমাদের জন্য শুক্রবার তথা জুমুআবার নির্ধারণ করেছেন। শুক্রবার যে অন্য দিনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এ কথা হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। এ জন্য আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে জুমুআর দিন উপহার দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কিছু হাদিস উল্লেখ করছি :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

আমরা পৃথিবীতে শেষে এসেছি; কিন্তু কিয়ামতে আমরা সবার অগ্রগামী। যদিও প্রত্যেক উম্মতকে আমাদের পূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছে; আর আমাদের দেওয়া হয়েছে তাদের পরে। আল্লাহ শুক্রবার আমাদের দান করেছেন এবং সে দিন সম্পর্কে পথপ্রদর্শন করেছেন। মানুষ এ ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণ করে। ইয়াহুদিদের পরের দিন (শনিবার) এবং খ্রিষ্টানদের তার পরের দিন (রবিবার) দান করা হয়েছে।[১]

২. হুজায়ফা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَي يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ.

আল্লাহ তাআলা জুমুআর দিনের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদের সঠিক পথের সন্ধান দেননি। ইয়াহুদিদের জন্য বিশেষ দিন ছিল শনিবার এবং খ্রিষ্টানদের জন্য রবিবার। আল্লাহ আমাদের (এ পৃথিবীতে) পাঠালেন এবং জুমুআর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন। আমাদের জন্য শুক্রবার,

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৮৭৬; *সহিহ মুসলিম* : ৮৫৫।

শনিবার ও রবিবারকে ধারাবাহিক করে দিলেন। এভাবে তারা কিয়ামত-দিবসে আমাদের পেছনে থাকবে। দুনিয়াবাসীর মধ্যে আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে এবং কিয়ামত-দিবসে আমরা থাকব প্রথমে। সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রথমে আমাদের ফায়সালা করা হবে।[২]

উপর্যুক্ত হাদিস দুটি থেকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তাআলা পূর্বের উম্মতদেরও একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু বিশেষ অনুগ্রহ করে আমাদের জন্য শুক্রবার দান করেছেন, যাতে তাঁর ইবাদত করে অধিক নিকটবর্তী বান্দা হতে পারি। কারণ, আমরা যদিও পৃথিবীতে একেবারে শেষে এসেছি; কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হব সবচেয়ে অগ্রগামী। জুমুআসহ কিছু দিন ও রাত তিনি আমাদের দিয়েছেন, যাতে সেসব বিশেষ দিন ও রাতে তাঁর ইবাদত করে অন্যান্য উম্মত থেকে অগ্রগামী হতে পারি।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক অপূর্ব নিয়ামত হলো জুমুআর দিন। এ দিনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিৎ। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে জুমুআর দিনের প্রতিটি মুহূর্ত যথাযথভাবে কাজে লাগানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

এক. জুমুআ সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন

দিন-রাতের আবর্তনে পৃথিবীর এগিয়ে চলা আল্লাহর অমোঘ নীতি। রাতের নিকষ অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠবে আলোর রেখা। পূর্বদিগন্ত আলোকিত করে উদয় হবে সূর্য। বিকেলে অস্ত যাবে দিনমণি। অন্ধকারে ছেয়ে যাবে পৃথিবী। এভাবেই দিন-রাতের আবর্তনে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে কিয়ামতের দিকে। মানুষের সুবিধার্থে আল্লাহ রাত-দিনকে সপ্তাহ, মাস ও বছরে ভাগ করেছেন। সাত দিনে সপ্তাহ, ৩০ দিনে মাস, ৩৬৫ দিনে হয় বছর; আর সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে জুমুআ। বিষয়টি একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমুআর দিন। এ দিনে আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৮৫৪; *ইবনু মাজাহ* : ১০৮৩।

দিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে।[৩]

২. আউস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ. فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ.

নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমুআর দিন। এ দিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি মৃত্যুবরণও করেছেন এ দিনে। শুক্রবারে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করো। কারণ, তোমাদের দুরুদ আমার সামনে পেশ করা হয়।

সাহাবিগণ বললেন, 'আমাদের দুরুদ কীভাবে আপনার সামনে পেশ করা হবে; অথচ আপনার শরীর গলে যাবে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তাআলা জমিনের জন্য নবিদের শরীর হারাম করে দিয়েছেন।'[৪]

এ দুই হাদিস থেকে স্পষ্ট হলো, সপ্তাহের অন্য দিনের তুলনায় জুমুআর দিন শ্রেষ্ঠ। এ দিনের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ, ঐতিহাসিকভাবে দিনটির গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শুক্রবারে। এ ছাড়া কিয়ামতও শুক্রবারে সংঘটিত হবে।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত;

قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ، وَفِيهَا الصَّعْقَةُ، وَالْبِعْثَةُ، وَفِيهَا الْبَطْشَةُ، وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ.

রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'জুমুআর দিনের মর্যাদা কী?' রাসুল ﷺ বললেন, 'এ দিন তোমাদের পিতা আদমের মাটি তৈরি করা হয়েছে। মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান হবে এই দিনে। জুমুআর শেষ তিন ঘণ্টায় এমন এক

---

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৮৫৪; *সুনানু নাসায়ি* : ১৩৭৩।

[৪] *সুনানু নাসায়ি* : ১৫৭২; *সুনানু আবি দাউদ* : ১০৪৭।

মুহূর্ত রয়েছে, সে সময় কোনো বান্দা আল্লাহর কাছে দুআ করলে আল্লাহ তা কবুল করবেন।'[৫]

৪. ইমাম হায়সামি রাহ. *মাজমাউজ জাওয়ায়িদে* আবু হুরায়রার সূত্রে বর্ণিত আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ بِأَفْضَلَ أَوْ بِأَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিনের চেয়ে উত্তম ও মহান কোনো দিন নেই।[৬]

রাসুলের মুখনিঃসৃত উপরিউক্ত হাদিসগুলো অন্য দিনের ওপর জুমুআর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে। জুমুআ মুসলমানদের সাপ্তাহিক ইদ। আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করে আমাদের দান করেছেন। এ দিনে আল্লাহর অফুরন্ত করুণা আমাদের হাতছানি দেয়। হাদিস থেকে এটিও জানতে পারলাম, জুমুআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে সময়ে বান্দা আল্লাহর কাছে যে কল্যাণ চাইবে, আল্লাহ তাকে সে কল্যাণ দান করবেন। যে বিপদ থেকে আশ্রয় চাইবে, আল্লাহ তাকে সে বিপদ থেকে নিরাপদে রাখবেন। সে সময়টা কখন? এ বিষয়ে সামনে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

দুই. গোসল করে মসজিদে আগে আগে যাওয়া

কোনো ব্যক্তির ওপর গোসল ফরজ হয়ে থাকলে জুমুআর সালাতের আগে গোসল করা ফরজ। শুধু জুমুআর সালাত নয়, যেকোনো সালাত পড়তে হলে তাকে গোসল করতে হবে। গোসল ফরজ নয়, এমন ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিনে গোসল করা সুন্নাত। এ ছাড়া গোসল করে আগে আগে মসজিদে যাওয়ার নির্দিষ্ট ফজিলতও হাদিসে আছে।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

যে গোসল করে জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে এল, সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত পড়ে ইমাম সাহেব খুতবা শেষ করা পর্যন্ত চুপচাপ শুনল এবং ইমাম সাহেবের সঙ্গে সালাত আদায় করল, আল্লাহ তার দুই জুমুআর

[৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮১০২; *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩০০০০।

[৬] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩০০০১।

মধ্যখানে কৃত গুনাহ মাফ করে দেন। সঙ্গে অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহও মাফ করে দেন।[৭]

এ হাদিসে সাধারণভাবে গোসল করার কথা বলা হয়েছে। অন্য হাদিসে জুনুবি বা অপবিত্র ব্যক্তির গোসল করার কথা বলা হয়েছে।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

যে জুমুআর দিনে ফরজ গোসল করে সবার আগে মসজিদে এল, সে একটি উট কুরবানি করার সাওয়াব পেল। এরপর যে এল, সে একটি গরু কুরবানির সাওয়াব পেল। তিন নম্বরে যে এল, সে একটি ছাগল কুরবানির সাওয়াব পেল। চার নম্বরে যে এল, সে একটি মুরগি কুরবানির সাওয়াব পেল। এমনিভাবে পাঁচ নম্বরে যে এল, সে একটি ডিম কুরবানির সাওয়াব পেল। এরপর ইমাম সাহেব যখন খুতবা দিতে বের হন, তখন ফেরেশতাগণ মসজিদে উপস্থিত হয়ে খুতবা শুনেন।[৮]

জুনুবি ব্যক্তির জন্য গোসলের হুকুম শুধু জুমুআর জন্য নয়; সালাত ও তিলাওয়াতের জন্যও গোসল করা ফরজ। এখানে আলাদা করে গোসলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে গুরুত্বারোপের জন্য।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الْبَيْضَةَ .

---

[৭] *সহিহ মুসলিম* : ৮৫৭।

[৮] *সহিহ বুখারি* : ৮৮১; *সহিহ মুসলিম* : ৮৫০।

জুমুআর দিন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা অবস্থান করেন এবং সালাতের জন্য আগমনকারীদের নাম ক্রমানুসারে লিপিবন্ধ করতে থাকেন। এরপর ইমাম সাহেব যখন খুতবা দিতে বসেন, তাঁরা তখন খাতাপত্র গুটিয়ে খুতবা শুনতে বসে যান। জুমুআর সালাতে প্রথম আগমনকারী ব্যক্তি একটি উট সাদাকা করার সাওয়াব পাবে। দুই নম্বরে আগমনকারী একটি গরু সাদাকা করার সাওয়াব পাবে। তিন নম্বরে আগমনকারী একটি ছাগল সাদাকা করার সাওয়াব পাবে। চার নম্বরে আগমনকারী একটি মুরগি ও ছয় নম্বরে আগমনকারী একটি ডিম সাদাকা করার সাওয়াব পাবে।[১]

উভয় হাদিসে জুমুআর সালাতের আগে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উভয় হাদিসই *সহিহ বুখারি* ও *মুসলিমে* রয়েছে। যদিও আমাদের আমল সম্পূর্ণ উলটো। আমরা ইমাম সাহেব খুতবায় দাঁড়ানোর পর কোনোভাবে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হই, আবার ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়! যেন সালাতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমি বাইরে রেখে এসেছি! এদিকে জুমুআর আগের চার রাকআত ও পরের চার রাকআত সম্পর্কে আমরা উদাসীন। জুমুআর আগের ও পরের সুন্নাত কিন্তু সুন্নাতে মুআক্কাদা। আমাদের অবহেলার কারণে আমরা অনবরত সে সুন্নাতে মুআক্কাদার আমল ত্যাগ করে গুনাহগার হচ্ছি। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দিন।

তিন. জুমুআর আগের ও পরের সুন্নাত

জুমুআর আগে ও পরের সুন্নাত নিয়ে ইদানীং আমাদের সমাজে চরম ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে। হাদিসের দোহাই দিয়ে অনেকে এ আমল অস্বীকার করছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে—'জুমুআর পূর্বাপরের চার রাকআত সুন্নাত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।' তাদের কথা, 'কেউ চাইলে জুমুআর আগে নফল সালাত পড়বে; অথবা বসে সালাতের অপেক্ষা করবে।' যুগচাহিদা অনুধাবন করে এ বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের লা-মাজহাবি বন্ধুগণ আজকাল সামাজিক বিভিন্ন যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করছেন যে, 'জুমুআর আগে-পরে কোনো সুন্নাত নেই।' যারা এসব কথা বলছেন, তাদের না-চেনার কারণে অনেকে ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে। পূর্বসূরিদের যুগে এ প্রবণতা ছিল না।

[১] প্রাগুক্ত : ৯২৯; *সহিহ মুসলিম* : ৮৫০।

যাইহোক, জুমুআর সুন্নাত সম্পর্কে হাদিসগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

যে গোসল করে জুমুআয় এল এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত পড়ল, এরপর ইমাম খুতবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ থেকে তার সঙ্গে সালাত আদায় করল, তার পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত এবং আরও অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[১০]

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا. وفيه :قال سهيل: فإن عجل بك شيئ فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.

তোমাদের কেউ যখন জুমুআ (ফরজ) পড়ে, তখন সে যেন জুমআর পরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ে নেয়। সুহাইল বলেন, 'তাড়া থাকলে মসজিদে দুই রাকআত এবং ঘরে ফিরে দুই রাকআত পড়ো।'[১১]

৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ জুমুআর পরে দুই রাকআত পড়তেন।[১২]

৪. ইবনু উমর রা. সম্পর্কে আতা রাহ. বলেন, তিনি যখন মক্কায় অবস্থান করতেন এবং জুমুআর সালাত পড়তেন, তখন সামনে অগ্রসর হয়ে দুই রাকআত পড়তেন, এরপর আরেকটু অগ্রসর হয়ে চার রাকআত পড়তেন। আর যখন মদিনায় জুমুআ আদায় করতেন, তখন ঘরে ফিরে দুই রাকআত পড়তেন, মসজিদে পড়তেন না। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ এমনই করতেন'।[১৩]

৫. আতা রাহ. বলেন, তিনি ইবনু উমর রা.-কে দেখেছেন, জুমুআর সালাতের পর মুসাল্লা থেকে একটু সরে দুই রাকআত পড়লেন। এরপর আরেকটু সরে চার

---

[১০] *সহিহ মুসলিম* : ৮৫৭।

[১১] প্রাগুক্ত : ৮৮১।

[১২] *সহিহ বুখারি* : ৯৩৭; *সহিহ মুসলিম* : ৮৮২; *সুনানু আবি দাউদ* : ১১৩২; *সুনানুত তিরমিজি* : ৫২১; *সুনানু নাসায়ি* : ১৪২১; *ইবনু মাজাহ* : ১১৩১।

[১৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ১১৩০।

রাকআত পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ইবনু উমরকে কতবার এমন করতে দেখেছেন?' তিনি বললেন, 'অনেকবার।'[১৪]

৬. জাবালা ইবনু সুহায়ম রাহ. ইবনু উমর রা. সম্পর্কে বলেন, তিনি কাবলাল জুমুআ (জুমুআর পূর্বে) চার রাকআত পড়তেন। মধ্যখানে সালাম ফেরাতেন না। জুমুআর ফরজের পর তিনি প্রথমে দুই রাকআত, পরে চার রাকআত পড়তেন।[১৫]

৭. নাফি রাহ. বলেন, ইবনু উমর রা. জুমুআর অনেক আগেই মসজিদে চলে যেতেন এবং ইমাম সাহেব বেরিয়ে আসা পর্যন্ত দীর্ঘ সালাত পড়তেন।[১৬]

৮. *সুনানু আবি দাউদে* আছে, ইবনু উমর রা. জুমুআর পূর্বে লম্বা সালাত পড়তেন এবং জুমুআর পর ঘরে গিয়ে দুই রাকআত পড়তেন।

৯. কাতাদা রাহ. বলেন, ইবনু মাসউদ রা. কাবলাল জুমুআ চার রাকআত ও বা'দাল জুমুআ চার রাকআত পড়তেন। আবু ইসহাক রাহ. বলেন, আলি রা. বা'দাল জুমুআ ছয় রাকআত পড়তেন। আবদুর রাজ্জাক রাহ. এ অনুসারেই আমল করতেন।[১৭]

১০. আবু আবদির রাহমান সুলামি রাহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. কাবলাল জুমুআ চার রাকআত এবং বা'দাল জুমুআ চার রাকআত পড়ার আমাদের নির্দেশ দিতেন। আলি রা. যখন আমাদের এখানে (কুফায়) এলেন, তখন তিনি আমাদের বা'দাল জুমুআ দুই রাকআত, তারপর চার রাকআত (মোট ছয় রাকআত) পড়ার আদেশ দিয়েছেন।[১৮]

১১. আবু আবদির রাহমান রাহ. বলেন, ইবনু মাসউদ রা. আমাদের কাছে (কুফায়) এলেন। তিনি আমাদের বা'দাল জুমুআ চার রাকআত পড়ার নির্দেশ দিতেন। তারপর আলি রা. যখন আমাদের কাছে এলেন, তিনি ছয় রাকআত পড়তে আমাদের নির্দেশ দেন। আমরা তখন আলির নির্দেশ গ্রহণ করে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের কথা ছেড়ে দিই।[১৯]

এখানে লক্ষণীয়, এক সাহাবির আদেশে দীর্ঘদিন চার রাকআত পড়ে এলেও

---

[১৪] প্রাগুক্ত : ১১৩৩।

[১৫] *শারহু মাআনিল আসার* : ১৮১৬।

[১৬] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৫৪০৩।

[১৭] *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ৫৫২৪।

[১৮] প্রাগুক্ত : ৫৫২৫।

[১৯] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৫৪১০।

আরেকজনের নির্দেশে তাঁরা সেটা ছেড়ে দিয়ে ছয় রাকআত পড়তে লাগলেন। তাঁরা এ কথা বলেননি যে, জুমুআর আগে-পরে তো কোনো সুন্নাত নেই, তাই আমরা এটা পড়ব না। আবদুর রাজ্জাকও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনিই-বা ছয় রাকআত অবলম্বন করলেন কেন? এসব থেকেও কি রাসুলের আমল ও শিক্ষা প্রমাণিত হয় না? সুন্নাত যদি না-ই থাকে, তবে ইবনু মাসউদ ও আলি রা. আদেশ দেবেন কেন?

১২. ইবরাহিম নাখয়ি রাহ. বলেন, সাহাবিগণ কাবলাল জুমুআ চার রাকআত ও বা'দাল জুমুআ চার রাকআত পড়তেন।[২০]

১৩. আলি রা. বলেছেন, যে জুমুআর পরে সালাত পড়বে, সে যেন ছয় রাকআত পড়ে।[২১]

এসব হাদিস থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর আগে ও পরে অবশ্যই সুন্নাত সালাত রয়েছে। যারা বলে, আগে ও পরে কোনো সুন্নাত নেই, তাদের কথা সঠিক নয়। হানাফি মাজহাবমতে জুমুআর আগে ও পরে চার রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদা রয়েছে। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও ইবনু উমরের হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হানাফিদের আমলকে হাদিসবিরোধী বলা ভ্রষ্টতা। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

জুমুআর পূর্বাপরের সুন্নাত সম্পর্কিত হাদিসগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কয়েকজন বিখ্যাত মুহাদ্দিসের বক্তব্য উল্লেখ করছি :

আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তাঁর কলম থেকে উম্মত যুগ যুগ ধরে উপকৃত হচ্ছে। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানির আগে তিনি *ফাতহুল বারি* নামে *বুখারি*র একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যা সর্বযুগে পঠিত ও সমাদৃত। সেই গ্রন্থে তিনি জুমুআর আগের ও পরের সুন্নাত নিয়ে তথ্যবহুল দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর কিছু বক্তব্য উল্লেখ করছি :

১. জুমুআর পূর্বের সালাত নিয়ে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। এটা কি জুহরের পূর্বের চার রাকআতের মতো সুন্নাতে মুআক্কাদা, নাকি আসরের পূর্বের চার রাকআতের মতো মুসতাহাব? অধিকাংশ আলিমের মত হচ্ছে, জুমুআর পূর্বে যে সুন্নাত তা সুন্নাতে মুআক্কাদা। এমনটি আওজায়ি, সুফিয়ান সাওরি, আবু হানিফা ও তাঁর সাথিগণ এবং ইমাম আহমাদেরও মত। কাজি আবু ইয়ালা *শারহুল মাজহাবে*র মধ্যে এবং ইবনু আকিলও উল্লেখ করেছেন যে, জুমুআর পূর্বের

---

[২০] প্রাগুক্ত : ৫৪০৫।

[২১] *শারহু মাআনিল আসার* : ১৮২৭।

চার রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদা। ইমাম শাফিয়ির মাজহাবে সুন্নাতে মুআক্কাদা।[২২]

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো, জুমুআর পূর্বের চার রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদা হওয়া শুধু ইমাম আবু হানিফার মাজহাব নয়; বরং অনেক মুজতাহিদ ইমামেরও মাজহাব। এখন আমাদের লা-মাজহাবি বন্ধুদের বক্তব্য যদি সঠিক হয় যে, চার রাকআতের কথা সহিহ হাদিসে নেই, তাহলে প্রশ্ন জাগে, এতজন ইমাম তাহলে হাদিসের বিপরীত মানুষকে পথপ্রদর্শন করেছেন? ইমামদের ব্যাপারে এমন ধারণা যে পোষণ করবে, তার ব্যাপারে করুণা প্রকাশ করছি।

যারা জুমুআর পূর্বের চার রাকআতকে একেবারেই সুন্নাত মানতে নারাজ, তাদের জবাবে ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থ দুটি রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি বলেন, 'জুমুআর পূর্বের সুন্নাত সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছি *নাফয়ুল বিদআহ আনিস সালাতি কাবলাল জুমুআ* নামে। এরপর সে গ্রন্থের ওপর আমাদের যুগের কিছু ফকিহ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের জবাবে আমি *ইজালাতুশ শুনআ আনিস সালাতি কাবলাল জুমুআহ* নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে গ্রন্থ দুটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।'[২৩]

ইবনু রজব হাম্বলির এ দুটি গ্রন্থ আমাদের সামনে নেই। অন্তত *ফাতহুল বারি* থেকে তাঁর আলোচনাটি বিজ্ঞ পাঠক দেখে নিলে যাবতীয় সন্দেহ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

২. হাফিজ ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেছেন, রাসুল ﷺ থেকে সহিহ সনদে এসেছে; তিনি বলেছেন, 'যে জুমুআর পরে সালাত পড়বে, সে যেন চার রাকআত পড়ে।' অনেক সাহাবি থেকে ছয় রাকআতের কথাও বর্ণিত রয়েছে।'[২৪]

৩. অনেকে আবার জুমুআর সুন্নাতকে জুহরের পূর্বাপরের সুন্নাতের ওপর তুলনা করেছেন। ইমাম বুখারিও তা-ই করেছেন। তিনি 'জুমুআর পূর্বের ও পরের সালাত' অনুচ্ছেদে জুহরের পূর্বাপর সুন্নাতের হাদিসটি উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, জুহরে যেমন সুন্নাত আছে, জুমুআরও তেমনি সুন্নাত আছে। ইমাম নববিও এভাবে কিয়াস করেছেন।

৪. শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা জুমুআর পূর্বে রাসুলের চার রাকআত পড়ার কথা অন্যভাবে প্রমাণিত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িব রা.-এর বর্ণিত হাদিসে আছে,

---

[২২] *ফাতহুল বারি* : ৫/৫৪২, ইবনু রজব।

[২৩] প্রাগুক্ত : ৫/৫৪৪।

[২৪] *মুখতাসারুল ফাতাওয়া মিসরিয়া* : ১/৭৯।

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُدِيمُ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَرْتَفِعَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

রাসুল ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জুহরের পূর্বে অর্থাৎ, জুহরের ফরজ পড়ার পূর্বে চার রাকআত সালাত পড়তেন। তিনি বলেছেন, 'এই সময়ে আসমানের দরজা খোলা হয়; আর এ সময় আমার নেক আমল উপরে উঠুক, আমি তা পছন্দ করি।[২৫]

হাদিস দুটির সনদ[২৬] সম্পর্কে শায়খ বলেন, 'শুধু আবু আইয়ুবের হাদিসটি তাঁর সূত্রসহ বেশ শক্তিশালী; আর আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িবের হাদিসটি হাসান লি-জাতিহি। এতে প্রামাণিকতা আরও শক্তিশালী হলো।'

পরিশেষে শায়খ বলেন, 'যারা জুমুআর ফরজের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাতের কথা বলেন, এ হাদিসটিই তার প্রমাণ। কেননা, আসমান কিংবা জান্নাতের দরজা খোলা সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত; আর এ অবস্থা জুমুআর দিন ও অন্য দিনে সমানভাবে বিদ্যমান।'[২৭]

জুমুআর আগের ও পরের সুন্নাত সম্পর্কে এ দীর্ঘ আলোচনার পর আশা করি আমাদের মনের খটকা দূর হয়েছে। যারা বলেন—'জুমুআর আগে ও পরে চার রাকআত সুন্নাত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়'—তারা এসব সহিহ হাদিস দেখেও কীভাবে চোখ বন্ধ করে থাকেন! আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

চার. খুতবা চলাকালে দু-রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া যাবে

গ্রন্থের আলোচ্যবিষয়ের সঙ্গে যদিও মাসআলাটির সম্পর্ক নেই; তারপরও যুগচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করছি। কারণ, বর্তমানে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মুজতাহিদের ছড়াছড়ি। এক-দুটি বাংলা বই পড়ে নিজেকে শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার উপযুক্ত মনে করেন। বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইমামদের কাছে বিভিন্ন মাসআলার দলিল চেয়ে তাদের বিভ্রান্তিতে ফেলার চেষ্টা করেন অনেকে।

---

[২৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ৩/৪১১; *তিরমিজি* : ৪৭৮। আবু আইয়ুব আনসারি রা. থেকে বর্ণিত হাদিসেও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় জান্নাতের দরজা খোলা হয়। *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৫৯৯২।

[২৬] **সনদ** (سند): হাদিসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

[২৭] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৩/১১৫-১১৬।

খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা যাবে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ চলে আসছে সাহাবা ও তাবিয়িনের যুগ থেকে। খুলাফায়ে রাশিদিন, জুমহুর সাহাবি ও তাবিয়িনের মতে, খুতবা চলাকালে সালাত ও কথা বলা নিষেধ। ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও অধিকাংশ ফকিহের মতও এমন। কুরআন-হাদিসের আলোকে এ মতটি অধিক যৌক্তিক। এর বিপরীতে কোনো কোনো সাহাবি ও তাবিয়ি খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম শাফিয়ির সঙ্গে ইমাম আহমাদও এমন বলেছেন।

মোটকথা, এ মাসআলা নিয়ে সাহাবিদের যুগ থেকে মতপার্থক্য চলে আসছে; কিন্তু তাঁরা কেউ-ই একে অপরের মাজহাবকে ভুল বা হাদিসের বিপরীত বলেননি। অপরদিকে বর্তমানে নিজের মতের বিপরীত মতকে জাল আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আমাদের আমল নাকি সহিহ হাদিস অনুযায়ী হচ্ছে না! এ জন্য কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে আমাদের মাজহাবের ওপর পর্যালোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

১. কুরআন থেকে দলিল

জুমুআর খুতবা চলাকালে মুসল্লিদের কাজ হলো গভীর মনোযোগে ইমামের খুতবা শোনা। এ সময়ে মুসল্লিদের অন্য কিছু করার অনুমতি নেই। এমনকি নফল সালাতও পড়া যাবে না। বিষয়টি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

১. আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

যখন কুরআন পড়া হবে, গভীর মনোযোগে শুনো ও চুপ থাকো, যাতে তোমাদের ওপর দয়া করা হয়। [সুরা : আরাফ : ২০৪]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, 'সালাফ থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত; আয়াতটি সালাতের কিরাআতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।' কেউ কেউ বলেছেন, 'খুতবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।' ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এ ব্যাপারে ইজমা তথা ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'আয়াতটি সালাত ও খুতবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।'[২৮]

ইমাম আহমাদের বক্তব্য অনুযায়ী আয়াতটি সালাত ও খুতবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং কুরআনের আয়াত দ্বারা

[২৮] *মাজমুআতু ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া* : ২/২৮৬।

প্রমাণিত হলো, খুতবার সময় মুসল্লিদের জন্য খুতবা শোনা ওয়াজিব। তাদের জন্য এমন কথা ও কাজ নিষেধ করা হয়েছে, যা খুতবা শোনায় বাধা সৃষ্টি করে। খুতবায় যেহেতু কুরআনের আয়াত থাকে, এ জন্য হাদিসে খুতবাকে 'জিকির' বলা হয়েছে এবং শোনা ওয়াজিব বলা হয়েছে। এ জন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে খুতবা শুধু নসিহতের নাম নয়; বরং তাতে সালাতের মর্যাদা পাওয়া যায়। এ কারণে জুমুআ সহিহ হতে খুতবা শর্ত করা হয়েছে। সালাফের অনেকেই বলেছেন, 'যে খুতবা পেল না, তার জন্য জুমুআর সালাত নেই; বরং সে যেন জুহরের সালাত চার রাকআত আদায় করে।'

২. উমর রা. বলেন, 'জুমুআর খুতবা দু-রাকআত সালাতের স্থলাভিষিক্ত। যার খুতবা ছুটে গেল, সে যেন জুহরের সালাত চার রাকআত পড়ে।'[২৯]

৩. তাউস রাহ. প্রসিদ্ধ তাবিয়ি মুজাহিদ ও আতা রাহ. থেকে বর্ণনা করেন, 'যে খুতবা পাবে না, সে যেন জুহরের চার রাকআত আদায় করে।'[৩০]

যদিও অধিকাংশ ইমাম বলেছেন, ওই ব্যক্তি জুমুআ পড়বে এবং তার জুমুআর সালাত আদায় হবে।

মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা চুপ থেকে গভীর মনোযোগে খুতবা শোনা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং খুতবা চলাকালে সালাত পড়া, কথা বলা ও এমন কাজ করা, যা খুতবা শুনতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা করা যাবে না।

২. হাদিস থেকে দলিল

এ বিষয়ে রাসুল ﷺ থেকে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে :

১. সালমান ফারসি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

যে জুমুআর দিন গোসলের মাধ্যমে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে সুগন্ধি-জাতীয় কোনোকিছু ব্যবহার করল ও সালাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে কাউকে মাড়িয়ে গেল না, নির্ধারিত সালাত পড়ে খুতবার সময় চুপ থাকল, আল্লাহ

[২৯] *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ৫৪৮৫।

[৩০] প্রাগুক্ত : ৫৪৮৮।

আগামী জুমুআ পর্যন্ত তার সব গুনাহ মাফ করে দেন।[৩১]

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى،

যে গোসল করে জুমুআর সালাতের জন্য মসজিদে গিয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করে। এরপর খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকে এবং ইমাম সাহেবের সঙ্গে সালাত আদায় করে, তাকে এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ পর্যন্ত কৃত গুনাহ ক্ষমা দেওয়া হয়।[৩২]

৩. আবু আইয়ুব আনসারি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ، وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا، وَلَمْ يُؤْذِهِ، وَرَكَعَ مَا قُضِيَ لَهُ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

যে গোসল ও সুগন্ধি ব্যবহার করে সর্বোত্তম কাপড় পরিধান করল এবং মসজিদে এসে কাউকে কষ্ট না দিয়ে সাধ্যমতো সালাত আদায় করল, এরপর চুপ থেকে ইমামের খুতবা শুনল, তাহলে এই আমল তার আগামী সপ্তাহের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।[৩৩]

এ বিষয়ে আরও কিছু হাদিস রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসসমূহে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—প্রথমত, রাসুল ﷺ খুতবার পূর্ব পর্যন্ত সালাতের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং যে খুতবা শুরুর পর সালাত পড়ল, সে রাসুলের নির্ধারিত সময়ের বাইরে সালাত পড়ল।

দ্বিতীয়ত, রাসুল ﷺ সালাত ও চুপ থাকাকে পরস্পরবিরোধী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খুতবার পূর্বে সালাত ও খুতবা চলাকালে চুপ থাকার কথা বলেছেন, যা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, খুতবা চলাকালে সালাত পড়া চুপ থাকতে বাধা সৃষ্টি করে; আর সে সময় চুপ থাকা ওয়াজিব। সালাত ও কথা বলা যেহেতু চুপ থাকতে বাধা সৃষ্টি করে, এ জন্য খুতবা চলাকালে উভয়টি নিষিদ্ধ।

---

[৩১] *সহিহ বুখারি* : ৮৮৩।

[৩২] *সহিহ মুসলিম* : ৮৫৭।

[৩৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৫৭১; *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩০৩৮।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আবু হুরায়রার পূর্বোক্ত হাদিস, যেখানে জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য প্রথমদিকে মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তির বিশেষ সাওয়াবের কথা উল্লেখের পর বলা হয়েছে—'ইমাম সাহেব যখন খুতবার উদ্দেশ্যে বের হন, ফেরেশতাগণ তখন তাঁদের খাতাপত্র গুটিয়ে নেন এবং চুপ হয়ে বসে ইমামের খুতবা শুনেন।'[৩৪]

৪. খাতাপত্র গুটিয়ে ফেরেশতাদের খুতবা শোনা এটা প্রমাণিত করে যে, খুতবার সময়ে একমাত্র কাজ তা শোনা। খুতবা শোনা ব্যতীত অন্য কোনো আমল সে সময়ে করা যাবে না—চাই সেটা সালাত হোক বা কথা। আর এ বিষয়টি একাধিক হাদিসে স্পষ্টভাবে এসেছে। নুবায়শা হুজালি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

মুসলমান যখন জুমুআর দিনে গোসল করে মসজিদে আসে, কাউকে কষ্ট না দিয়ে গিয়ে যদি দেখে ইমাম সাহেব এখনো আসেননি, তখন সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করে। যদি ইমাম সাহবেকে এমন অবস্থায় পায় যে, তিনি খুতবার জন্য বেরিয়ে গেছেন, তাহলে বসে গভীর মনোযোগে খুতবাসহ সালাত শেষ করা পর্যন্ত চুপ থাকে, যদি তার গত সপ্তাহের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া না হয়, তাহলে গত সপ্তাহের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।[৩৫]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদের শায়খ ছাড়া সবাই সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদের শায়খও বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।'[৩৬]

৫. ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ والإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ، فَلاَ صَلاَةَ ولاَ كَلاَمَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ

[৩৪] *সহিহ বুখারি* : ৩১২২।

[৩৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ২০৭২১।

[৩৬] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩০৪০।

যখন তোমাদের কেউ ইমাম খুতবা দেওয়া অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে, তখন ইমাম খুতবা শেষ করা পর্যন্ত কোনো সালাত ও কথা নেই।[৩৭]

হাদিসটি ইমাম তাবরানির *আল-মুজামুল কাবিরের* সূত্রে ইমাম হায়সামি *মাজমাউজ জাওয়ায়িদে* উল্লেখ করে বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি *আল-মুজামুল কাবিরে* উল্লেখ করেছেন। এর একজন বর্ণনাকারী আইয়ুব ইবনু নুহায়ক। তিনি মাতরুক। একদল মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছেন। সিকাহ বর্ণনাকারীদের[৩৮] জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ *কিতাবুস সিকাতে* ইবনু হিব্বান তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'তিনি ভুল করেন।'[৩৯]

এ বর্ণনার একজন রাবি সম্পর্কে যদিও কথা রয়েছে; কিন্তু হাদিসের মর্মকথা পূর্বে উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদিসের সঙ্গে মিল আছে। এ ছাড়াও অনেক হাদিস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, খুতবার সময় কথা বলার অনুমতি নেই। এমনকি খুতবা চলাকালে যদি কেউ তার অপর সাথিকে চুপ থাকার কথা বলে, হাদিসে সেটাকেও অহেতুক কাজ বলা হয়েছে; অথচ ভালো কাজের আদেশ সব সময় ওয়াজিব। তবে এমন ওয়াজিব পালন, যা চুপ থাকতে বাধা সৃষ্টি করে, খুতবার সময় সে ওয়াজিবও নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং খুতবার সময় 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' পড়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। কারণ, সেটা পড়া তো মুসতাহাব।

৩. সালাফে সালিহিনের আমল

কুরআন-হাদিস থেকে প্রমাণ উপস্থাপনের পর এ মাসআলায় সাহাবি ও তাবিয়িনের কিছু আমল উল্লেখ করছি, যাতে বিষয়টি ভালোভাবে পরিষ্কার হয় :

১. সালাবা ইবনু আবি মালিক রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ. فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَعْلَبَةُ: وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ ، وَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ.

---

[৩৭] প্রাগুক্ত : ২০১৪।

[৩৮] **সিকাহ রাবি :** যে রাবির মধ্যে আদালাত ও জাবত (বিশ্বস্ততার সঙ্গে ধারণক্ষমতার গুণ) পূর্ণ মাত্রায় আছে, তাকে সিকাহ রাবি বলে।

[৩৯] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩১২০।

আমরা উমরের যুগে জুমুআর সালাত পড়তাম, এমতাবস্থায় উমর রা. মসজিদে আগমন করতেন। তিনি যখন মিম্বারে বসতেন এবং মুআজ্জিন আজান শুরু করত, তখনো আমরা বসে বসে কথা বলতাম। মুয়াজ্জিন যখন আজান শেষ করত এবং উমর রা. খুতবা দিতে দাঁড়াতেন, আমরা চুপ হয়ে যেতাম। আমাদের কেউ-ই তখন কোনো কথা বলত না। ইবনু শিহাব জুহরি রাহ. বলেন, ইমামের বের হওয়া সালাতকে বন্ধ করে দেয় এবং ইমামের খুতবা শুরু কথা বলা বন্ধ করে দেয়।[৪০]

ইবনু শিহাব জুহরির এই বক্তব্য তাঁর নিজস্ব নয়; বরং এটি হাদিস সমর্থিত। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবদিল বার আল মালিকি বলেন, 'ইবনু শিহাব জুহরির বক্তব্য হাদিস থেকে চয়নকৃত। তিনি ইজতিহাদ করে আবিষ্কার করেননি।'

এ ছাড়াও এ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, 'ইমাম মালিক, আবু হানিফা ও তাঁর উভয় সাথি, সুফিয়ান সাওরি, লাইস ইবনু সাআদের মত হলো, কোনো ব্যক্তি ইমাম সাহেব খুতবা প্রদানকালে মসজিদে এলে সে বসে যাবে, তখন তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে না।' তাঁরা ইবনু শিহাবের উল্লিখিত হাদিস দ্বারা দলিল দেন। এটি সুন্নাত। উমর রা. ও অন্যদের যুগে এই নিয়ম ব্যাপক প্রচলিত ছিল।[৪১]

২. সালাবার হাদিসটি *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বাতে*ও বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে শব্দে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে,

أَدْرَكْتُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تَرَكْنَا الصَّلَاةَ.

আমি উমর ও উসমানের যুগ পেয়েছি। জুমুআর দিনে ইমাম যখন বের হতেন, আমরা তখন সালাত ছেড়ে দিতাম।[৪২]

এ দুটি হাদিস এবং ইবনু আবদিল বার মালিকির বক্তব্য সামনে রাখুন। উমরের যুগে ইমাম সাহেব যখন খুতবার জন্য বের হতেন, সাহাবিগণ সালাত পড়া ছেড়ে দিতেন। অধিকাংশ বড় সাহাবি তখন জীবিত। সবাই বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন। এরপরও যারা বলবে হানাফিদের মাজহাব সহিহ হাদিসের বিপরীত, তাদের জন্য আরও প্রমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

---

[৪০] *মুআত্তা মালিক* : ৩৪৪।

[৪১] *আল-ইসতিজকার* : ২/২৪।

[৪২] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৫২১৬।

৩. সায়িব ইবনু ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

كُنَّا نُصَلِّي فِي زَمَنِ عُمَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَطَعْنَا الصَّلَاةَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ وَيُحَدِّثُونَا، وَرُبَّمَا نَسْأَلُ الرَّجُلَ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ سُوقِهِ وَمَعَاشِهِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ خَطَبَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ.

আমরা উমরের যুগে জুমুআর সালাত আদায় করতাম। উমর রা. যখন বেরিয়ে মিম্বারে বসতেন, আমরা তখন সালাত বন্ধ করে দিতাম, তবে পরস্পর কথা বলতাম। কখনো আমরা পাশের লোককে বাজার ও তার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। মুআজ্জিন যখন আজান শেষ করত, তিনি খুতবা দিতেন। খুতবা শেষ করা পর্যন্ত আমরা কোনো কথা বলতাম না।[৪৩]

এ হাদিসেও আমরা পেলাম, উমর রা. যখন খুতবা দিতে বের হতেন, সাহাবিগণ তখন সালাত পড়া বন্ধ করে দিতেন। তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করতেন না।

৪. প্রখ্যাত তাবিয়ি আতা রাহ. ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন; 'ইমাম খুতবা প্রদানের উদ্দেশে বের হওয়ার পর তারা সালাত পড়া ও কথা বলা পছন্দ করতেন না।'[৪৪]

৫. *মুসান্নাফের* অপর এক বর্ণনায় আলি রা., মুজাহিদ ও আতা রাহ.-এর বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়েছে, 'ইমাম খুতবা দিতে বেরোনোর পর তাঁরা সালাত পড়া অপছন্দ করতেন।'[৪৫]

এ ছাড়া রাসুলের কিছু ঘটনা থেকেও বোঝা যায়, খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক :

৬. আবুজ জাহিরিয়া বর্ণনা করেন; 'আমরা আবদুল্লাহ ইবনু বুসর রা.-এর সঙ্গে জুমুআর সালাত আদায় করছিলাম। এমতাবস্থায় একজন এসে মানুষকে ডিঙিয়ে সামনে গেল। আবদুল্লাহ ইবনু বুসর রা. তখন বললেন, রাসুলের যুগে একজন এমনটা করেছিল, তখন রাসুল ﷺ তাকে বললেন, 'বসে যাও, তুমি মানুষদের কষ্ট দিচ্ছ।'[৪৬]

---

[৪৩] *নাসবুর রায়াহ* : ২/২০৪, হাদিসটি ইমাম জায়লায়ি রাহ. ইসহাক ইবনু রাহওয়াইয়ের *মুসনাদের* সূত্রে উল্লেখ করেছেন। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. *আদ-দিরায়াতে* সনদকে হাসান বলেছেন।

[৪৪] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৫২১৭।

[৪৫] প্রাগুক্ত : ৫২১২।

[৪৬] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২৭৯০।

এই হাদিস ইমাম ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. আমাদের মাজহাবের দলিলস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। কারণ, এখানে রাসুল ﷺ তাঁকে বসার নির্দেশ দিয়েছেন, সালাত পড়ার আদেশ দেননি। যদি খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া যেত, অবশ্যই রাসুল ﷺ তাঁকে আগে সালাত পড়ার নির্দেশ দিতেন। ইবনু আবদিল বার মালিকি বলেন, 'রাসুল ﷺ তাঁকে সালাতের আদেশ দেননি; বরং বসে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।'[৪৭]

৭. ইমাম বুখারির একটি ঘটনা দ্বারাও বিষয়টি বোঝা যায়। আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন; '[ঘটনার সারাংশ] রাসুল ﷺ একবার জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন মিম্বারের দিকের দরজা দিয়ে একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বলে, 'আল্লাহর রাসুল, অনাবৃষ্টিতে পশুপাখি মরে যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দুআ করুন।' রাসুল ﷺ তখন দুহাত তুলে দুআ করলেন। আনাস রা. বলেন, 'আকাশ তখন একেবারে পরিষ্কার ছিল; কিন্তু রাসুলের দুআর পর হঠাৎ আকাশের রং পরিবর্তন হয়ে যায় এবং মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়।'

   পরের জুমুআয় ওই লোক আবার এসে বলল, 'আল্লাহর রাসুল, সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আল্লাহর কাছে বৃষ্টি বন্ধের দুআ করুন।' রাসুল ﷺ তখন বৃষ্টি বন্ধের দুআ করলে আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।[৪৮]

ঘটনাটি লক্ষ করুন। প্রথম দিন যখন ওই লোক মসজিদে প্রবেশ করে, রাসুল ﷺ তখন খুতবা দিচ্ছিলেন; অথচ রাসুল ﷺ তাঁকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার নির্দেশ দেননি। যদি খুতবার সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া সুন্নাত হতো, রাসুল ﷺ তাঁকে অবশ্যই তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার কথা বলতেন।

৮. ইমাম আবু দাউদ রাহ.-ও এ ধরনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। জাবির রা. বর্ণনা করেন,

   لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: اجْلِسُوا، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ.

   রাসুল ﷺ একবার খুতবা দিতে মিম্বারে বসে বললেন, 'তোমরা বসো।' ইবনু মাসউদ রা. সে কথা শুনে মসজিদের দরজায় বসে গেলেন। রাসুল ﷺ সে দৃশ্য দেখে বললেন, 'ইবনু মাসউদ, তুমি এগিয়ে এসো।'[৪৯]

---

[৪৭] *আল-ইসতিজকার* : ২/২৫, ইবনু আবদিল বার।

[৪৮] *সহিহ বুখারি* : ১০১৩।

[৪৯] *সুনানু আবি দাউদ* : ১০৯১।

এ হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইবনু মাসউদ রা. তখন মসজিদে প্রবেশ করছিলেন এবং রাসুলের ঘোষণা শুনে মসজিদের দরজায় বসে পড়েন। রাসুল ﷺ ইবনু মাসউদকে দেখে সামনে আসতে বলেন। যদি খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া সুন্নাত হতো, অবশ্যই রাসুল ﷺ তাঁকে আগে সুন্নাত পড়ার কথা বলতেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে, খুতবার সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ না পড়ার ব্যাপারে যারা বলে থাকেন, এর পক্ষে কোনো সহিহ হাদিস নেই—তাদের বক্তব্য ভুল। এ ছাড়া এটা তো শুধু ইমাম আবু হানিফার মাজহাব নয়; অনেক ইমাম এমন বক্তব্য দিয়েছেন। যেমনটা ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. উল্লেখ করেছেন।

পাঁচ. সুলাইক গাতফানির ঘটনার ব্যাখ্যা

ইমাম শাফিয়ি রাহ.-সহ যাঁরা খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া সুন্নাত মনে করেন, তাঁরা সুলাইক গাতফানির ঘটনা দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। প্রথমে ঘটনাটি উল্লেখ করছি। জাবির রা. বর্ণনা করেন,

> جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْهُمَا.
>
> রাসুল ﷺ মিম্বারে বসা অবস্থায় সুলাইক গাতফানি রা. আসেন। সুলাইক সালাত না পড়ে বসে যান। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, 'দু-রাকআত সালাত পড়েছ?' তিনি বললেন, 'না'। রাসুল ﷺ বললেন, 'দাঁড়িয়ে দু-রাকআত সালাত আদায় করো।'[৫০]

এ ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, রাসুল ﷺ তাঁকে খুতবা চলাকালে দু-রাকআত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু-রাকআত পড়া সুন্নাত প্রমাণিত হয়। নিম্নে এ হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

আল্লামা ইউসুফ লুদিয়ানবি রাহ. প্রথমে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রথমত উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআনে খুতবা নীরবে শোনা ফরজ সাব্যস্থ করা হয়েছে। রাসুলের অগণিত হাদিস দ্বারাও বিষয়টি শক্তিশালী হয়। খুলাফায়ে রাশিদিন, অধিকাংশ সাহাবি ও তাবিয়ি

[৫০] *সহিহ মুসলিম* : ৮৭৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৪০৫।

কুরআন-হাদিসের নুসুস সামনে রেখে খুতবা চলাকালে সালাত পড়া ও কথা বলার প্রবক্তা ছিলেন না। এ কথা স্পষ্ট যে, সুলাইক গাতফানির ঘটনা তাঁদের জানা ছিল। কেননা, তাঁদের বর্ণনার কারণে আমরা রিওয়ায়াত[৫১] সম্পর্কে জানতে পেরেছি। বড় সাহাবিগণও সে ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল জুমুআর সালাতের ভরা মজলিসে। রাসুল ﷺ সুলাইক গাতফানিকে উদ্দেশ করে যা বলেছিলেন, সেটা তাঁরা অবশ্যই শুনেছেন। এখানে এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, রাসুলের ঘোষণা সম্পর্কে তাঁদের জানা ছিল না। এটাও বলার সুযোগ নেই যে, তাঁরা কোনো ওজরের কারণে রাসুলের সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছেন এবং সুন্নাতবিরোধী কথা বলেছেন। যদি এ সম্ভাবনা থাকে, তাহলে খুলাফায়ে রাশিদিন ও সাহাবিদের ওপর বিশ্বাসে চিড় ধরবে। এ চিন্তা রাফিজিদের মধ্যে আসতে পারে; কিন্তু কোনো সহিহ আকিদার অনুসারী ব্যক্তির মধ্যে আসতে পারে না। আর এ কথাও সত্য যে, তাঁরা আমাদের চেয়ে সুন্নাতের বেশি অনুসারী ছিলেন। রাসুল ﷺ সুলাইক গাতফানিকে নির্দেশ দিয়েছেন, যদি সে নির্দেশ সবার জন্য ব্যাপক হতো, তাহলে এ কথা অসম্ভব যে, সকল সাহাবি; বিশেষত খুলাফায়ে রাশিদিন সে নির্দেশের ওপর আমল করবেন না।[৫২]

দ্বিতীয়ত, পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সাহাবিগণ যে এ হাদিসের ওপর আমল করেননি, তার একটি সুস্পষ্ট ও সঠিক ব্যাখ্যা তাঁদের কাছে ছিল। কী জবাব ছিল তাঁদের কাছে? এর জবাব দেওয়া শুধু আমাদের দায়িত্ব নয়; বরং সে-সকল লোকেরও, যারা সাহাবিদের ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাসী।

এবার আসুন জবাব উল্লেখ করি

প্রথম জবাব

সুলাইক গাতফানিকে রাসুল ﷺ খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার নির্দেশ দেননি; বরং তিনি খুতবা দিতে যখন মিম্বারে বসেছিলেন, তখন সুলাইক গাতফানি এলে তিনি তাঁকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার নির্দেশ দেন।

ইমাম নাসায়িও সুলাইক গাতফানির ঘটনা এনেছেন; কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থের অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন এভাবে—الصلاة قبل الخطبة। এরপর সুলাইক

[৫১] রিওয়ায়াত (رواية) : হাদিস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে; আর বর্ণনাকারীকে 'রাবি' বলে। কখনো কখনো মূল হাদিসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এ কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদিস) আছে।

[৫২] *ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুসতাকিম* : ৩৯৫-৩৯৬।

গাতফানির হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসের মতন,[৫৩]

> جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْهُمَا.
>
> সুলাইক গাতফানি রা. এমতাবস্থায় মসজিদে এলেন, যখন রাসুল ﷺ মিম্বারে বসা ছিলেন। সুলাইক সালাত পড়ার পূর্বে বসে যান। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি দু-রাকআত পড়েছ?' তিনি বললেন, 'না।' রাসুল ﷺ বললেন, 'দু-রাকআত পড়ে নাও।'[৫৪]

এখানে লক্ষণীয়, ইমাম নাসায়ি রাহ. পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন **'খুতবার পূর্বের সালাত'** সম্পর্কে। এরপর সুলাইক গাতফানির হাদিস এনেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাঁর মতে সুলাইক গাতফানির ঘটনা খুতবা শুরু হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে; খুতবা চলাকালে নয়। সুতরাং এ হাদিস দ্বারা খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয় জবাব

সুলাইক গাতফানির ঘটনাটি হাদিসের গ্রন্থাদিতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী রাসুল ﷺ খুতবা শুরুর পূর্বে সুলাইক গাতফানি এসেছিলেন এবং তিনি তাঁকে সালাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার কিছু বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, তিনি খুতবা চলাকালে এসেছিলেন; কিন্তু সালাত পড়ার সময় রাসুল ﷺ খুতবা বন্ধ রেখেছিলেন।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

> دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَأَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
>
> মসজিদের দরজা দিয়ে এক লোক প্রবেশ করল, এমতাবস্থায় রাসুল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে দু-রাকআত সালাত পড়ো।' তিনি তখন ওই ব্যক্তির সালাত শেষ করা পর্যন্ত খুতবা প্রদান থেকে বিরত থাকেন।[৫৫]

---

[৫৩] **মতন (متن)**: হাদিসে মূল কথা এবং ও শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

[৫৪] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৪৯৪, *নাসায়ি।*

[৫৫] *সুনানু দারা কুতনি* : ১৬৩৭।

এ হাদিসে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সুলাইক গাতফানি খুতবা শুরুর আগে রাসুল ﷺ যখন মিম্বারে বসা ছিলেন, তখন এসেছিলেন। রাসুল ﷺ সালাত শেষ করা পর্যন্ত খুতবা বন্ধ রেখেছিলেন। সুতরাং তাঁর ঘটনা দ্বারা খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া সুন্নাত প্রমাণিত হয় না। কারণ, তাঁর জন্য রাসুল ﷺ খুতবা বন্ধ রেখেছিলেন বিশেষ হিকমাতে। সবার জন্য তো আর খুতবা বন্ধ করা যাবে না। এভাবে প্রত্যেকের জন্য খুতবা বন্ধ করলে ইমাম সাহেবের খুতবা শেষ করতেই দীর্ঘ সময় লেগে যাবে!

তৃতীয় জবাব

ঘটনাটি সুলাইক গাতফানির সঙ্গে নির্দিষ্ট। বিশেষ কারণে রাসুল ﷺ তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। *সহিহ ইবনু হিব্বানের* একটি বর্ণনা দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়। জাবির রা. বলেন,

> دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا، فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ.
>
> সুলাইক গাতফানি রা. জুমুআর দিনে মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন, নবিজি খুতবা দিচ্ছেন। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি দু-রাকআত সালাত পড়ো। তবে আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করবে না।' এরপর তিনি দু-রাকআত সালাত পড়ে বসলেন।[৫৬]

সুনানু দারা কুতনিতে আছে,

> دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلاَ تَعُدْ لِمِثْلِ هَذَا.
>
> সুলাইক গাতফানি রা. জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশ করলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি দু-রাকআত সালাত পড়ো। তবে সামনে আর কখনো এমন করবে না।'[৫৭]

এ হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাসুল ﷺ বিশেষ করে সুলাইক গাতফানি রা.-

---

[৫৬] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২৫০৪।

[৫৭] *সুনানু দারা কুতনি* : ১৬৩৯।

কে একদিনের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আবার খুতবার সময় সুন্নাত পড়তে বারণ করেছেন। সুতরাং ঘটনাটি তাঁর একক বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া সুন্নাত প্রমাণিত হয় না।

আবার অনেকে এ ব্যাখ্যাও দাঁড় করিয়েছেন যে, সুলাইক গাতফানির ঘটনা কুরআনের পূর্ববর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে। তখন খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার অবকাশ ছিল। এরপর কুরআনের আয়াত নাজিল হলে তা রহিত হয়ে যায়। এ জন্য খুলাফায়ে রাশিদিন ও সকল সাহাবির আমল ছিল, ইমাম সাহেব খুতবা দিতে যখন বের হতেন, তখন তাঁরা সালাত পড়া বন্ধ করে দিতেন এবং গভীর মনোযোগে খুতবা শুনতেন।

আশা করি, দীর্ঘ আলোচনার পর পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়েছে, যারা বলেন—খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ না-পড়ার পক্ষে কোনো দলিল নেই, এটি ইমামদের ইজতিহাদ—তাদের কথা ভুল। এটি শুধু ইমাম আবু হানিফার একক মাজহাব নয়; অনেক ইমামের মাজহাব। এ ছাড়া সকল সাহাবির আমল এমনই ছিল।

ছয়. জুমুআর দিন রাসুলের ওপর বেশি বেশি দুরুদ পড়া

রাসুলের নাম শুনে তাঁর ওপর দুরুদ পড়া একটি স্বতন্ত্র আমল। এর বেশ কিছু ফজিলত রয়েছে। রাসুল ﷺ-এর ওপর দুরুদ পড়া ও এর ফজিলত-সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থও সংকলিত হয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম সাখাবির *আল-কাওলুল বাদি*, ইবনুল কাইয়িমের *জিলাউল আফহাম* ও ইবনু হাজার হাইতামির *আদ দুররুল মানজুদ* উল্লেখযোগ্য। যে ব্যক্তি রাসুলের নাম শুনে দুরুদ পড়ে না, একাধিক হাদিসে রাসুল ﷺ তার জন্য বদদুআ করেছেন।

১. হুসাইন ইবনু আলি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

কৃপণ হলো সে, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো; কিন্তু আমার ওপর দুরুদ পড়ল না।[৫৮]

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

[৫৮] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭৩৬; *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৫৪৬; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৯০৯।

ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো; কিন্তু সে আমার ওপর দুরুদ পড়ল না।[৫৯]

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত;

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: آمِينَ آمِينَ آمِينَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ حِينَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ: آمِينَ آمِينَ آمِينَ، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ.

রাসুল ﷺ একদিন মিম্বারে আরোহণ করছিলেন, তখন তিনি তিনটি সিঁড়িতে ওঠার সময় তিনবার 'আমিন' বললেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি মিম্বারে আরোহণের সময় কেন তিনবার "আমিন" বললেন?'

রাসুল ﷺ বললেন, 'জিবরিল আমার কাছে এসে তিনটি দুআ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে—যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো; কিন্তু সে আমার ওপর দুরুদ পড়ল না, সে যেন জাহান্নামে যায়। জিবরিল বললেন, "আপনি বলুন, আমিন!" আমি "আমিন" বলে তাঁর দুআ সমর্থন করলাম।'[৬০]

এসব হাদিসে রাসুলের নাম শুনে দুরুদ না পড়লে যেভাবে বদদুআ করা হয়েছে; ঠিক তেমনি অনেক হাদিসে দুরুদ পড়ার ফজিলতও বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো সাধারণত প্রায়ই শুনে থাকেন। এ জন্য বিপরীত হাদিসগুলো উল্লেখ করলাম।

দুরুদ শরিফ একটি স্বতন্ত্র ইবাদত; কিন্তু রাসুল ﷺ জুমুআর দিনে বেশি বেশি দুরুদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً.

জুমুআর দিন তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দুরুদ পড়ো। কেননা, আমার

[৫৯] *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৪৫১; *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৪৪৫; *মুসনাদু বাজ্জার* : ৮৪৬৫।
[৬০] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৯০৭।

উম্মতের দুরুদ আমার কাছে প্রতিশুক্রবারে পেশ করা হয়। যে আমার ওপর বেশি বেশি দুরুদ পড়বে, সে কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে।[৬১]

এ হাদিস সম্পর্কে ইমাম মুনজিরি বলেন, 'হাদিসটি ইমাম বায়হাকি হাসানসূত্রে উল্লেখ করেছেন। তবে বলা হয়, মাকহুল আবু উমামা রা. থেকে হাদিস শুনেননি।'[62]

৫. আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ، إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا. قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ.

প্রত্যেক জুমুআর দিন তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দুরুদ পাঠাও। কারণ, তোমাদের দুরুদ ফেরেশতাগণ আমার সামনে পেশ করেন। তোমরা যে-কেউ আমার ওপর দুরুদ পড়লে তা আমার কাছে পেশ করা হয়। আমি বললাম, 'আপনার ইনতিকালের পরও?' রাসুল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য নবিদের শরীর ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন।'[৬৩]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম মুনজিরি বলেন, 'ইমাম ইবনু মাজাহ উত্তম সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।'[৬৪]

৬. আওস ইবনু আবি আওস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,.

مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ؟ يَعْنِي وَقَدْ بَلِيتَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ

সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন জুমুআর দিন। এই দিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি মৃত্যুবরণও করেছেন এই দিনে। কিয়ামতও সংঘটিত হবে এই দিনে। সুতরাং তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দুরুদ পাঠাও। কেননা, তোমাদের দুরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবিগণ বললেন, 'আপনার

---

[৬১] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৬২০৮, বায়হাকি।

[৬২] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ২৫৮৩।

[৬৩] *ইবনু মাজাহ* : ১৬৩৭।

[৬৪] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ২৫৮২।

ওপর দুরুদ কীভাবে পেশ করা হবে? অথচ আপনার শরীর মাটির সঙ্গে মিশে যাবে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ মাটির জন্য নবিদের শরীর হারাম করে দিয়েছেন।'[৬৫]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম মুনজিরি বলেন, 'হাদিসটি ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম নিশাপুরি *আল-মুসতাদরাকে* তাখরিজ করেছেন এবং হাদিসকে সহিহ বলেছেন।'[৬৬]

৭. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ.

তোমরা জুমুআর দিন আমার ওপর বেশি বেশি দুরুদ পাঠাও। কেননা, এ দিন দুরুদ পাঠ করলে তা আমার কাছে পেশ করা হয়।[৬৭]

হাদিসটি সম্পর্কে হাকিম নিশাপুরি রাহ. বলেন, 'হাদিসটির সনদ সহিহ। যদিও এর সনদে আবু রাফি নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন; আর আবু রাফিই হলেন ইসমাইল ইবনু রাফি। *বুখারি-মুসলিমের* শর্তে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাখরিজ করেননি।' ইমাম জাহাবি *তালখিসুল মুসতাদরাকে* হাকিম নিশাপুরির বক্তব্যের ওপর আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেন, 'ইসমাইল ইবনু রাফিকে অনেকেই জয়িফ[৬৮] আখ্যায়িত করেছেন।'

হাদিসটি সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'সনদে ইসমাইল ইবনু রাফি রয়েছেন।' ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান বলেন, 'অন্য হাদিসের প্রামাণিকতা শক্তিশালী করতে তাঁর বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে।'[৬৯]

ইবনুল কাইয়িমের কথা অনুযায়ী ইসমাইল ইবনু রাফির হাদিস দ্বারা অন্য হাদিসের প্রামণিকতা শক্তিশালী করতে দলিল দেওয়া যেতে পারে; আর পূর্বের হাদিসগুলোতে দেখেছি, আবু মাসউদের হাদিসের বক্তব্য রয়েছে। সুতরাং ইসমাইল ইবনু রাফির কারণে এই হাদিসের ওপর আপত্তির সুযোগ নেই।

---

[৬৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৩৭; *সুনানু নাসায়ি* : ১৩৩৭; *সহিহু ইবনি খুজাইমা* : ১৭৩৩।

[৬৬] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ২৫৮২।

[৬৭] *আল-মুসতাদরাক* : ৩৫৭৭।

[৬৮] **জয়িফ** (ضعيف) : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে জয়িফ হাদিস বলে।

[৬৯] *জিলাউল আফহাম* : ২৭৭, ইবনুল কাইয়িম।

৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تعرض عَلَيَّ.

জুমুআর দিন তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দুরুদ পাঠাও। কারণ, তোমাদের দুরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

হাদিসটির ব্যাপারে ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেন, 'হাদিসের সনদ যদিও দুর্বল; কিন্তু মর্ম সঠিক হওয়ার কারণে অন্য হাদিসের প্রামাণিকতা শক্তিশালী করতে এ হাদিস পেশ করতে সমস্যা নেই।'[৭০]

উল্লিখিত হাদিস থেকে জুমুআর দিন রাসুলের ওপর বেশি বেশি দুরুদ পড়ার গুরুত্ব বুঝে এসেছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাসুলের ওপর বেশি বেশি দুরুদ পড়ার তাওফিক দিন।

সাত. জুমুআর দিন দুআ কবুলের সময়

জুমুআর দিনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ দিন এমন একটা সময় রয়েছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যে দুআ করে, আল্লাহ কবুল করেন। প্রথমে এ-সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস দেখুন :

১. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.. زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

রাসুল ﷺ জুমুআর দিনের কথা উল্লেখ করে বললেন, সে দিন এমন এক সময় রয়েছে, যে সময়ে কোনো মুসলমান সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে যা চাইবে, আল্লাহ তাকে তা দান করবেন।[৭১]

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত অপর হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. قَالَ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

জুমুআর দিন এমন একটি সময় আছে, যে সময়ে মুসলমান আল্লাহর কাছে

---

[৭০] প্রাগুক্ত : ২৭৭।

[৭১] *মুআত্তা মালিক* : ২৪০; *সহিহ বুখারি* : ৯৩৫; *সহিহ মুসলিম* : ৮৫১২।

যে কল্যাণ চাইবে, আল্লাহ তাকে সে কল্যাণ দান করেন। তিনি বলেন, তবে সে সময়টা হলো অস্পষ্ট।[৭২]

৩. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ، وَفِيهَا الصَّعْقَةُ، وَالْبَعْثَةُ، وَفِيهَا الْبَطْشَةُ، وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ.

রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'জুমুআবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?' তখন তিনি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার পর বলেন, 'জুমুআর দিনের শেষ তিন ঘণ্টায় এমন কিছু সময় রয়েছে, যে সময় বান্দা আল্লাহর কাছে যে দুআ করে, আল্লাহ সে দুআ কবুল করেন।'[৭৩]

সে সময় কখন? পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে জুমুআর দিনে একটি বিশেষ সময় রয়েছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যে দুআ করে, আল্লাহ তা কবুল করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সে সময় কখন? এর উত্তর আমরা হাদিস থেকে জেনে নেব :

১. আবু বুরদা ইবনু আবি মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন,

قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

আমাকে আবদুল্লাহ ইবনু উমর জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি তোমার পিতা থেকে জুমুআর দিনের বিশেষ সময় সম্পর্কে কোনো হাদিস শুনেছ, যা তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, তিনি বলেছেন; রাসুল ﷺ বলেছেন, "সে সময় হলো ইমাম খুতবা দিতে মিম্বারে বসার পর থেকে সালাত শেষ করা পর্যন্ত।"'[৭৪]

এ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, দুআ কবুলের সে মুহূর্ত হলো ইমাম সাহেব খুতবা শুরুর পর থেকে সালাত শেষ করা পর্যন্ত।

---

[৭২] *সহিহ মুসলিম* : ৮৫২।

[৭৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮১০২।

[৭৪] *সহিহ মুসলিম* : ৮৫৩; *সুনানু আবি দাউদ* : ১০৪৯; *সহিহু ইবনি খুজাইমা* : ১৭৩৯।

২. আমর ইবনু আউফ তিনি তাঁর পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللهَ العَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، قَالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّة سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا.

জুমুআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে সময়ে বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায়, আল্লাহ তা দান করেন। আমরা জিজ্ঞেস করি, 'আল্লাহর রাসুল, সে সময় কোনটি?' রাসুল ﷺ বললেন, 'সালাতের জন্য দাঁড়ানোর পর থেকে তা শেষ করা পর্যন্ত।'[৭৫]

এ হাদিস যদিও অনেকের মতে জয়িফ; কিন্তু তা আগের হাদিসের প্রামাণিকতা শক্তিশালী করে। আবার কিছু হাদিস থেকে বোঝা যায়, দুআ কবুলের সে সময় হচ্ছে আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي فَيَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ، قَالَ: هِيَ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَكُونُ بَعْدَ العَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي؟ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلَّى فِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ؟، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ.

সর্বোত্তম দিন জুমুআর দিন। জুমুআর দিন আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো ও জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে এই দিন। এ দিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায়, আল্লাহ তা দান করেন।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ হাদিস উল্লেখ করি। তিনি বলেন, 'আমি সে সময় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানি।' আমি বলি, 'আমাকে সে সময় সম্পর্কে অবগত করুন।' তিনি

[৭৫] *সুনানুত তিরমিজি* : ৪৮৯; *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ১০৪৯।

বলেন, 'সে সময় আসর পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।' আমি বলি, 'আসরের পর কীভাবে হবে? অথচ রাসুল ﷺ বলেছেন—সালাত পড়া অবস্থায় যা চাইবে?' আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বলেন, 'রাসুল ﷺ কি বলেননি—যে সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকল, সে যেন সালাত পড়ছে?' আমি বলি, 'হ্যাঁ'। তিনি বলেন, 'বিষয়টি এমনই।'[৭৬]

ইমাম তিরমিজি রাহ. এ হাদিসকে 'হাসান সহিহ' বলেছেন।

৪. আবু সায়িদ খুদরি ও আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

জুমুআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায়, আল্লাহ তা দান করেন। সে সময় হলো আসরের পর।[৭৭]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি বলেন, 'হাদিসটি ইমাম আহমাদ তাঁর *মুসনাদে* বর্ণনা করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আবি মাসলামা আল আনসারি। তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন আব্বাস। তাঁদের উভয়কে চেনা যায়নি।' হায়সামি আরও বলেন, 'আব্বাস দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য আব্বাস ইবনু আবদির রাহমান। তাঁর থেকে ইবনু জুরাইজসহ একটি দল বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাজাহ ও ইমাম আবু দাউদ *কিতাবুল মারাসিলে* তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান তাঁকে সিকাহ বলেছেন। কেউ-ই তাঁকে দুর্বল বলেননি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।'[৭৮]

এ হাদিসের একজন রাবি যদিও মাজহুল; কিন্তু হাদিসটি পূর্বের হাদিসের প্রামাণিকতাকে শক্তিশালী করে।

আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমরা জুমুআর দিন আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রত্যাশিত সে সময়কে তালাশ করো।'[৭৯]

হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম তিরমিজি বলেন, 'হাদিসটি এই সনদে গারিব।' হাদিসের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আবি হুমায়দকে কেউ কেউ স্মৃতিশক্তির দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। বলা হয়, হাম্মাদ ইবনু আবি হুমায়দ হলেন আবু ইবরাহিম

[৭৬] *সুনানুত তিরমিজি* : ৪৯১।

[৭৭] *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৬৮৮; *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ৫৫৮৪।

[৭৮] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩০০৯।

[৭৯] *সুনানুত তিরমিজি* : ৪৮৯।

আনসারি। তিনি হাদিস বর্ণনায় ভুলকারী।

রাসুলের কিছু সাহাবি ও ইমামের মতে, সে সময়টা আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আহমাদ ও ইসহাকের মত এ রকমই।

ইমাম আহমাদ বলেন, 'অধিকাংশ হাদিস থেকে বোঝা যায়, জুমুআর দিনের যে সময়ে দুআ কবুল হয়, সে সময় আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।'

৫. আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বর্ণনা করেন,

قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ، قَالَ: بَلَى. إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

রাসুল ﷺ বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি বলি, 'আমরা জানি জুমুআর দিনে এমন একটি সময় আছে, যে সময় বান্দা সালাত পড়া অবস্থায় আল্লাহর কাছে যা চাইবে, আল্লাহ তার চাওয়া পূর্ণ করবেন। সে সময় কোনটি?' তিনি বললেন, 'দিনের শেষ মুহূর্তগুলো।' আমি বলি, 'সে সময় তো সালাত পড়ার নয়।' তিনি বললেন, 'বান্দা যখন সালাত পড়ে সালাতের অবস্থায় বসে থাকে, সেই বসে থাকাটা সালাত পড়ার নামান্তর।'[৮০]

৬. জাবির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

জুমুআর দিনে আল্লাহর কাছে বান্দা যা চাইবে, তিনি তাকে তা দান করবেন। তোমরা সে সময়টি আসরের পর তালাশ করো।[৮১]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে জানা গেল, জুমুআর দিনের সেই বিশেষ মুহূর্তটি আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ইমাম আহমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ হাদিস থেকে এ মতটি প্রমাণিত হয়। আবার কোনো রিওয়ায়াত

---

[৮০] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১১৩৯।

[৮১] *সুনানু নাসায়ি* : ১৩৮৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ১০৪৮।

দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে প্রথমে জানিয়েছিলেন। পরে শবেকদরের মতো ভুলিয়ে দিয়েছেন।

আবু সালামা বলেন, 'আমি আবু সায়িদের কাছে গেলে এ বিষয়ে তাঁর কোনো ইলম রয়েছে কি না সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। এরপর আলোচনার শেষে বলি, 'আবু সায়িদ, আবু হুরায়রা জুমুআর বিশেষ সময় সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এ বিষয়ে কি আপনার জানা আছে?' তিনি বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আমি প্রথমে জানতাম, পরে আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে লাইলাতুল কদরকে।"'[৮২]

আসলে জুমুআর সেই বিশেষ সময় নিয়ে বেশ মতবিরোধ রয়েছে। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'এ বিষয়ে ৪০ টিরও বেশি মত রয়েছে।'[৮৩]

জুমুআর দিনে একটি সময় রয়েছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায়, তিনি তা দান করেন। বিষয়টি নিশ্চিত। তবে পুরো দিন আল্লাহর ইবাদতে পার করা; বিশেষত আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। খুতবা থেকে শুরু করে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দিন।

আট. জুমুআর দিন সুরা কাহাফ তিলাওয়াতের ফজিলত

জুমুআর দিনের বিশেষ আমলের একটি হচ্ছে সুরা কাহাফ তিলাওয়াত। এর রয়েছে বিশেষ ফজিলত। এ-সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস প্রথমে উল্লেখ করছি :

১. আলি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ تكون فَإِن خرج الدَّجَّال عصم مِنْهُ.

যে জুমুআর দিন সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তাকে সব ধরনের ফিতনা থেকে পুরো সপ্তাহ নিরাপদ রাখবেন। যদি দাজ্জালও বের হয়, তবু আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখবেন।[৮৪]

২. আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

---

[৮২] *মুসনাদু আহমাদ* : ১১৬২৪; *সহিহু ইবনি খুজাইমা* : ১৭৪১।

[৮৩] *বুলুগুল মারাম* : ৪৬৬।

[৮৪] *আল-আহাদিসুল মুখতারা* : ৪২৯, মাকদিসি।

যে জুমুআর দিন সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করে, উভয় জুমুআর মধ্যে তাকে নুর দ্বারা আলোকিত করা হয়।[৮৫]

হাদিসটি সম্পর্কে হাকিম নিশাপুরি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি *বুখারি* ও *মুসলিমের* শর্তে উন্নীত; কিন্তু তাঁরা তাখরিজ করেননি।' যদিও ইমাম জাহাবি *তালখিসুল মুসতাদরাকে* হাকিমের বক্তব্যের ওপর আপত্তি করেছেন। তিনি বলেন, 'হাদিসের বর্ণনাকারী নুআইম হলেন আপত্তিকর।'

জাহাবি রাহ.-এর আপত্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ.। তিনি বলেন, 'হাদিসের বর্ণনাকারী নুআইম যদিও আপত্তিকর, তাঁর পক্ষে ইয়াজিদ ইবনু মাখলাদ রয়েছেন, যিনি হাদিসটি নুআইমের উসতাজ হুশাইম থেকে বর্ণনা করেছেন।'[৮৬] এ ছাড়া শায়খ আলবানি *সাহিহুল জামিতে* এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন।[৮৭]

৩. ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

من قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْف فِي يَوْم الْجُمُعَة سَطَعَ لَهُ نور من تَحت قدمه إِلَى عنان السَّمَاء يضِيء لَهُ يَوْم الْقِيَامَة وَغفر لَهُ مَا بَين الجمعتين.

যে জুমুআর দিন সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করে, তার পায়ের নিচ থেকে আসমান পর্যন্ত একটি নুর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যা তাকে কিয়ামতের দিন আলো দেবে। এ ছাড়া তার উভয় জুমুআর মধ্যখানের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[৮৮]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম মুনজিরি বলেন, 'ইবনু মারদুয়াহ তাঁর তাফসিরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এমন সনদে, যে সনদে অসুবিধা নেই।'

সবগুলো হাদিস একত্রিত করলে জুমুআর দিন সুরা কাহাফ পড়ার বিশেষ ফজিলত প্রমাণিত হয়। আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

নয়. জুমুআর খুতবা কেন আরবিতে দিতে হবে

বিষয়টি সমাধানকৃত। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল মানুষ আরবিভাষায় জুমুআর খুতবা দিয়ে আসছে, সেটা নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। তবে বর্তমানে হাদিসের

---

[৮৫] *আল-মুসতাদরাক* : ৩৩৯২; *আস-সুনানুল কুবরা* : ৬২০৯।

[৮৬] *ইরওয়াউল গালিল* : ৩/৯৬।

[৮৭] *সহিহুল জামি* : ৬৪৭০।

[৮৮] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ১০৯৮; *কাশফুল খাফা* : ২৫৭০, আজলুনি।

দোহাই দিয়ে সমাজে কিছু মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছেন। তারা জোরেশোরে প্রচার চালাচ্ছেন, জুমুআর খুতবা আরবিভাষায় দেওয়া ভুল; প্রত্যেককেই তার মাতৃভাষায় জুমুআর খুতবা দিতে হবে।

শায়খ খলীলুর রহমান ইবনু ফজলুর রহমান। লা-মাজহাবিদের অন্যতম শায়খ। *চার মাজহাবের অন্তরালে* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। সে গ্রন্থের ২৬ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন, 'ইজমা শরিয়তের কিছুই না।' ২৭ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখেন, 'ইসলামে রায় বা কিয়াসের কোনো স্থান নেই।'

শায়খের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারলাম, তারা শুধু কুরআন-সুন্নাহকে শরিয়তের দলিল মনে করেন, ইজমা ও কিয়াসকে নয়। কুরআন ও হাদিসে যা পান, তার ওপর আমল করেন। শায়খগণ ইদানীং জোরেশোরে প্রচার করছেন, জুমুআর খুতবা মাতৃভাষায় দিতে হবে। যখন তাদের বলা হয়, জুমুআর খুতবা মাতৃভাষায় দেওয়ার পক্ষে কুরআনের আয়াত অথবা সহিহ হাদিস পেশ করুন। তখন তারা শুরু করেন কিয়াস! বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত করতে চান, জুমুআর খুতবা দিতে হবে মাতৃভাষায়। অথচ তারা সর্বযুগে মুসলিম উম্মাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ইমামদের ব্যাপারেও খারাপ মন্তব্য করেন কিয়াস করার কারণে! তাদের যদি বলা হয়, সাহাবিগণ তো দীনের দাওয়াত নিয়ে পুরো পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন। এমন জায়গায় জুমুআর সালাত পড়িয়েছেন, যেখানে একজন লোকও আরবি বোঝে না। সেখানে সাহাবিগণ আরবি বাদ দিয়ে ওই এলাকার স্থানীয় ভাষায় খুতবা দিয়েছেন, এমন একটা প্রমাণ দেখান। তখনো তারা বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন।

যদি বলা হয়, রাসুলের সঙ্গে অনেক অনারবি সাহাবি জুমুআ পড়েছেন। তাদের বোঝার সুবিধার্থে রাসুল ﷺ অনারবি ভাষায় খুতবা দিয়েছেন, অথবা কাউকে খুতবা অনুবাদ করে দিতে বলেছেন; সহিহ হাদিস থেকে এমন একটি প্রমাণ দেখান। উত্তরহীন হয়ে তখনো বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করবে, জুমুআর খুতবা দিতে হবে মাতৃভাষায়। তখন তারা ভুলে যান তাদের বক্তব্য—'ইসলামে রায় বা কিয়াসের স্থান নেই।' আপনি লক্ষ করবেন, একজন সাধারণ মানুষও যখন কোনো ভয় ছাড়া ইজতিহাদ করছে, তখন আর মুখে থাকে না সহিহ হাদিসের জিকির। মুজতাহিদদের তরে তখন ক্ষণিকের জন্য খুলে যায় ইজতিহাদের দরজা।

পাঠক, এ পর্যায়ে দেখে নিন শায়খ মুজাফফার বিন মুহসিনের ইজতিহাদ! তিনি লেখেন, 'বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে আরবিভাষায় জুমুআর খুতবা দেওয়া অর্থহীন ও সুন্নাতের বরখেলাফ। রাসুল ﷺ মানুষের সামনে আরবিভাষায় খুতবা

দিতেন না; বরং তিনি তাঁর মাতৃভাষায় খুতবা দিতেন, যা ছিল আরবি।'[৮৯]

কত চমৎকার ইজতিহাদ! আচ্ছা, সাহাবিগণ অনারবে তাহলে কি ওই এলাকার ভাষায় খুতবা দিয়েছেন? ১৪০০ বছর ইতিহাসে প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, ফকিহগণ কোন ভাষায় খুতবা দিয়েছেন? তাঁদের কারও কি এ কিয়াস করার যোগ্যতা ছিল না? তারা কেন বললেন, আরবিভাষায় খুতবা দেওয়া হলো আমলে মুতাওয়ারাস তথা সর্বযুগ থেকে চলে আসা আমল?

আচ্ছা, আজান মানে মানুষকে সালাতের দিকে ডাকা। মক্কা-মদিনার মাতৃভাষা আরবি, এ জন্য সেখানে আজান আরবিভাষায় দেওয়া হয়েছে! আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এখনকি বাংলাদেশে আরবিতে আজান দেওয়া অর্থহীন ও সুন্নাতের পরিপন্থি আমল নয়? নাকি আজানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মাতৃভাষা আরবি? শায়খগণ তখন রেগে গিয়ে বলবেন, 'তোমরা কুরআন-হাদিস বাদ দিয়ে তোমাদের বাপ-দাদার অনুসরণ করে অন্ধ হয়ে গেছ।' এ ধরনের আরও অনেক চটকদার কথা তখন তারা বলবেন।

আচ্ছা শায়খ, হাদিসে যে বিভিন্ন জিকিরের কথা রয়েছে, সেগুলো তো হাদিসে আরবিভাষায় এসেছে। কারণ, আরবদের মাতৃভাষা আরবি। এখন যদি 'আলহামদুলিল্লাহ'-এর জায়গায় 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর' বলে সারা দিন জিকির করি, তাহলে 'আলহামদুলিল্লাহ' জিকির করার সাওয়াব পাব কি না? কারণ, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। শায়খগণ তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আপনাকে জাহান্নামের চৌরাস্তায় পৌঁছিয়ে দিতে পারেন!

আরবিভাষায় খুতবা দেওয়া হলো ১৪০০ বছরের মুসলমানদের আমলে মুতাওয়ারাস। এ সম্পর্কে কয়েকজন ইমামের বক্তব্য নিচে তুলে ধরছি :

ইমাম নববি রাহ. বলেন, 'জুমুআর খুতবা ও অন্যান্য খুতবার রুকন হলো আল্লাহর প্রশংসা। আল্লাহর প্রশংসা ছাড়া জুমুআর খুতবা শুদ্ধ হবে না। ওয়াজিবের সর্বনিম্ন পরিমাণ "আলহামদুলিল্লাহ" বলা। এ বিষয়ে ফিকহের গ্রন্থাদিতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে; আর খুতবার জন্য শর্ত হলো, তা আরবিভাষায় হতে হবে।'[৯০]

মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ. বলেন, 'জুমুআর খুতবা আরবিভাষায় হতে হবে। পূর্বের ও পশ্চিমের মুসলমানদের ধারাবাহিক আমল খুতবা

---

[৮৯] *জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত* : ৩৪৭।

[৯০] *আল-আজকার* : ১/১১২।

আরবিভাষায় হওয়ার ওপর। যদিও অনেক জায়গার শ্রোতা আরবি ছিলেন না।'[৯১]

ইমাম রাফিয়ি রাহ. বলেন, 'খুতবার জন্য ভাষা কি আরবি হওয়া শর্ত? বিশুদ্ধ কথা হলো, ভাষা আরবি হওয়া শর্ত।'[৯২]

খুতবার শরয়ি অবস্থান

খুতবা স্রেফ ভাষণ, নাকি শরিয়তে এর ভিন্ন কোনো হুকুম রয়েছে? যদি অন্যান্য ভাষণ বা নসিহতের মতো খুতবাও হয়, তাহলে তো খুতবা মাতৃভাষায় দেওয়া উচিত। কেননা, এই খুতবার মাধ্যমে মানুষকে আপনি নসিহত করছেন; অথচ অধিকাংশ মানুষ আপনার সেই নসিহতের ভাষা বুঝতে পারছে না!

শরিয়তের আরও কিছু হুকুম আমরা দেখি, যেগুলো অধিকাংশ অনারবি বোঝে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো আরবিভাষায় দেওয়া হচ্ছে। আজানের কথাই ধরুন। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ আরবি বোঝে না। আজানে কী বলা হচ্ছে, সেটি সে সারা জীবনেও হয়তো জানতে পারেনি। আজান বাংলাতে দেওয়া হলে সবাই সহজে বুঝতে পারবে। যে হিকমাতে বাংলায় খুতবা প্রদানের কথা বলা হচ্ছে, সে হিকমাত আজানের মধ্যেও রয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে আজান আরবিতে দেওয়া হচ্ছে। আজান মাতৃভাষায় দেওয়ার মর্মে কেউ ফাতওয়া চালাচালি বা লিফলেটবাজি করেননি।

হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, খুতবা হলো জিকির। আর জিকিরের ক্ষেত্রে শরয়ি নীতি হলো, শরিয়তপ্রণেতা যে ভাষায় তা আদায় করেছেন, সে ভাষায় আদায় করতে হবে। উদাহরণত, প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলার ফজিলত রয়েছে। এখন যদি কেউ ৩৩ বার 'আল্লাহ পবিত্র', ৩৩ বার 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর', ৩৪ বার 'আল্লাহ মহান' পড়ে, তাহলে নিশ্চিত যে, হাদিসের বর্ণিত সাওয়াব সে পাবে না। যদিও আল্লাহ তাকে সাওয়াব দিতে পারেন তাঁর মহিমা বর্ণনার জন্য। খুতবাও জিকির, এ জন্য আমরা দেখি, সাহাবিগণ দীনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবী চষে বেড়ালেও কোথাও তারা অনারবি ভাষায় খুতবা দিয়েছেন; এমন উদাহরণ আপনি ইতিহাস থেকে একটিও দেখাতে পারবেন না। খুতবা যে জিকির, এ-সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস দেখুন।

---

[৯১] *জাওয়াহিরুল ফিকহ* : ১/৩৫৫।

[৯২] *ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন* : ৩/৩২৬।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَة، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

যে জুমুআর দিন ফরজ গোসল করে সবার আগে মসজিদে আসে, সে একটি উট কুরবানির সাওয়াব পায়। এরপর যে আসে, সে একটি গরু কুরবানির সাওয়াব পায়। তিন নম্বরে যে আসে, সে একটি ছাগল কুরবানির সাওয়াব পায়। চার নম্বরে আসা ব্যক্তি একটি মোরগ কুরবানির সাওয়াব পায়। পাঁচ নম্বরে যে মসজিদে আসে, সে একটি ডিম সাদাকার সাওয়াব পায়। এরপর ইমাম সাহেব যখন খুতবা দিতে বের হন, ফেরেশতাগণ মসজিদে উপস্থিত হয়ে জিকির তথা খুতবা শুনেন।[৯৩]

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত অপর হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الْبَيْضَةَ.

জুমুআর দিন মসজিদের প্রত্যেক দরজায় এসে ফেরেশতাগণ অবস্থান নেন। তাঁরা প্রথমদিকে আগমনকারীর নাম একের পর এক লিখতে থাকেন। ইমাম যখন খুতবা দিতে বসেন, তখন তাঁরা খাতাপত্র গুটিয়ে খুতবা শুনতে বসে যান। জুমুআর সালাতে প্রথম আগমনকারী একটি উট সাদাকার সাওয়াব পাবে। দুই নম্বরে আগমনকারী একটি গরু সাদাকার সাওয়াব পাবে। তিন নম্বরে আগমনকারী একটি ছাগল সাদাকার সাওয়াব পাবে। চার নম্বরে আগমনকারী মুরগি ও ছয় নম্বরে আগমনকারী ডিম সাদাকা করার সাওয়াব পাবে।[৯৪]

[৯৩] *সহিহ বুখারি* : ৮৮১; *সহিহ মুসলিম* : ৮৫০।

[৯৪] প্রাগুক্ত : ৯২৯; প্রাগুক্ত: ৮৫০।

উপরিউক্ত হাদিসসমূহ থেকে বোঝা গেল খুতবা হলো জিকির। এ জন্য ফেরেশতাগণও সে সময়ে খাতাপত্র গুটিয়ে গভীর মনোযোগে খুতবা শুনেন। জিকির শরিয়তপ্রণেতার ভাষায় আদায় করতে হয়। এ জন্য যুগ যুগ ধরে আরব-অনারব সবাই আরবিভাষায় খুতবা দিয়ে আসছে। শ্রোতাদের বোধগম্য নয়; এ যুক্তি দিয়ে মাতৃভাষায় খুতবা প্রদানের বিষয়ে লিফলেট চালাচালি করেননি। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

দশ. জুমুআর সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি

অন্যান্য সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে রাসুল ﷺ বিভিন্ন হাদিসে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এমনকি জামাআতে যারা শরিক হয় না, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আমার ইচ্ছা হয় আমি কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দিই; আর সালাতের আজান দিতে হুকুম দিই। তারপর আমি এক ব্যক্তিকে হুকুম করি, যেন সে লোকদের সালাতের ইমামতি করে; আর আমি ওই সকল লোকের দিকে যাই, যারা সালাতের জামাআতে হাজির হয়নি এবং তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই।[৯৫]

জুমুআর সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারেও রাসুল ﷺ কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কারও জুমুআর সালাত ছুটে গেলে তার করণীয় সম্পর্কেও হাদিসে উল্লেখ আছে। এ-সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. আবুল জাআদ আজ জামরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

যে অলসতাবশত তিনটি জুমুআ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর

[৯৫] *সহিহ বুখারি* : ৬৪৪।

মেরে দেন।[৯৬]

২. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مراتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ.

যে ব্যক্তি কোনো প্রয়োজন ছাড়া তিনটি জুমুআর সালাত ছেড়ে দিলো, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর এঁটে দেবেন।[৯৭]

৩. কাব ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

এমন একদল আসবে, জুমুআর দিন আজান শোনার পরও যারা মসজিদে আসবে না, আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। এরপর তারা উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।[৯৮]

৪. ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.

যে ধারাবাহিক তিনটি জুমুআ ছেড়ে দিলো, সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল।[৯৯]

৫. হারিসা ইবনু নুমান রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ، فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ، فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ.

তোমাদের কেউ কেউ গৃহপালিত পশুর মালিক হবে। এরপর সালাতের জামাআতের সময় হবে। তার পশুগুলো তাকে বিরত রাখবে। সে বলবে, যদি এরচেয়ে বেশি ঘাসযুক্ত চারণভূমি খুঁজি, তাহলে ভালো হবে। তখন সে জুমুআ ছাড়া অন্য কোনো সালাতে উপস্থিত হয় না। একসময় সে আরও

[৯৬] *সুনানু আবি দাউদ*: ১০৫২; *মুসনাদু আহমাদ*: ১৫৪৯৭; *সুনানু নাসায়ি*: ১৩৬৯; *আল-মুসতাদরাক*: ১০৩৪।

[৯৭] *মুসনাদু আহমাদ*: ২২২৫৫৮।

[৯৮] *সহিহ মুসলিম*: ৮৬৫।

[৯৯] *মুসনাদু আবি ইয়ালা আল-মাওসিলি*: ২৭১২।

ঘাসযুক্ত চারণভূমির খুঁজে জামাআত ও জুমুআ উভয়টি ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন।[১০০]

৬. সামুরা ইবনু জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ.

যে ওজর ছাড়া জুমুআর সালাত ছেড়ে দিলো, সে যেন এক দিনার সাদাকা করে। যে এক দিনার পাবে না, সে যেন অর্ধেক দিনার সাদাকা করে।[১০১]

৭. জাবির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ জুমুআর দিনে দাঁড়িয়ে বলেন,

عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْضُرُهَا وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: عَسَى يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

সামনে এমন লোক আসবে, যারা মদিনা থেকে এক মাইল দূরত্বে থাকবে, যার কারণে প্রথমদিকে জুমুআয় এলেও পরে আসা বাদ দিয়ে দেবে। এমনভাবে দুই ও তিন মাইলের উদাহরণ দেওয়ার পর রাসুল ﷺ বলেন, আল্লাহ তখন তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন।[১০২]

মোটকথা, অন্য দিনের তুলনায় জুমুআবারের যেমন বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, ঠিক তেমনি জুমুআর সালাতেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ আমাদের জুমুআর সব হুকুম মেনে হাদিসে বর্ণিত আমলগুলো করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

[১০০] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৬৭৮; *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ১০৯৫।

[১০১] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৫৫৩৫।

[১০২] *মুসনাদু আবি ইয়ালা আল-মাওসিলি* : ২১৯৮; *আল-মাতালিবুল আলিয়া* : ৭৫৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাররাম : করণীয় ও বর্জনীয়

মুহাররাম মাস দিয়ে আরবি বছর শুরু হয় এবং জিলহজে গিয়ে বছর পূর্ণ হয়। মুমিনের জন্য প্রত্যেক দিন সমান। তার চিন্তা থাকবে, আমার আজকের দিন গতকাল থেকে কীভাবে আরও বেশি ফলপ্রসূ হয়, সর্বদা সে ফিকির করা। এ জন্য রাসুল ﷺ এক হাদিসে বলেন,

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا أَوْ مُعْتِقُهَا.

প্রত্যেক মানুষ প্রত্যুষে উপনীত হয়। এরপর নিজেকে বিক্রি করে; হয়তো সে লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১০৩]

মুমিন প্রতিদিনই নিজেকে নিয়ে সওদা করে; হয়তো সে সফল হয় অথবা ব্যর্থ। এ জন্য মুমিনের নববর্ষ উদ্‌যাপন বলতে কিছু নেই। তার চিন্তা থাকবে, প্রত্যেক দিনের সওদায় সে কীভাবে সফল হবে।

মুহাররাম সম্মানিত চার মাসের একটি। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

আসমান-জমিন সৃষ্টিলগ্ন থেকে আল্লাহর কাছে মাস হলো ১২টি। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। [সুরা তাওবা : ৩৬]

বিদায়হজে রাসুল ﷺ সম্মানিত সে চার মাসের নাম উল্লেখ করেছেন। আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

[১০৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ২২৯০৮।

আসমান-জমিনে সৃষ্টিলগ্ন থেকে সময় তার মতো করে চলছে। বছর ১২ মাসে, তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত মাস। তিনটি ধারাবাহিক—জুলকাদা, জিলহজ ও মুহাররাম। চতুর্থটি হলো রজব।[১০৪]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ চার মাসে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম ছিল। কারণ, সম্মানিত মাসে রক্তপাত খারাপ দেখায়। যদিও পরে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, মাস চারটি সম্মানিত বটে, তবে সে সময়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে সমস্যা নেই।

অনেক আলিমের মতে, সম্মানিত চার মাসের মধ্যে মুহাররাম সর্বশ্রেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে আবু জার রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ: أَيّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟ وَأَيّ اللَّيْلِ خَيْرٌ؟ وَأَيّ الْأَشْهُرِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرُكَ كَمَا أَخْبَرَنِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟ وَأَيّ اللَّيْلِ خَيْرٌ؟ وَأَيّ الْأَشْهُرِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لِي: أَزْكَى الرِّقَابِ أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَخَيْرُ اللَّيْلِ جَوْفُهُ، وَأَفْضَلُ الْأَشْهُرِ شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.

আমি রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি, 'আল্লাহর রাসুল, কোন বাহন ভালো? রাতের কোন অংশ ও কোন মাস সর্বোত্তম?' রাসুল ﷺ বলেন, 'যে বাহনের দাম বেশি, সেটি বেশি কল্যাণকর; আর রাতের সর্বোত্তম অংশ হলো মধ্যভাগ; সর্বোত্তম মাস আল্লাহর মাস, যাকে তোমরা মুহাররাম বলে ডাকো।'[১০৫]

এখানে অনেকের সন্দেহ হতে পারে, মুহাররাম কি রমজানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ? কারণ, এ হাদিসে রাসুল ﷺ ব্যাপকভাবে মুহাররামকে অন্যান্য মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। না, বিষয়টি এমন নয়; বরং এখানে শ্রেষ্ঠ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রমজানের পরে শ্রেষ্ঠ মাস হলো মুহাররাম। বিষয়টি আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. হাসান বসরি রাহ.-এর কথা দ্বারা স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, 'কোন মাস উত্তম এ বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। হাসান বসরিসহ কিছু আলিমের মতে সর্বোত্তম মাস হলো মুহাররাম। পরবর্তী যুগের একদল এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ওয়াহাব ইবনু জারির কুররা ইবনু খালিদের সূত্রে হাসান বসরি থেকে

---

[১০৪] *সহিহ বুখারি* : ৩১৯৭।

[১০৫] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৪২১৬, নাসায়ি।

বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বছর শুরু করেন সম্মানিত মাস দ্বারা; বছর শেষ করেন সম্মানিত মাস দ্বারা। রমজানের পর মুহাররামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মাস নেই।"'[১০৬]

মূলত রমজানের পর কোন মাস শ্রেষ্ঠ—মতবিরোধ হলো সে বিষয়ে। অনেকের মতে রমজানের পর শ্রেষ্ঠ মাস হলো মুহাররাম। রাসুলের এ হাদিস দ্বারা সে মত শক্তিশালী হয়।

মোটকথা, মুসলমানদের বছর শুরু হয় একটি সম্মানিত মাস দ্বারা, যে মাসের বিশেষ কিছু আমল রয়েছে। সে সম্পর্কে এখন আলোকপাত করব :

এক. মুহাররামের রোজা

১. মুহাররামের রোজার বিশেষ ফজিলত রয়েছে। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ.

রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা মুহাররামের রোজা; আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত রাতের সালাত।[১০৭]

২. এই হাদিস আরেক সনদে বর্ণিত হয়েছে। সে হাদিসের মতন এ রকম,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. قِيلَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ قَالَ: شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.

রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'ফরজ সালাতের পর কোন সালাত সর্বোত্তম এবং রমজানের পর কোন রোজা সর্বোত্তম?' রাসুল ﷺ বলেন, 'ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত রাতের মধ্যভাগের সালাত এবং রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা মুহাররামের রোজা।'[১০৮]

আলি রা.-কে একব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, 'রমজানের পরে আমি কোন মাসে রোজা রাখব?' তিনি বলেন, আমি রাসুলের কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন

---

[১০৬] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ৪৭।

[১০৭] *সহিহ মুসলিম* : ১১৬৩।

[১০৮] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮০২৬।

করে, "আল্লাহর রাসুল, রমজানের পর কোন মাসে আপনি আমাকে রোজা রাখার নির্দেশ দেবেন?" রাসুল ﷺ বলেন, "যদি তুমি রমজানের পর রোজা রাখতে চাও, তাহলে মুহাররামে মাসে রোজা রাখো। কারণ, মুহাররাম আল্লাহর মাস।"'[১০৯]

ইমাম তিরমিজি রাহ. হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'হাদিসটি হাসান ও গারিব।'

হাদিসটিকে যদিও অনেক মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন; কিন্তু এতে সমস্যা নেই। কারণ, হাদিসের বিষয়বস্তু *সহিহ মুসলিমের* হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ ছাড়া বিষয়টি অনেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

৩. জুনদুব ইবনু সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.

ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত রাতের মধ্যভাগের সালাত। আর রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা আল্লাহর মাসের রোজা; যে মাসকে তোমরা মুহাররাম বলে থাকো।[১১০]

এই হাদিসের ব্যাপারে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য।'[১১১]

৪. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ لَهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا.

যে আরাফার দিনে রোজা রাখবে, সেটা তার দু-বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে; আর যে মুহাররামের কোনো একদিন রোজা রাখবে, সেই একদিনের রোজা পুরো ৩০ দিনের কাফফারা হয়ে যাবে।[১১২]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি রাহ. *আল-মুজামুস সাগিরে* বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হায়সাম ইবনু হাবিব বর্ণনা করেছেন সাল্লাম থেকে; আর সাল্লাম হচ্ছেন জয়িফ। এ ছাড়া হায়সাম ইবনু হাবিবের

---

[১০৯] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৯৩১৪; *সুনানুত তিরমিজি* : ৭৪১।

[১১০] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৬৪১৭, তাবরানি।

[১১১] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫১৫০, হায়সামি।

[১১২] *আল-মুজামুস সাগির* : ৯৬৩, তাবরানি।

ব্যাপারে ইমাম জাহাবি ব্যতীত অন্য কাউকে কথা বলতে দেখিনি। ইমাম জাহাবি তাঁকে একটি হাদিসের কারণে অভিযুক্ত করেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান তাঁকে সিকাহ বলেছেন।'[১১৩]

ইমাম মুনজিরি হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি *আল-মুজামুস সাগিরে* বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি গারিব। তবে সনদে কোনো সমস্যা নেই। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হায়সাম ইবনু হাবিবকে ইবনু হিব্বান সিকাহ বলেছেন।'[১১৪]

মুহাররামের নফল রোজার আলাদা ফজিলত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। রাসুল ﷺ এ বিষয়ে স্পষ্ট বলেছেন, 'রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা মুহাররামের রোজা।' আল্লাহ তাআলা মুহাররামে আমাদের বেশি বেশি নফল রোজা রাখার তাওফিক দিন।

দুই. আশুরার করণীয় ও বর্জনীয়

মুহাররামের ১০ তারিখকে আশুরা বলা হয়। আল্লাহ তাআলা যে কয়েকটি দিনকে বিশেষভাবে মহিমান্বিত করেছেন, আশুরা তার মধ্যে অন্যতম। সময়ের বাঁকে বাঁকে ঐতিহাসিক কিছু ঘটনা ঘটেছিল আশুরার দিনে। বিশেষত মুসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা ফিরআউনের হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। এ জন্য ঐতিহাসিকভাবেও দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। আশুরার দিনটি কেন গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমে সে বিষয়ে আলোকপাত করছি :

১. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

রাসুল ﷺ মদিনায় আগমনের পর দেখেন ইয়াহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে। রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমরা কেন রোজা রাখছ?' তারা বলল, 'আল্লাহ তাআলা এই দিন বনি ইসরাইলকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' রাসুল ﷺ তা শুনে বললেন, 'মুসা আ.-এর বিষয়ে আমি তোমাদের চেয়ে

[১১৩] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫১৪৪।

[১১৪] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ১৫২৯, মুনজিরি।

বেশি হকদার।' রাসুল ﷺ তখন নিজে রোজা রাখেন এবং অন্যদেরও রাখার নির্দেশ দেন।[১১৫]

২. আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ اليَهُودُ عِيدًا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَصُومُوهُ أَنْتُمْ.

আশুরার দিনকে ইয়াহুদিরা ইদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাসুল ﷺ তখন আমাদের বললেন, 'তোমরা এ দিন রোজা রাখো।'[১১৬]

৩. রাসুল ﷺ বিশেষ গুরুত্বসহ আশুরার রোজা রাখতেন। ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.

রমজান ও আশুরার রোজার মর্যাদালাভের জন্য আমি রাসুল ﷺ-কে যেভাবে আশুরা ও রমজান তালাশ করতে দেখেছি, অন্য কোনো রোজা সেভাবে তালাশ করতে দেখিনি।[১১৭]

তিন. আশুরার রোজার অবস্থা

রাসুলের আশুরার রোজার চারটি অবস্থা ছিল। এ বিষয়ে ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা সামনে রেখে আলোচনা করব :

প্রথম অবস্থা

রাসুল ﷺ মক্কায় রোজা রেখেছিলেন; কিন্তু মানুষদের রোজা রাখার নির্দেশ দেননি। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَتْ فَرِيضَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الَّذِي يَصُومُهُ وَتَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ.

[১১৫] *সহিহ বুখারি* : ১৯০০।

[১১৬] প্রাগুক্ত : ১৯০১।

[১১৭] প্রাগুক্ত : ১৯০২।

আশুরার দিন কুরাইশরা রোজা রাখত। রাসুল ﷺ-ও রোজা রাখতেন। তিনি মদিনায় এসে নিজে রোজা রাখেন এবং অন্যদের রাখার নির্দেশ দেন। এর পর রমজানের ফরজ রোজার বিধান নাজিল হলে সবাই রমজানের রোজা রাখেন এবং আশুরাকে ছেড়ে দেন। পরে কেউ আশুরার রোজা রাখেন, কেউ ছেড়ে দেন।[১১৮]

এ হাদিস থেকে জানা গেল, রাসুল ﷺ মক্কায় থাকাকালে কুরাইশরা এ দিন রোজা রাখত। রাসুল ﷺ-ও রাখতেন। তবে কাউকে রোজা রাখার নির্দেশ দেননি।

দ্বিতীয় অবস্থা

রাসুল ﷺ মদিনায় এসে দেখেন, সেখানকার আহলে কিতাব আশুরার দিনকে সম্মান করছে এবং সে দিন রোজা রাখছে। রাসুল ﷺ আহলে কিতাবের যেসব বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধ আসেনি, সেসব বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা পছন্দ করতেন। এ জন্য তিনি আশুরার দিনে রোজা রাখেন এবং অন্যদেরও উৎসাহ দেন। এমনকি মুসলমান শিশুরাও অনেকে সে দিন রোজা রাখত।

১. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى تَصُومُونَهُ. فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

রাসুল ﷺ মদিনায় এসে সেখানের ইয়াহুদিদের আশুরার দিনে রোজা রাখতে দেখে তাদের বলেন, 'তোমরা এ দিন কেন রোজা রাখো?' তারা বলে, 'এ দিন একটি মহান দিন। আল্লাহ তাআলা মুসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছেন। মুসা আ. কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রোজা রেখেছেন, তাই আমরাও রাখি।' রাসুল ﷺ বললেন, 'মুসার ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে আমরা বেশি হকদার।' রাসুল ﷺ তখন রোজা রাখেন এবং অন্যদেরও রাখার নির্দেশ দেন।[১১৯]

---

[১১৮] *মুসনাদু আহমাদ*: ২৪০১১।

[১১৯] *সহিহ মুসলিম*: ১১৩০।

২. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأُنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا هَذَا مِنَ الصَّوْمِ قَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي نَجَّى اللهُ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْغَرَقِ وَغَرَّقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَهَذَا يَوْم اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ نُوحٌ وَمُوسَى شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالصَّوْمِ.

রাসুল ﷺ কয়েকজন ইয়াহুদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা আশুরার রোজা রেখেছিল। তিনি তাদের বলেন, 'রোজা রাখার কারণ কী?' তারা বলে, 'এ দিন আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরআউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন। এ দিন নুহ আ.-এর জাহাজ জুদি পাহাড়ে আটকেছিল। নুহ ও মুসা আ. আল্লাহর শুকরিয়া আদায়স্বরূপ এ দিন রোজা রেখেছেন।' রাসুল ﷺ তখন বলেন, 'আমরা মুসার ক্ষেত্রে বেশি হকদার।' তিনি তখন সাহাবিদের সে দিন রোজা রাখার নির্দেশ দেন।[১২০]

হাদিসটির ব্যাপারে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হাবিব, তাঁর থেকে তাঁর ছেলে ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।'[১২১]

৩. সালামা ইবনু আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত;

مَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ.

রাসুল ﷺ আসলাম গোত্রের এক লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বলেন, 'মানুষের মধ্যে ঘোষণা দাও, যে কোনোকিছু খেয়ে ফেলেছে, সে যেন বাকি দিন রোজা রাখে। যে কিছু খায়নি, সে-ও যেন বাকি দিন রোজা রাখে। কারণ, আজকের দিন হলো আশুরার দিন।'[১২২]

৪. এ বিষয়ে রুবাইয়ি বিনতু মুওয়াইয়িজ রা. থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلِيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ

[১২০] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৭১৭।

[১২১] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫১০৬।

[১২২] *সহিহ বুখারি* : ২০০৭; *সহিহ মুসলিম* : ১১৩৫।

لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

রাসুল ﷺ আশুরার দিন ভোরে আনসারিদের গ্রামের দিকে একজনকে পাঠান। সে গিয়ে বলে, 'সকালে যে কিছু খেয়ে ফেলেছ, সে যেন বাকি দিন রোজা রাখে; আর যে প্রভাত পার করেছে রোজা রেখে, সে যেন পুরো দিন রোজা রাখে।'

বর্ণনাকারী সাহাবি বলেন, 'এরপর থেকে আমরা রোজা রাখি। এমনকি আমাদের শিশুরাও রাখে। চামড়ার লোম দ্বারা খেলাধুলায় আমরা তাদের ব্যস্ত রাখতাম। যখন কেউ খাবারের জন্য কাঁদত, তাদের সেটা দিতাম। এভাবে ইফতারের সময় চলে আসত।'[১২৩]

এসব হাদিস থেকে জানা গেল, রাসুল ﷺ মদিনায় গিয়ে যখন জানতে পারেন, এ দিন আল্লাহ তাআলা মুসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছেন, মুসা আ. তখন আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে দিন রোজা রাখতেন। ইয়াহুদিরা মুসা আ.-এর অনুসরণ করে রোজা রাখে। রাসুল ﷺ বললেন, মুসা আ.-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে আমরা অধিক হকদার। তিনি তখন রোজা রাখতে শুরু করেন এবং সাহাবিগণকেও রোজা রাখার নির্দেশ দেন।

রমজানের আগে আশুরার রোজা ওয়াজিব ছিল, নাকি সুন্নাতে মুআক্কাদা? ইমাম আবু হানিফা ও আহমাদ রাহ.-এর মত হলো, রমজানের পূর্বে আশুরার রোজা ওয়াজিব ছিল। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশুরার রোজার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। এখন কেউ চাইলে রাখতে বা ছাড়তেও পারে। ইমাম শাফিয়িসহ কিছু ইমামের বক্তব্য হলো, আশুরার রোজা সবসময় সুন্নাত ছিল। এখনো মুসলমানদের ইচ্ছাধীন; রাখা ও ছাড়ার অধিকার রয়েছে।

তৃতীয় অবস্থা

রমজানের রোজা যখন ফরজ হয়, তখন রাসুল ﷺ আশুরার রোজার ব্যাপারে পূর্বের মতো গুরুত্বারোপ করেননি। এ বিষয়ে আয়েশা সিদ্দিকার হাদিস পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

১. ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ

[১২৩] *সহিহ বুখারি*: ১৯৬০।

রাসুল ﷺ আশুরার রোজা রাখতেন এবং সাহাবিদের রাখার নির্দেশ দিতেন। এর পর যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো, তখন আশুরার রোজা রাখা ছেড়ে দেন।[১২৪]

২. *সহিহ মুসলিমে* ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

জাহিলি যুগে লোকেরা আশুরার দিনে রোজা রাখত। রাসুল ﷺ ও মুসলমানগণ রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার দিন রোজা রাখতেন। এর পর যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো, তখন রাসুল ﷺ বলেন, 'আশুরা আল্লাহপ্রদত্ত দিনগুলোর একটি। তোমাদের যার ইচ্ছা, সে দিন রোজা রাখবে, না চাইলে রাখবে না।'[১২৫]

৩. হুমায়দ ইবনু আবদির রাহমান বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

মুআবিয়া রা. আশুরার দিনে মদিনার মিম্বারে উঠে বলেন, 'হে মদিনাবাসী, তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"আজ আশুরার দিন। তোমাদের ওপর আজকের রোজা ফরজ করা হয়নি। তবে আমি রোজাদার। যাদের ইচ্ছা, রোজা রাখতে পারো; আবার চাইলে খেতেও পারো।"'[১২৬]

৪. আলকামা বর্ণনা করেন,

دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟

---

[১২৪] প্রাগুক্ত : ১৮৯২।
[১২৫] *সহিহ মুসলিম* : ১১২৬।
[১২৬] *সহিহ বুখারি* : ২০০৩।

قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ.

আশআস ইবনু কায়েস রা. ইবনু মাসউদের দরবারে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি আশুরার দিন খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে আবু মুহাম্মাদ, আজ তো আশুরা।' ইবনু মাসউদ রা. বললেন, 'রমজানের রোজার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসুল ﷺ আশুরার রোজা রেখেছিলেন। রমজানের রোজার বিধান নাজিলের পর আশুরার রোজা রাখা ছেড়ে দেন।'[১২৭]

৫. ইবনু মাসউদের মতো বিষয়টি জাবির ইবনু সামুরা রা.-ও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ.

রাসুল ﷺ আমাদের আশুরার রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে আমাদের থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন। যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো, রাসুল ﷺ আমাদের আশুরার রোজা রাখার আদেশও করেননি আবার নিষেধও করেননি; আমাদের থেকে ওয়াদাও নেননি।[১২৮]

৬. কায়েস ইবনু সাআদ রা. বর্ণনা করেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

রমজানের রোজার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসুল ﷺ আমাদের আশুরার রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রমজানের রোজার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর আশুরার রোজা রাখার আদেশ করেননি, আবার নিষেধও করেননি।[১২৯]

এসব হাদিস থেকে বোঝা যায়, রমজানের রোজার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুল ﷺ আর আশুরার রোজা রাখার নির্দেশ দেননি। যদি রমজানের পূর্বে আশুরার রোজা ওয়াজিব হয়, তাহলে এখানে মতানৈক্য স্পষ্ট যে, ওয়াজিব বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার পর ওই আমল কি মুসতাহাব থাকে?

---

[১২৭] *সহিহ মুসলিম*: ১১২৭।

[১২৮] প্রাগুক্ত: ১১২৮।

[১২৯] *আস-সুনানুল কুবরা*: ২৮৪১, *নাসায়ি*।

এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি বলেন, 'ইবনু মাসউদ ও ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, আশুরার রোজা এখন আর মুসতাহাব নয়। সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহ. বলেন, "রাসুল ﷺ রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আর সে রোজা রাখেননি।" অধিকাংশ আলিমের মতে, এখন আশুরার রোজা রাখা মুসতাহাব। তবে কাউকে রাখার তাগিদ দেওয়া যাবে না। উমর, আলি, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, আবু মুসা, কায়েস ইবনু সাআদ, ইবনু আব্বাস রা. প্রমুখ সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা আশুরার দিন রোজা রাখতেন।

ইবনু আব্বাসের কথা দ্বারা মুসতাহাব বাকি থাকা বোঝা যায়। তিনি বলেন, "আশুরা ও রমজানের রোজার ব্যাপারে আমি যেভাবে রাসুল ﷺ-কে অনুসন্ধান করতে দেখেছি, অন্য কোনো রোজা সেভাবে অনুসন্ধান করতে দেখিনি।" ইবনু আব্বাস রা. রাসুলের শেষ বয়সে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন। এ জন্য তাঁর হাদিসে রাসুলের শেষ দিকের আমল বর্ণিত হয়েছে।'[১৩০]

এ ছাড়া আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত; একব্যক্তি রাসুল ﷺ-কে আশুরার রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আশুরার রোজা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়।'[১৩১]

এ হাদিসে অবশ্যই তিনি নফল রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কারণ, এটি দীর্ঘ হাদিস। আশুরার রোজা ছাড়াও ওই ব্যক্তি আরাফার দিনের রোজা, পুরো বছর রোজা রাখা, একদিন রোজা রাখা এবং একদিন না-রাখা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। এর দ্বারা বোঝা গেল, ওই ব্যক্তি নফল রোজা সম্পর্কে রাসুলের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

৭. হাফসা রা. বর্ণনা করেন,

لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

রাসুল ﷺ কখনো আশুরার রোজা, ১০ তারিখের রোজা, প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা এবং ফজরের পূর্বের দু-রাকআত সালাত ছাড়েননি।[১৩২]

এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, রমজানের রোজার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরও

[১৩০] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ৭১।
[১৩১] *সহিহ মুসলিম* : ১১৬২।
[১৩২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৪৫৯।

রাসুল ﷺ আশুরার রোজা নিয়মিত রাখতেন। এ জন্য এখনো আশুরার রোজা রাখা মুসতাহাব।

চতুর্থ অবস্থা

রাসুল ﷺ ইয়াহুদিদের রোজার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে নিয়ত করলেন, আশুরার রোজা একটি রাখবেন না; বরং তার সঙ্গে আরেকটি যোগ করে দুটি রাখবেন।

১. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

রাসুল ﷺ যখন আশুরার রোজা রাখলেন এবং রাখার নির্দেশ দিলেন, সাহাবিগণ বললেন, 'এটি এমন দিন, যে দিনকে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা সম্মান করে থাকে।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'আগামী বছর আমি ৯ তারিখও রোজা রাখব ইনশাআল্লাহ'; কিন্তু পরবর্তী বছর আশুরার দিন আসার আগেই রাসুল ﷺ ইনতিকাল করেন।[১৩৩]

২. ইবনু আব্বাস রা. থেকে অপর বর্ণনায় রয়েছে; রাসুল ﷺ বলেন,

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ.

যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে নবম তারিখেও রোজা রাখব।[১৩৪]

৩. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا.

তোমরা আশুরার দিন রোজা রাখো। ইয়াহুদিদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আশুরার আগের দিন অথবা পরদিন মিলিয়ে দুইটি রোজা রাখো।[১৩৫]

৪. হাদিসটি ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে; রাসুল ﷺ বলেন,

لَئِنْ بَقِيتُ لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ، يعني يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

---

[১৩৩] *সহিহ মুসলিম*: ১১৩৪।

[১৩৪] *মুসনাদু আহমাদ*: ৩২১৩; *ইবনু মাজাহ*: ১১৩৬।

[১৩৫] *মুসনাদু আহমাদ*: ১/২৪১।

যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে আশুরার আগের বা পরদিন রোজা রাখার নির্দেশ দেবো। [১৩৬]

ইবনু আব্বাস রা. থেকেও এমন কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তিনিও আশুরার সঙ্গে আগের বা পরদিন রোজা রাখার কথা বলেছেন।

ইবনু জুরায়জ আতা থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রা.-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা নবম ও দশম তারিখ রোজা রাখো। ইয়াহুদিদের বিরোধিতা করো।'[১৩৭]

চার. আশুরার রোজা রাখার ফজিলত

আশুরার রোজার বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকের মতে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার রোজা ফরজ ছিল। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশুরার রোজার ফরজ হুকুম রহিত হয়ে যায়। ফরজ হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ার পর সেটা মুসতাহাব থাকে কি না, এ বিষয়েও পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

আল্লামা আবদুল হাই লখনবি আশুরা-সংক্রান্ত অনেক হাদিস উল্লেখ করার পর বলেন, 'এসব হাদিসের আলোকে আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, আশুরার রোজা মুসতাহাব; বরং রাসুল ﷺ সবসময় রাখার কারণে সুন্নাতও বলা যায়। মুসতাহাব হলো, আশুরার রোজার সঙ্গে মিলিয়ে ৯ অথবা ১১ তারিখ দুটি রোজা রাখবে।'

রমজানের ফরজ রোজার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আশুরার রোজা ফরজ ছিল নাকি নফল ছিল, এ বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিয়ির মতে নফল; আর আবু হানিফার মতে ফরজ ছিল। এটিই বিশুদ্ধ কথা।[১৩৮]

আশুরার মুসতাহাব রোজার বিনিময়ে কী পাব

১. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ-কে আশুরার রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

---

[১৩৬] *ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা* : ২২২৫।

[১৩৭] *সুনানুত তিরমিজি* : ৭৫৫।

[১৩৮] *আল-আসারুল মারফুআ* : ৭৭।

আশুরার রোজা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।[১৩৯]

২. আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ خَلْفَهُ، وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاءَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ

যে আরাফার রোজা রাখবে, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেন। যে আশুরার রোজা রাখে, আল্লাহ তার এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেন।[১৪০]

এ ছাড়া হাদিস দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত যে, রাসুল ﷺ ব্যতীত অন্যান্য নবিও আশুরার রোজা রেখেছেন।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ كَانَتْ تَصُومُهُ الأَنْبِيَاءُ، فَصُومُوهُ أَنْتُمْ.

আশুরার দিনে নবিগণ রোজা রেখেছিলেন, তোমরাও রোজা রাখো।[১৪১]

পাঁচ. আশুরার ফজিলত-সংক্রান্ত বানোয়াট বর্ণনা

আশুরার রোজার ফজিলত সম্পর্কে সহিহ হাদিস দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত যে, আল্লাহ এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেন। এ ছাড়া মানুষের মুখে মুখে আরও কিছু ফজিলত শোনা যায়, যেগুলো মূলত মানুষের বানানো জাল হাদিস। এ ধরনের বানোয়াট একটি ফজিলত ইবনু আব্বাসের সূত্রে প্রচলিত।

সেই বানোয়াট বর্ণনায় রয়েছে,

যে আশুরার রোজা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ৬০ বছর রোজা রাখা ও নফল সালাত পড়ার সাওয়াব দান করবেন। যে আশুরার রোজা রাখবে, আল্লাহ তাকে ১০ হাজার ফেরেশতার সাওয়াব দান করবেন। ১০ হাজার শহিদের সাওয়াব দান করবেন। সাত আসমান পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন। যে আশুরার দিন কোনো মুসলমানকে খাওয়াবে, সে যেন পুরো মুসলিম উম্মাহর সকল দরিদ্রকে খাওয়াল। যে আশুরার দিন কোনো

---

[১৩৯] *সহিহ মুসলিম* : ১১৬২।

[১৪০] হাদিসটি ইমাম তাবরানি রাহ. *আল-মুজামুল আওসাতে* বর্ণনা করেছেন। ইমাম হায়সামি ও মুনজিরি রাহ. হাদিসটি 'হাসান' বলেছেন। *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ১৫২০; *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫১৪২।

[১৪১] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৯৪৪৬।

ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো, ওই ইয়াতিমের প্রত্যেকটি চুলের বিনিময়ে জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

উমর রা. তখন বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তাহলে আশুরার দিনকে অনেক মহিমান্বিত করেছেন?' রাসুল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন আশুরার দিনে। লাওহে মাহফুজও সৃষ্টি করেছেন আশুরার দিনে। কলম সৃষ্টি করেছেন আশুরার দিনে। জিবরিল আ.-সহ অন্যান্য ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন আশুরার দিনে। আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন আশুরার দিনে। ইবরাহিম আ. জন্মগ্রহণ করেছেন আশুরার দিনে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন আশুরার দিনে। ইসমাইলকে কুরবানির নির্দেশ দিয়েছিলেন আশুরার দিনে। ফিরআউনকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন আশুরার দিনে। ইসা আ.-কে আকাশে তুলেছিলেন আশুরার দিনে। দাউদ আ.-এর বিচ্যুতি ক্ষমা করেছেন আশুরার দিনে। সুলায়মান আ.-কে রাজত্ব দিয়েছেন আশুরার দিনে। রাসুল ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন আশুরার দিনে। আল্লাহ আরশে ইসতাওয়া গ্রহণ করেছেন হয়েছেন আশুরার দিনে। কিয়ামত হবে আশুরার দিনে।'

আশুরা-সংক্রান্ত দীর্ঘ এ বক্তব্যের অনেক কথা মসজিদের মিম্বারে মিম্বারে ধ্বনিত হয়। যদিও মুহাদ্দিসগণের মতে এর সব কথাই বানোয়াট। এ সম্পর্কে কয়েকজন মুহাদ্দিসের বক্তব্য উল্লেখ করছি :

ইমাম ইবনুল জাওজি বলেন, 'সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনাটি জাল। এর বর্ণনাকারী হাবিব ইবনু আবি হাবিবের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন, সে মিথ্যুক।' ইবনু আদি বলেছেন, 'সে হাদিস জাল করত।'

ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেন, 'বর্ণনাটি বাতিল। হাবিব নামক ব্যক্তি সিকাহ বর্ণনাকারী থেকে হাদিস জাল করত। তার বর্ণনার কদর্যতা বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়িজ নেই।'[১৪২]

ইবনুল জাওজির বক্তব্যকে জালালুদ্দিন সুয়ুতি ও ইবনু আররাক আল কাত্তানিও সমর্থন করেছেন।[১৪৩]

হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি বাতিল। এটি হাবিব ইবনু আবি

---

[১৪২] *কিতাবুল মাওজুআত* : ২/২০২।

[১৪৩] *আল-লাআলিল মাসনুআ* : ৩/১৪৬; *তানজিহুশ শারিআতিল মারফুআ* : ২/১৪৮।

হাবিব বর্ণনা করেছে। সে হাদিস জাল করত।'[১৪৪]

ঐতিহাসিকভাবে সহিহ হাদিস দ্বারা শুধু এতটুকু প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা মুসা আ. ও তাঁর উম্মতকে ফিরআউনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন আশুরার দিনে। ফিরআউনকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন আশুরার দিনে। এ কারণে ইয়াহুদিরা সে দিন রোজা রাখত। রাসুল ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রোজা রেখেছেন, যে সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদু আহমাদে আরেক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, নুহ আ.-এর জাহাজ 'জুদি' পর্বতে আটকেছিল আশুরার দিনে। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

> مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأُنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا مِنَ الصَّوْمِ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي نَجَّى اللهُ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْغَرَقِ وَغَرَّقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَهَذَا يَوْمُ اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ نُوحٌ وَمُوسَى شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالصَّوْمِ.
>
> রাসুল ﷺ কয়েকজন ইয়াহুদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা আশুরার দিনে রোজা রেখেছিল। রাসুল ﷺ তাদের বলেন, 'তোমরা কেন এই দিনে রোজা রেখেছ?' তারা বলে, 'আল্লাহ তাআলা এই দিনে মুসা আ. ও বনি ইসরাইলকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ফিরআউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন। এই দিন নুহ আ.-এর জাহাজ জুদি পাহাড়ে আটকেছিল। নুহ ও মুসা আ. আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য রোজা রাখতেন।' রাসুল ﷺ বললেন, 'মুসা আ.-এর ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি নিকটবর্তী।' এরপর তিনি সাহাবিদের রোজা রাখার নির্দেশ দেন।[১৪৫]

হাদিসটির ব্যাপারে আল্লামা হায়সামি বলেন, 'হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হাবিব ইবনু আবদিল্লাহ আল আজদি। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।'[১৪৬] হাবিব ইবনু আবদিল্লাহকে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি 'মাজহুল' বলেছেন।[১৪৭]

এগুলো ছাড়া বাকি যেসব বিষয় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত, সেগুলোর কোনো

---

[১৪৪] *আল-মানারুল মুনিফ* : ৪৬।

[১৪৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৭১৭।

[১৪৬] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫১০৫।

[১৪৭] *লিসানুল মিজান* : ৭/৯৯।

ভিত্তি নেই। ঐতিহাসিক অন্য কোনো ঘটনা এ দিন ঘটেছে, এমনটা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। যদিও *মকসুদুল মুমিনীন* বা এ জাতীয় গ্রন্থে আশুরার দিনের মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে, যার অধিকাংশই ইবনুল জাওজির উল্লিখিত জাল বর্ণনায় রয়েছে। আল্লাহপাক আমাদের সঠিক পথে পরিচালিক করুন। আমিন।

ছয়. আশুরার দিন ভালো খাবার-সংক্রান্ত হাদিসের বিশ্লেষণ

আমাদের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, আশুরার দিন প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে। এ-সংক্রান্ত একটি হাদিস মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। প্রথমে হাদিসটি সম্পর্কে আলোচনা করব।

হাদিসটি রাসুলের অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। জাবির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ سَنَتِهِ.

> যে আশুরার দিনে তার পরিবার-পরিজনের জন্য সচ্ছলতার (ভালো খাবারের) ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ তাকে পুরো বছর সচ্ছলতার সঙ্গে রাখবেন।[১৪৮]

ইবনু মাসউদ রা. থেকে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَزَلْ فِي سَعَةٍ سَائِرَ سَنَتِهِ.

> যে আশুরার দিনে পরিবার-পরিজনের জন্য ভালো খাবারের ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ তাকে সারা বছর স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবেন।[১৪৯]

এ ছাড়াও হাদিসটি আবু হুরায়রা ও আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এ বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে সমাজে আশুরার দিন ভালো খাবারে রীতি চালু হয়েছে। যদিও কোনো বিষয়ে আমল করার আগে সে সম্পর্কিত হাদিসটি ভালোভাবে যাচাই করা জরুরি। এ জন্য হাদিসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করছি :

হাদিসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ দু-ভাগে বিভক্ত। অনেক মুহাদ্দিস একে সরাসরি জাল বলেছেন। তবে অনেকেই জাল বলতে আপত্তি করেছেন। কেননা, হাদিসটি

---

[১৪৮] *আল-মুজামুল কাবির* : ১০/৯৪, তাবরানি; *শুআবুল ইমান* : ৫/৩৩১, বায়হাকি।

[১৪৯] *শুআবুল ইমান* : ৩৫১৩, বায়হাকি।

বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য তাঁরা বলেছেন, হাদিসটি দুর্বল। আর কোনো বিষয়ের মর্যাদা প্রমাণের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা সর্বজনবিদিত।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ. বলেন, 'হাদিসটি সহিহ নয়।'[১৫০] ইমাম উকাইলি রাহ. বলেন, 'রাসুল ﷺ থেকে এ-সংক্রান্ত কোনোকিছু প্রমাণিত নয়। হ্যাঁ, ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশির থেকে বিষয়টি প্রমাণিত।'[১৫১]

ইমাম জাহাবি রাহ. হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আলি ইবনু মুহাজিরের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'আলি ইবনু মুহাজির অজ্ঞাত। তাঁর পরিচয় জানা যায় না। এ ছাড়া বর্ণনাটি জাল।'[১৫২]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে উকাইলি রাহ. বলেন, 'হাদিসের বর্ণনাকারী সুলায়মান মাজহুল বা অজ্ঞাত বর্ণনাকারী। তাঁর অবস্থা জানা যায়নি। এ ছাড়া হাদিসটি সঠিক নয় এবং রাসুল ﷺ থেকে মারফুসূত্রে বর্ণিত হয়নি।'[১৫৩]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'হাদিসটি জাল। রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।' তিনি আরও বলেন, 'আশুরার রোজা রাখার ফজিলত ব্যতীত অন্য কিছু রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।'[১৫৪] অন্য জায়গায় বলেন, 'আশুরার দিন ভালো খাবার খাওয়ানো-সংক্রান্ত হাদিসটি জাল। রাসুলের নামে মিথ্যাচার।'[১৫৫]

ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, বর্ণনাটি রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়; বরং মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশিরের কথা।

ইমাম জারকাশি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়; এটি মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশিরের কথা।'[১৫৬]

আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'তিনি প্রথমে হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম আহমাদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইবনু মানসুর বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বললাম, "আপনি কি আশুরার দিন পরিবারকে ভালো খাওয়ানো-সংক্রান্ত হাদিসটি শুনেছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা জাফর থেকে,

---

[১৫০] *আল-মানারুল মুনিফ* : ১১২, ইবনুল কাইয়িম।

[১৫১] *আজ জুআফাউল কাবির* : ৩/২৫২, উকাইলি।

[১৫২] *মিজানুল ইতিদাল* : ৫/১৯১, জাহাবি।

[১৫৩] *আল-মাওজুআত* : ২/৫৭৩, ইবনুল জাওজি।

[১৫৪] *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়া* : ৭/১৯।

[১৫৫] *মাজমুআতু ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া* : ২৫/৩০০।

[১৫৬] *আল-আসরাবুল মারফুআ* : ৩৫৪, মোল্লা আলি কারি; *কাশফুল খাফা* : ২/১৪৯।

তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশির থেকে বর্ণনা করেছেন। আর মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশির ভালো মানুষ।"' এরপর ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত; কিন্তু কোনোটিই সহিহ নয়।'[১৫৭]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বর্ণনাটিকে 'মুনকারুন জিদ্দান' (মারাত্মক আপত্তিকর) বলেছেন।[১৫৮] ইবনু মাসউদের বর্ণনায় একজন বর্ণনাকারী হায়সাম। তাঁর ব্যাপারে ইবনু হিব্বান রাহ. বলেন, 'হায়সাম বানোয়াট হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করা জায়িজ নয়।'[১৫৯]

এখানে কয়েকজন মুহাদ্দিসের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মতে, রাসুল ﷺ থেকে এ ধরনের কোনো হাদিস প্রমাণিত নয়। কারও মতে, এটি রাসুলের হাদিস নয়; বরং মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশিরের কথা।

এদিকে মুহাদ্দিসগণের আরও এক দল হাদিসটিকে জাল মানতে নারাজ। তাঁদের মতে, হাদিসটি দুর্বল। আবদুল হাই লখনবির লম্বা আলোচনা তুলে ধরছি। তিনি বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি রাহ. *আল-মুজামুল কাবিরে* ইবনু মাসউদ রা. থেকে মারফুসূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হায়সাম ইবনু শাদ্দাখ, তিনি মাজহুল। ইমাম বায়হাকি রাহ. *শুআবুল ইমানে* ইবনু মাসউদের সূত্রে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। বায়হাকি রাহ. বলেন, "হাদিসটি হায়সাম ইবনু শাদ্দাখ একাকী বর্ণনা করেছেন।"

ইবনু আদি রাহ. আবু হুরায়রার সূত্রে রাসুল ﷺ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সনদে আবু আবদিল্লাহ সুলায়মান নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন—তিনি মাজহুল।

ইমাম মুনজিরি রাহ. *আত-তারগিব ওয়াত তারহিবে* বলেন, "ইমাম বায়হাকি রাহ. অনেক সাহাবি থেকে বিভিন্ন সনদে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।" ইমাম বায়হাকি বলেন, "হাদিসের সনদগুলো যদিও দুর্বল; কিন্তু যখন একটির সঙ্গে অপরটি যুক্ত করা হবে, তখন হাদিস শক্তিশালী হয়ে যাবে।"

হাফিজ জায়নুদ্দিন ইরাকি রাহ. বলেন, "হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাফিজ ইবনু নাসির কিছু সনদকে সহিহ বলেছেন। সুলায়মান নামের যে বর্ণনাকারীকে ইবনুল জাওজি মাজহুল বলেছেন, ইবনু হিব্বান সিকাহ রাবিদের জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ *কিতাবুস সিকাতে* তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইবনু

---

[১৫৭] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ৭৬, ৭৭।

[১৫৮] *লিসানুল মিজান* : ৬/৩৩৮।

[১৫৯] *আল-মাওজুআত* : ২/৫৭৩।

হিব্বানের মতে হাদিসটি হাসান।”

ইমাম বায়হাকি *শুআবুল ইমানে* হাদিসটি আবু সায়িদ খুদরির সূত্রেও উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারা কুতনি রাহ. ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন *কিতাবুল আফরাদে*। ইমাম বায়হাকি এমনভাবে ইবনুল মুনকাদিরের সূত্রে জাবির রা. থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। জাবির রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু জুবায়ের। সনদটি *সহিহ মুসলিমের* শর্তে উত্তীর্ণ। এ ছাড়া মাওকুফভাবে[১৬০] উমর রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. উল্লেখ করেছেন এমন সনদে, যার বর্ণনাকারী সবাই সিকাহ; কিন্তু উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব। উমর রা. থেকে তাঁর হাদিস শোনা প্রমাণিত কি না, এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

এ ছাড়া ইমাম বায়হাকি মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশিরের কথা হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। ইবনু তাইমিয়ার কথা—“হাদিসটি কোনো ইমাম বর্ণনা করেননি; বরং এটি মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশিরের কথা”—এটা আশ্চর্যজনক কথা, যেমনটা আপনি দেখে এলেন। ইরাকি রাহ. বলেন, হাদিসটির সনদ আমি আলাদা একটি ছোট গ্রন্থে একত্রিত করেছি।

জাওয়াহিরুল ইকদ গ্রন্থে ইমাম নুরুদ্দিন সামহুদি রাহ. বলেন, “ইমাম আহমাদ রাহ. যে বলেছেন—হাদিসটি সহিহ নয়—এর দ্বারা হাদিসটি বাতিল প্রমাণিত হয় না। কেননা, সহিহ ও জয়িফের মাঝামাঝি হলো হাসান।” আল্লামা ইবনু আররাক কাত্তানিও এমনটা বলেছেন। অর্থাৎ, ইমাম আহমাদের বক্তব্য দ্বারা হাদিসটি বাতিল প্রমাণিত হয় না; যেমনটা বুঝেছেন ইবনুল কাইয়িম। কোনো হাদিস এমন হয় যে, হাদিসটি সহিহ নয়; কিন্তু দলিলযোগ্য। অর্থাৎ, হাদিস সহিহ না হয়েও হাসান হয়।

কাত্তানি রাহ. বলেন, এই পুরো আলোচনা দ্বারা ইবনুল জাওজি ও ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, তাঁরা উভয়ে হাদিসটি জাল বলেছেন।

ইবনুল জাওজি ও ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য কীভাবে সঠিক হবে; অথচ তাঁরা হলেন হাদিসকে জাল হুকুম আরোপ করতে কঠোর। এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার লিখিত *আল-আজওয়িবাতুল ফাজিলা* গ্রন্থে। অনেক মুহাক্কিক আলিম তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং প্রমাণিত করেছেন যে, হাদিসটি হাসান পর্যায়ের। হয়তো “হাসান লি জাতিহি” কিছু সনদের কারণে; অথবা “হাসান লি

---

[১৬০] **মাওকুফ (موقوف)** : যে হাদিসের বর্ণনা-সূত্র সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ, যে সনদ-সূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। এর অপর নাম আসার।

গাইরিহি” অনেকগুলো সনদ থাকার কারণে। শুধু ধারণার কারণে নয়। সুতরাং কী বলছে তা দেখো, কে বলছে তা দেখো না।’[১৬১]

আবদুল হাই লখনবির এ দীর্ঘ বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি, তিনি হাদিসটিকে জাল মানতে নারাজ। তাঁর মতে, হাদিসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাসান পর্যায়ের। শুধু আবদুল হাই লখনবি রাহ. নয়; ইমাম সুয়ুতি, ইবনু আররাক, মোল্লা আলি কারি, আজলুনি ও মুনাবি রাহ.-ও এমনটি বলেছেন।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. মুহাদ্দিসগণের বক্তব্যগুলো সামনে রেখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হাদিসটি জাল নয়; বরং জয়িফ। এ জন্য তিনি ইবনুল কাইয়িমের লিখিত *আল-মানারুল মুনিফে*র শেষে এই গ্রন্থের হাদিসগুলো দু-ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগে জাল ও অপর ভাগে দুর্বল বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি আশুরা-সংক্রান্ত এ বর্ণনাটি দুর্বল বর্ণনার ভাগে উল্লেখ করেছেন।[১৬২]

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, তাঁর তাহকিক অনুযায়ী বর্ণনাটি জাল নয়; বরং জয়িফ বা দুর্বল।

আমাদের করণীয়

যেহেতু অনেক মুহাদ্দিস হাদিসটি জাল বলেছেন এবং সম্ভবত তাঁদের কথাই বিশুদ্ধ, এ জন্য এই হাদিসের ওপর বেশি গুরুত্ব না দেওয়া উচিত। মানুষের কাছে প্রচার না করাই ভালো। বাকি কেউ যদি অন্যান্য মুহাদ্দিসের কথা মেনে নিয়ে আশুরার দিন পরিবার-পরিজনের জন্য ভালো খাবারের আয়োজন করে, তাহলে তার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

সাত. কারবালা ও আশুরা : একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ

বর্তমানে মুসলমানগণ আশুরার দিনকে আরেকটি বিশেষ কারণে স্মরণ করে। পুরো মুসলিমবিশ্ব সে দিন শোকাহত হয়। কারণ, রাসুলের কলিজার টুকরা নাতি হুসাইন রা.-কে নির্মমভাবে কারবালার প্রান্তরে শহিদ করা হয়। ঘটনাটি অবশ্যই দুঃখজনক। যেকোনো মুসলমানকে ব্যথিত করবে; কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন, আশুরার মর্যাদা বা ফজিলতের সঙ্গে কারবালার কোনো সম্পর্ক নেই। রাসুল ﷺ আশুরার দিন রোজা রেখেছেন, এ দিন মুসা আ. ফিরআউনের

---

[১৬১] *আল-আসারুল মারফুআ* : ৮৩, ৮৫।

[১৬২] *আল-মানারুল মুনিফ* : ২০৫।

হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণে। এ ছাড়া রাসুল ﷺ যখন আশুরার দিন রোজা রেখেছিলেন, তখন কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেনি। এ জন্য আশুরার দিন তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার পেছনে কারবালার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কারবালার ঘটনা যদি আশুরার দিন না ঘটে অন্য কোনো দিন ঘটত, তারপরও আশুরার মর্যাদা বা ভাবগাম্ভীর্য একটুও কমত না। এ জন্য আশুরাকে কারবালার কারণে সম্মানিত বা তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা ভুল।

এখানে লক্ষণীয়, ইসলামের ইতিহাসে আশুরার মতো হৃদয়বিদারক ঘটনা একটা নয়; বরং অসংখ্য। ইসলাম নামক বৃক্ষটি পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়েছে মুসলমানের রক্তে। এ জন্য আশুরায় যদি মাতম করতে হয়, তাহলে উহুদযুদ্ধের কারণে কেন মাতম করেন না? কারণ, কারবালায় তো শহিদ হয়েছিলেন রাসুলের নাতি; আর উহুদের যুদ্ধে রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলেন খোদ রাসুল ﷺ। শহিদ হয়েছিল তাঁর কয়েকটি দাঁত। নৃশংসভাবে শহিদ করা হয়েছিল রাসুলের চাচা হামজা রা.-কে। বিকৃত করা হয়েছিল তাঁর লাশ। পেট কেটে কলিজা বের করে চিবিয়ে নিজের ক্রোধ নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন হিন্দা। কই? পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মুসলমান তো উহুদযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার দিনে মাতম করেনি। 'হায় রাসুল! হায় রাসুল!' রব তুলে তাজিয়া বের করেনি। শুধু উহুদ কেন, তায়িফের ঘটনাই ধরুন, ইমানের ছিটেফোঁটা যার অন্তরে রয়েছে, তায়িফের হৃদয়বিদারক ঘটনা তাকে অশ্রুসিক্ত করে। দুষ্ট বালকদের প্রস্তরাঘাতে রাসুল ﷺ সে দিন রক্তে গোসল করেছিলেন। তাজা রক্তে পায়ের জুতো আটকে গিয়েছিল। হুসাইনকে আমরা ভালোবাসি রাসুলের নাতি হওয়ার কারণে। খোদ রাসুল ﷺ যে দিন রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলেন, সে দিনকে বেমালুম ভুলে কারবালা নিয়ে হা-হুতাশ করি। এটা কেমন ইনসাফ?

মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিন হলো যে দিন রাসুল ﷺ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে কবরজগতের বাসিন্দা হয়েছিলেন। সাহাবিগণের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো ঘটনা ছিল না। উমর রা. তো হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলে উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, 'যে বলবে মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো!' রাসুলের ইনতিকালের পর বড় বড় সাহাবি জীবিত ছিলেন; কিন্তু রাসুলের মৃত্যুতারিখে কখনো হা-হুতাশ করেননি। তাজিয়া মিছিল করে শোক প্রকাশ করেননি।

বর্তমানে শিয়ারা আশুরার দিনে হুসাইনের স্মরণে যা করে, তা শরিয়তসমর্থিত হওয়া দূরের কথা, কোনো রুচিবান মানুষও সমর্থন করে না। শরীর রক্তাক্ত করার

দ্বারা যদি শোক প্রকাশ করা যেত, তাহলে সাহাবিগণ রাসুলের শোকে নিজেদের কলিজা রক্তাক্ত করে ফেলতেন। এ ছাড়া কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা যখন ঘটে, রাসুলের অনেক সাহাবি তখনো জীবিত; কিন্তু কেউ তো হুসাইনের শোকে 'হায় হুসাইন! হায় হুসাইন!' বলে তাজিয়া মিছিল বের করেননি। ধারালো কোনোকিছু দ্বারা নিজেদের শরীর রক্তাক্ত করেননি। মূলত এই কাজ হলো ভ্রান্ত রাফিজিদের কাজ। এ জন্য আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'হুসাইন ইবনু আলি রা.-এর হত্যার কারণে আশুরার দিনকে মাতম হিসেবে গ্রহণ করা—যেমনটা করে থাকে রাফিজিরা—সেটা এমন লোকদের কাজ, যাদের দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে; অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা ভালোকাজ করছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল-নবিদের বিপদের দিন ও তাঁদের মৃত্যুর দিন মাতম করার নির্দেশ দেননি। তাহলে অন্যের বিপদের দিন মাতম করা কীভাবে শরিয়তসিদ্ধ হবে?'[১৬৩]

১. ইয়াজিদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান

কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার সময় খলিফা ছিলেন ইয়াজিদ। কাতিবে ওহি মুআবিয়া রা. এর ছেলে। যেহেতু তাঁর খিলাফতাকালে হুসাইন রা.-কে শহিদ করা হয়েছে, আবার তিনি হত্যাকারীদের বিচারও করেনি, এ ছাড়া তাঁর শাসনামলে মদিনায় আক্রমণ করা এবং হাররার হৃদয়বিদারক ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিল, এ জন্য তাঁর ব্যাপারে আমাদের ধারণা কেমন হবে?

কেউ কেউ মনে করেন, ইয়াজিদ কাফির। তবে অধিকাংশ ইমামের কথা হলো, তিনি কাফির নন; বরং ফাসিক ছিলেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. ইয়াজিদের ব্যাপারে মানুষের অবস্থান অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, 'ইয়াজিদের ব্যাপারে লোকজন তিনটি দলে বিভক্ত। দুই দল দুই প্রান্তে এবং এক দল মধ্যখানে। এক দল মনে করে, তিনি কাফির ও মুনাফিক ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তাঁর বংশের উতবা, শায়বাসহ যারা সাহাবিদের হাতে নিহত হয়েছিল, তাদের প্রতিশোধ নিতে তিনি হুসাইন রা.-কে হত্যা করেন। এ ধরনের কথা রাফিজিরা বলে থাকে। তারা আবু বকর ও উমর রা.-কে কাফির মনে করে। তাদের জন্য ইয়াজিদকে কাফির বলা একেবারে সহজ।

আরেক দল ইয়াজিদকে পুণ্যবান ব্যক্তি ও ন্যায়পরায়ণ শাসক মনে করে। তারা ধারণা করে, তিনি সাহাবি; রাসুলের যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি তাঁকে

---

[১৬৩] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ৭৭, ইবনু রজব।

বরকত দিয়েছেন। কেউ কেউ তাঁকে আবু বকর ও উমর রা. থেকেও শ্রেষ্ঠ মনে করে! এমনকি কেউ কেউ তাঁকে নবিও মনে করে!

যাদের সামান্য বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, তারা উভয় দলের কথা বাতিল হওয়া সহজে বুঝতে পারবে। প্রসিদ্ধ কোনো আলিম এ ধরনের মত প্রদান করেননি।

তৃতীয় মত হলো, তিনি মুসলমানদের বাদশাহ ছিলেন। তাঁর ভালো ও মন্দকাজ ছিল। তিনি উসমান রা.-এর খিলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি কাফির ছিলেন না; কিন্তু তাঁর কারণে হুসাইন রা.-এর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। এমনভাবে হাররাবাসীর সঙ্গে তিনি যা করার করেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। তিনি সাহাবি কিংবা কোনো পুণ্যবান মানুষ ছিলেন না। এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা।

এরপর ইয়াজিদের ব্যাপারে লোকজন তিনটি দলে বিভক্ত হয়েছে। এক দল তাঁকে অভিশাপ দেয়, আরেক দল তাঁকে ভালোবাসে, আরেক দল তাঁকে ভালোবাসে না এবং গালিও দেয় না। তৃতীয় মতটি ইমাম আহমাদ রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং সেটি হলো সাধারণ মুসলমানদের কথা। সালিহ ইবনু আহমাদ বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে বলি, 'একদল লোক বলাবলি করে, আপনি নাকি ইয়াজিদকে ভালোবাসেন?' জবাবে তিনি বলেন, 'আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর যারা বিশ্বাস করে, তারা কি ইয়াজিদকে ভালোবাসতে পারে?' তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে আপনি তাঁকে অভিশাপ দেন না কেন?' তিনি বলেন, 'তুমি তোমার পিতাকে কখনো কাউকে অভিশাপ দিতে দেখেছ?''[১৬৪]

২. ইয়াজিদ, মুআবিয়া রা. ও কারবালা প্রসঙ্গ

ইয়াজিদ বললেই বর্তমানে সাধারণ মানুষের চোখে ভেসে ওঠে একজন হিংস্র মানুষের ছবি। অনেকেই আগ বেড়ে বলে ফেলেন, ইয়াজিদ হলো নরকের কীট! গালিগালাজের বন্যা থেকে বাদ পড়েন না ইয়াজিদের পিতা আমিরে মুআবিয়া রা.-ও। কারণ, তিনি ইনতিকালের সময় ইয়াজিদকে খলিফা বানিয়ে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন,

> ইয়াজিদের যে ঘৃণ্য চিত্র সাধারণত আমাদের চিন্তায় বদ্ধমূল হয়ে আছে, তার বুনিয়াদ কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা। বস্তুত রাসুল-দৌহিত্রের মর্মান্তিক

---

[১৬৪] *মাজমুআতু ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া* : ৪/৪৮১।

শাহাদাতের সঙ্গে কিঞ্চিত পরিমাণে হলেও যে নরাধম জড়িত, ইসলামি খিলাফতের পবিত্র আসনে মুহূর্তের জন্যও তাকে কল্পনা করা কোনো মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু ঘটনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ইয়াজিদকে যখন মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছিল, তখন কিন্তু কারবালা-ট্রাজেডির অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি পরবর্তীকালে দোষত্রুটি যদিও ইয়াজিদচরিত্রে বিদ্যমান ছিল, তখন তো তিনি আমিরুল মুমিনিনের প্রিয় পুত্র ও সাহাবির সন্তান হিসেবে সবার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তাঁর নৈতিকতা, ধার্মিকতা, পারিবারিক সম্ভ্রান্ততা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও সমরনৈপুণ্যের বিচারে তাঁকে খিলাফতের যোগ্য বিচার করার যথেষ্ট অবকাশও ছিল। তদুপরি ইয়াজিদের এ যোগ্যতা শুধু যে পিতা মুআবিয়ার চোখেই ধরা পড়েছিল, তা নয়। বহু নেতৃস্থানীয় সাহাবি ও তাবিয়ি অনুরূপ মত পোষণ করতেন।

হিজরি দ্বিতীয় শতকের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ আল্লামা বালাজুরি মাদাইনির সূত্রে ইমামুল মুফাসসিরিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেন, 'পানাহারের এক মজলিসে মুআবিয়া রা.-এর মৃত্যুসংবাদ শুনে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। পরে বললেন, "হে আল্লাহ, মুআবিয়াকে করুণা করুন। পূর্ববর্তীদের তুলনায় তিনি উত্তম ছিলেন না বটে, তবে পরবর্তীরাও তাঁর তুলনায় উত্তম হবে না। ইয়াজিদ অবশ্যই তাঁর বংশের যোগ্য উত্তরসূরি। সুতরাং স্ব-স্ব স্থান থেকে তাঁকে আনুগত্য ও বায়আত দান করো।"'

আলি রা.-এর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়া সম্পর্কে আল্লামা ইবনু কাসির বর্ণনা করেন, হাররার গোলযোগকালে আবদুল্লাহ ইবনু মুতি মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়াকে জানালেন, 'ইয়াজিদ তো মদ্যপ, বেনামাজি, কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণকারী।' উত্তরে মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়া বলেন, 'কিছুদিন আমি তাঁর সংস্পর্শে ছিলাম, তখন তো তাঁকে সালাতের অনুবর্তী ও কুরআন-সুন্নাহর অনুগত দেখেছি। এমনকি ফিকহশাস্ত্র নিয়েও তাঁকে আলোচনা করতে দেখেছি।'

আবদুল্লাহ ইবনু মুতি বলেন, 'সম্ভবত আপনার সামনে তিনি কৃত্রিম আচরণ করেছেন।' মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়া বললেন, 'কিন্তু কীসের ভয়ে কিংবা প্রত্যাশায় তিনি তা করবেন? আর তিনি কি নিজে এ গোপন কথা তোমাকে

বলেছেন? যদি বলে থাকেন, তাহলে তো তুমি তার দোসর; আর না বলে থাকলে তো তুমি না জেনে সাক্ষী দেওয়ার অপরাধ করলে!'

আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি নিজে দেখিনি বটে, তবে সত্য বলেই মনে হয়!' মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়া বললেন, 'আল্লাহ কিন্তু সাক্ষীদের এ ধরনের কথা বলার অনুমতি দেননি। কারণ, কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তবে যারা নিশ্চিতরূপে সত্য সাক্ষ্য দান করে।" সুতরাং তোমার ব্যাপারে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।'

আবদুল্লাহ ইবনু মুতি বলেন, 'সম্ভবত এ ব্যাপারে (ইয়াজিদবিরোধী অভ্যুত্থানে) অন্য কারও নেতৃত্ব আপনার পছন্দ নয়। আচ্ছা আসুন, আপনাকেই আমরা নেতৃত্ব দিয়ে বরণ করি।' মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়া তখন চূড়ান্ত জবাব দিয়ে বললেন, 'অধীনবা অধিনায়ক কোনো অবস্থান থেকেই আমি রক্তপাত পছন্দ করি না।'[১৬৫]

মোটকথা, অন্তত বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইয়াজিদের চরিত্র ও নৈতিকতা এমন সম্মানজনক পর্যায়ে ছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের মতো বিশিষ্ট সাহাবিও ইয়াজিদের খিলাফতের অনুকূলে মত পোষণ করতেন। এমনকি অন্যদেরও তিনি তাঁর বায়আত গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে সমাজ ও পরিবেশের বিচারে তাঁকে খিলাফতের অনুপযুক্ত বিবেচনা করারও অবকাশ ছিল। কারণ, তখন ছিল সাহাবি-তাবিয়িনের যুগ। গোটা পরিবেশ ছিল কল্যাণ, পবিত্রতা, পুণ্য ও সততার আলোয় আলোকিত। ইমাম হুসাইন, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমর, আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ও আবদুর রাহমান ইবনু আবি বকর রা.-এর মতো মহান ব্যক্তিগণ তখনো জীবিত ছিলেন। যেমন ধার্মিকতার ক্ষেত্রে, তেমনি প্রশাসনিক যোগ্যতার ক্ষেত্রেও ইয়াজিদেব বহু ঊর্ধ্বে ছিল তাঁদের অবস্থান। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সাহাবি ইয়াজিদকে মনোনয়নের ব্যাপারে প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সাহাবিদের জামাআতে তৃতীয় একটি মতও বিদ্যমান ছিল। ইয়াজিদকে তাঁরা যোগ্যতম ভাবতেন না বটে, তবে সর্বনাশা, বিভেদ ও রক্তপাত এড়াতে খিলাফতের পদে মেনে নিতে রাজি ছিলেন।

---

১৬৫ *আল-বিদায়া* : ৮/২২৩।

সাহাবি বাশির রা.-এর খিদমতে ইয়াজিদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সবাই বলেন ইয়াজিদ উম্মাহর যোগ্যতম ব্যক্তি নন। আমিও তা-ই বলি। তবে পুনরায় উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে তিনি অধিক সহনীয়।'

মোটকথা, ইয়াজিদের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে সাহাবিগণের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তা ছিল সর্বাংশে ইজতিহাদনির্ভর। সুতরাং সকল সাহাবির ব্যাপারেই আমাদের আচরণ ও উচ্চারণ সংযত হতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, আন্তরিকভাবেই মুআবিয়া রা. ইয়াজিদকে খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করতেন। তাঁর ধারণায় উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণও এতে নিহিত ছিল। সাহাবিগণের বিরাট অংশ নিঃস্বার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর এ পদক্ষেপ সমর্থন করেছিলেন। পক্ষান্তরে যে পাঁচজন বিশিষ্ট সাহাবি প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মনেও ব্যক্তি-আক্রোশ কিংবা ক্ষমতার মোহ ছিল না। আন্তরিকভাবেই ইয়াজিদকে তাঁরা অযোগ্য মনে করতেন। তাই খিলাফতের পবিত্রতা রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্রকাশ্য বিরোধিতায়। এ মহান দায়িত্ববোধ মুহূর্তের জন্যও তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে দেখার ফুরসত দেয়নি।

আবারও বলছি, মুগিরা রা. ও মুআবিয়া রা.-এর সিদ্ধান্ত নির্ভুল ও যথার্থ ছিল, এটি আমাদের দাবি নয়। আমরা শুধু বলতে চাই, দুই সাহাবির এ সিদ্ধান্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থেরও ফসল নয়। তাঁরা যা করেছেন, উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ ও ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনেই করেছেন এবং সীমারেখার ভেতরে থেকেই করেছেন। তবে যুক্তি ও পরিণতি বিবেচনায় যাঁরা মনোনয়নের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের সিদ্ধান্তই ছিল নির্ভুল ও বাস্তবানুগ এবং এতেই নিহিত ছিল উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ। কেননা—

১. মুআবিয়া রা.-এর সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও পরবর্তী শাসকগণ তাঁর এ সিদ্ধান্তের নজির টেনে অন্যায় স্বার্থ হাসিল করেছে এবং শুরাভিত্তিক কল্যাণময় ইসলামি খিলাফতব্যবস্থাকে দাফন করে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে।

২. মুআবিয়া রা.-এর জীবদ্দশায় যেহেতু ইয়াজিদের বিরুদ্ধে পাপাচার ও অধার্মিকতার সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছিল না, অন্যদিকে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও সমরনৈপুণ্য ছিল প্রশ্নাতীত; সেহেতু তাঁকে খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করার অবকাশ অবশ্যই ছিল; কিন্তু এমন বহু সাহাবি তখনো

জীবিত ছিলেন, যাঁরা প্রশাসনিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিচারেও ইয়াজিদের তুলনায় অনেক বেশি যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারতেন। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, যোগ্যতরের বর্তমানে যোগ্যকে খলিফা মনোনীত করার বৈধতা ইসলামে রয়েছে। তবু উম্মাহর সর্বোত্তম ব্যক্তির হাতেই খিলাফতের পবিত্র আমানত সোপর্দ করা কল্যাণজনক।

৩. যোগ্যতার শর্তে পুত্রকে খলিফা মনোনীত করার বৈধতা সত্ত্বেও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় বিধায় তা পরিহার করে চলাই উত্তম। অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া এ পথে অগ্রসর হওয়ার মানে হলো নিজেকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করা। বিশেষত উমর ও আলি রা. সুযোগ্য পুত্রদের বেলায় অব্যাহত অনুরোধের মুখেও সে নীতিতে অটল ছিলেন।[১৬৬]

আল্লামা কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি লিখেছেন, 'কোনো নিকটাত্মীয়কে বিশেষত পুত্রকে খলিফা মনোনীত না করে বিষয়টি শুরার হাতে ছেড়ে দেওয়াই মুআবিয়া রা.-এর জন্য উত্তম ছিল। আগাম মনোনয়ন দেওয়া না-দেওয়ার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের তাঁকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেটি মেনে নিলেই তিনি ভালো করতেন; কিন্তু সে উত্তম কাজটি তাঁর করা হয়নি।'[১৬৭]

আল্লামা ইবনু কাসির রাহ. লিখেছেন, 'শান্তিচুক্তিতে পরবর্তী খলিফা হিসেবে হাসানের নাম ছিল; কিন্তু তাঁর ইনতিকালের ফলে ইয়াজিদের প্রতি মুআবিয়ার দৃষ্টি পড়ে। তাঁর ধারণায়, খিলাফতের যোগ্যতাও তাঁর ছিল। এ মত তিনি পোষণ করতেন পিতার সহজাত ভালোবাসার কারণে এবং এ কারণেও যে, তিনি তাঁর মধ্যে আভিজাত্য, শাহজাদাসুলভ গুণাবলি, সমরনৈপুণ্য এবং শাসন ও রাজ্য পরিচালনার দক্ষতা দেখতে পেয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর ধারণায় সাহাবিতনয়দের মধ্যে অন্য কেউ এ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ছিলেন না। এ জন্যই আবদুল্লাহ ইবনু উমরকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, "জনসাধারণকে আমি রাখালবিহীন বকরিপালের মতো ছেড়ে যেতে চাই না।"'[১৬৮]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু খালদুন তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে লিখেছেন, 'মুআবিয়া রা.-এর অন্তরে অন্যদের ডিঙিয়ে ইয়াজিদকে খলিফা মনোনীত করার যে তাগাদা সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণ ছিল উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি

---

[১৬৬] *তারিখু ইবনি জারির তাবারি* : ৩/২৯৬, ৪/১১২।

[১৬৭] *আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম* : ২২২।

[১৬৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৮/৮০।

রক্ষার স্বার্থ। কেননা, বনু উমাইয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইয়াজিদের ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বগোত্র ছাড়া অন্য কারও নেতৃত্ব তারা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। আর উমাইয়ারাই ছিল তখন কুরাইশিদের প্রধান শক্তি। তা ছাড়া উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশ ছিল তাদের অনুবর্তী। এসব দিক বিবেচনা করেই যোগ্যতরের পরিবর্তে যোগ্যকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মুআবিয়া রা.-এর ন্যায়পরায়ণতা ও সাহাবিত্ব ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে আমাদের বারণ করে।'

বস্তুত সাহাবিগণ সম্পর্কে উম্মাহর গরিষ্ঠ অংশের সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁদের আচরণ ও উচ্চারণের এমন বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, যা তাঁদের জীবনচরিত্র ও সাহাবিসুলভ পবিত্রতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে এমন কোনো ব্যাখ্যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যা তাঁদের সাহাবিসুলভ পবিত্রতার সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ।[১৬৯]

ইয়াজিদের খলিফা হওয়া-সংক্রান্ত এ দীর্ঘ আলোচনাটি আমি শায়খুল ইসলাম তাকি উসমানির লিখিত *ইতিহাসের কাঠগড়ায় মুআবিয়া* নামক গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছি। এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, হুসাইন রা.-এর হত্যার সঙ্গে ইয়াজিদের কোনো হাত নেই বা ইয়াজিদ ছিলেন খলিফা হওয়ার অধিক হকদার। মূলত উদ্দেশ্য হলো, ইয়াজিদের মনোনয়ন নিয়ে তাঁর পিতা ওহি-লেখক মুআবিয়া রা.-এর বিরুদ্ধে গালিগালাজের যে ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়, খিলাফত ধ্বংস করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি তাঁর ব্যক্তিস্বার্থে, সেগুলোর জবাব দেওয়া। এ ছাড়া আমাদের সমাজে অনেকেই বলে থাকেন, ইয়াজিদ খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না। তিনি মদপান করতেন, নারী নিয়ে ফুর্তি করতেন, বানর নাচাতেন; এতৎসত্ত্বেও মুআবিয়া রা. তাঁকে নিজ পুত্র হওয়ার কারণে পরবর্তী খলিফা বানিয়েছেন। বিষয়টি যে ডাহা মিথ্যা, আশা করি শায়খুল ইসলাম তাকি উসমানির আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে গ্রন্থটি পড়া যেতে পারে।

কারবালার ইতিহাস অবশ্যই নির্মম। মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়; কিন্তু বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। মুআবিয়া রা.-এর মতো মহান সাহাবিকে গালিগালাজ করার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

---

[১৬৯] *ইতিহাসের কাঠগড়ায় হজরত মুআবিয়া রা.* : ১১১- ১১৬, শায়খুল ইসলাম তাকি উসমানি, অনুবাদ : আবু তাহের মিসবাহ।

৩. পুরো পৃথিবী আজ কারবালা

১০ মুহাররাম কারবালার কারণে সম্মানিত নয়। আশুরার সঙ্গে কারবালার কোনো সম্পর্ক নেই। তারপরও ওই দিন শোকে মুহ্যমান হয়ে যায় মুসলিমবিশ্ব। কারবালার প্রান্তরে এ দিন নির্মম পৈশাচিকতার জন্ম দিয়েছিল কিছু হতভাগা। হুসাইনের রক্তে সে দিন লাল হয়েছিল কারবালা। ফুরাত সে দিন থমকে দাঁড়িয়েছিল। মরুঝড় হয়ে পড়েছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়! তপ্ত মরুর বালু-পাথর স্তব্ধ, রাসুলের ইনতিকালের কিছুদিন পরই তাঁর কলিজার টুকরার মস্তক কর্তন! আকাশ-বাতাস কীভাবে সহ্য করেছিল শিমারের সেই নির্মম পৈশাচিকতা! মন চায় ছুটে যাই ফুরাতের তীরে। জিজ্ঞেস করি, হে ফুরাত, তুমি কি শুনতে পাওনি হুসাইনের আর্তনাদ? তুমি কীভাবে অবলোকন করেছিলে সেই দৃশ্য? জলোচ্ছ্বাস হয়ে কেন ডুবিয়ে মারোনি সেই পাষণ্ডদের?

কারবালার সেই প্রান্তরে হুসাইন রা. বাহ্যিকভাবে যদিও পরাজিত হয়ে পরিবারসহ শাহাদাত বরণ করেছেন; কিন্তু সে দিন বিজয় হয়েছিল সত্যের। হুসাইনের রক্তের বিনিময়ে পুনর্জীবন লাভ করেছিল ইসলাম। কারবালার প্রান্তর থেকেই শুরু হয় অত্যাচারীর পতন। নিজের জীবনের বিনিময়ে নানার পবিত্র ইসলামকে বেগবান করেছেন হুসাইন। অত্যাচারীর অক্টোপাস থেকে রক্ষা করেছিলেন মুসলিমবিশ্বকে।

ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের কারবালা একটি নয়; অগণিত। অত্যাচারীর সামনে হেসে-খেলে জীবনদানকারী হুসাইনের সংখ্যা কম নয়। 'শির দেগা, নেহি দেগা আমামা' এমন চেতনা লালনকারী হুসাইনদের কারণেই ইসলাম আজ স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাদের টগবগে রক্তেই সিঞ্চিত হয়েছে ইসলাম নামক বৃক্ষ। এ বৃক্ষ আপনি একটু শুঁকেন, নাকে আসবে রক্তের গন্ধ। হুসাইনসহ নাম না-জানা শত শত মুসলিমের।

এ জন্য কারবালা আমাকে শিক্ষা দেয় ইসলামের জন্য নিজের প্রাণকে অকাতরে বিলিয়ে দিতে। শত্রুর সামনে নির্ভিক যুদ্ধ করতে। সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রের ওপর ভরসা না করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রশান্তচিত্তে লড়তে। শির যাক, সমস্যা নেই; তবু রাসুলের রক্তমাখা ইসলামকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেবো না। এ জন্য কারবালা আসে মাতম করতে নয়, পিঠ চাপড়িয়ে নিজেকে রক্তাক্ত করতে নয়, হায় হায় রবে রাজপথে তাজিয়া মিছিল বের করতে নয়; বরং কারবালা আসে জালিমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রসদ সংগ্রহ করতে।

আজ প্রতিটি মুসলিম জনপদে শিমারের প্রেতাত্মারা নির্বিচারে চতুষ্পদ জন্তুর মতো মারছে মুসলমানদের। ওদের কাছে কুকুরের দাম বেশি আমাদের থেকে। কুকুর মারলে জেল-জুলুম আরও কত কিছু; কিন্তু মুসলমান মারলে কিছুই নেই। আফগান, ইরাক, চেচনিয়া, বসনিয়া, উইঘুর, মায়ানমার, কাশমির, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিসরসহ কত মুসলিম-জনপদ আজ রক্তাক্ত। বর্তমানের রক্ত তো ম্লান করে দিচ্ছে কারবালাকে। বর্তমানে মুসলমানদের যে পরিমাণ রক্ত ঝরছে, তার হিসাব করলে যে সমুদ্রের সৃষ্টি হবে, তা দেখে হয়তো শিউরে উঠবে কারবালা। কারবালায় হয়তো নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল হুসাইনকে; কিন্তু আহলে বায়তের মহিলাদের অসম্মান করা হয়েছিল, এমন ঘটনা ইতিহাসে নেই। আর এখন প্রতিটি মুসলিম জনপদে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের আর্তনাদ। ছেলের সামনে লুট করা হচ্ছে মায়ের সম্ভ্রম। পিতার সামনে মেয়ের!

হুসাইনের জন্য মাতম করতে পারি ঠিকই; কিন্তু এ-সকল মুসলমানের কর্তিত মস্তক দেখে রক্ত টগবগ করে না আমাদের। আয়লান কুর্দিদের সাগরে ভাসতে দেখেও আমরা অলসতার নিদ্রা থেকে জাগতে পারিনি। শত্রুর বিভৎস উল্লাসে দূরে সরাতে পারিনি আমাদের আয়েশি গদি। মুসলিমবিশ্বের প্রয়োজন আজ আরেক কারবালার। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের লড়াইয়ের। জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুমের লড়াইয়ের। তাহলে পৃথিবীতে আবার জাগবে ইসলাম। নির্ঘুম পৃথিবী দেখবে আলোর রবি।[১৭০]

আট. কারবালা : প্রতিরোধের প্রথম দৃষ্টান্ত

মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহ.

কারবালার শিক্ষা সম্পর্কে মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা আবুল হাসান আলি নদবি রাহ.-এর চমৎকার একটি ভাষণ রয়েছে। মাসিক আল-কাউসারে ভাষণটির চমৎকার অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় উসতাজ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ। যথাযথ মনে করে ভাষণটি অনুমতিক্রমে এখানে যুক্ত করে দিলাম।

আমি আপনাদের বলছি, আল্লাহ তাআলা এই পদ্ধতিতেই আদর্শ ধারাটি চালু রেখেছেন। এ ধারারই পর্যায়ক্রম ছিল হাসান ও হুসাইন রা.-এর পদক্ষেপ। পরিষ্কার ভাষায় বলছি, হজরত হাসানাইন (হাসান ও হুসাইন) রা.-এর পদক্ষেপ

---

১৭০ এ লেখাটি রচনা করি ১৪৩৮ হিজরির আশুরার রাতে।

ছিল আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত। নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলা যে বিশেষ বিশেষ মুআমালা করেছেন এবং তাঁকে দুনিয়ার সর্বোত্তম যেসব নিয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে এ দুটি ফুলেরও অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। তাঁদের উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'রাইহানাতাই রাসুলিল্লাহ' বা 'রাসুলুল্লাহর দুই ফুল'। আমি আমার ইতিহাস অধ্যয়নের আলোকে বলতে পারি, মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে হাসান রা. যে আচরণ করেছেন, যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা ছিল সম্পূর্ণ সঠিক। রাসুল ﷺ হাসানের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমার এই ছেলে (বংশধর) নেতা হবে। আশা করি আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের বড় দুটি দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন।[১৭১]

এ কথাটি হাসান রা.-এর জন্য কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না; বরং এটি ছিল নবিজির পক্ষ থেকে একটি অসিয়তও; এবং একটি মনোচাহিদা বা দাবিও। এটি মনোচাহিদা ছিল আল্লাহর রাসুলের, ছিল প্রিয় নানাজিরও। হাসান রা. তাই সেটিকে নিখাদ নববি নির্দেশ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং সঠিক পদক্ষেপটি নিয়েছেন মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে। যিনি সাহাবি ছিলেন, কাতিবে ওহি এবং তাঁর নিকটাত্মীয়ও ছিলেন। সশস্ত্র অভিযান ও তরবারি কোষমুক্ত করার কোনো উপাদান তখন ছিল না। মুআবিয়া রা.-এর বিরুদ্ধে তাঁর দ্বারা সেনা-অভিযান পরিচালিত হলে অহেতুক রক্তপাত ছাড়া আর কিছুই হতো না; অথচ আবেগে-উত্তেজিত কিছু লোক তাঁকে কটাক্ষ করে বলেছে, 'এই সন্ধি তো বড়ই লজ্জা ও গ্লানির।' তখন তিনি প্রশান্ত মনে উত্তর দিয়েছেন, 'অগ্নির চেয়ে লজ্জা ভালো।'[১৭২]

এই ধারা বেয়ে যখন ইয়াজিদের বিষয়টি সামনে এল, তখন হুসাইন রা.-ও শতভাগ সঠিক পদক্ষেপটি নিলেন। কারণ, সেটিই ছিল তাঁর করণীয়। তিনি তা না করলে কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্যুত শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কোনো দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে থাকত না। যখন কোনো ভুল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সমাজে অনাচারের ধস নামার আশঙ্কা জেগে ওঠে, ভালোর আহ্বান ও মন্দের প্রতিরোধ এবং তাকওয়া-তাহারাত জাগানো, খোদাভীতি ও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পরিবর্তে শুরু হয় ভ্রমণ-শিকার ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির আয়োজন, চলতে থাকে রাষ্ট্র ও ক্ষমতার গলদ ব্যবহার, তখন আমাদের সামনে

---

[১৭১] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৩২৮৪২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২০৩৯২।

[১৭২] *আল-মাকাসিদুল হাসানা* : ৬৭৩; *কাশফুল খাফা* : ১৬৯৬।

একটি দৃষ্টান্ত থাকা দরকার হয়ে পড়ে যে, এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহর কোনো বান্দা দাঁড়িয়ে গেছেন। এসবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এবং প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন। যদি এমনটি না ঘটত, তাহলে আপনারা ইসলামের পরবর্তী যুগের ইতিহাসে দুঃশাসকদের ব্যাপারে কেবল সমর্থন ও নীরবতার নমুনাই দেখতে পেতেন। সকলেই শুধু এ পঙ্‌ক্তিরই অনুসরণ করত,

বাতাস যেদিকেই বয়ে যাক
তুমি এই একদিকেই এগিয়ে চলো

তাদের মনোভাব থাকত এমন যে, যত দুঃশাসনই প্রতিষ্ঠা হোক আর যত দুরাচারী সরকারই ক্ষমতায় আসুক, আমরা শুধু তাদের আনুগত্য করে যাব। এটাই আমাদের তাকদির। কারণ, আমাদের সামনে দুঃশাসনের আনুগত্য না করার ক্ষেত্রে কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কিছু করার মতো অনুসরণীয় কোনো উদাহরণ নেই। তা ছাড়া এ আশঙ্কাও থাকত যে, এতে ইসলামি ঐক্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। মুসলমানদের সংঘবদ্ধতা পড়ে যাবে ঝুঁকির মুখে। তাই সবাই নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকত।

এ জন্য হুসাইন রা.-এর এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে যে, না; এভাবে চলবে না। সবাই চোখবন্ধ আনুগত্য করবে না; কিছু লোকের এমনও হওয়া উচিত, এ দুঃসহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরোয়াহীনভাবে যারা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরই ফল হলো পরের যুগের মুজাহিদদের ইতিহাস। যদি আপনারা পড়ে দেখেন সে ইতিহাস, অধ্যয়ন করেন তাঁদের মনস্তত্ত্ব ও মানসিকতা, তাঁদের সংলাপ ও বক্তব্য, তাহলে অবশ্যই অনুভব করবেন, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে যেসব সংস্কারবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, যেসব বৈপ্লবিক প্রয়াস উঁচু হয়েছে, সেগুলোর পেছনেই হুসাইন রা.-এর স্থাপিত দৃষ্টান্ত ভূমিকা রেখেছে। আমির আবদুল কাদির জাজায়িরি, আবদুল কারিম রাফি, শায়খ সান্নুসি, শায়খ শামিল দাগিস্তানি অথবা সাইয়িদ আহমাদ শহিদ আর শাহ্ ইসমাইল শহিদ; যাঁর কথাই ধরুন, এঁদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস ও সৎসাহস বাড়িয়ে তোলা আর সংগ্রামের আবেগ ও প্রত্যয় জাগিয়ে তোলার পেছনে ভূমিকা রেখেছিল হুসাইনের এই দৃষ্টান্ত। তাঁরা ওই দৃষ্টান্ত থেকে অনুধাবন করেছেন, এ জাতীয় প্রতিরোধ শিশুসুলভ কোনো চাঞ্চল্য নয়, নয় কোনো উত্তেজক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অস্থিরতা; বরং এটি হচ্ছে হুসাইনি সুন্নাত। হুসাইনের আদর্শ-নীতি।

এ প্রতিরোধের ধারা আমাদের যুগেও চালু আছে। খিলাফত আন্দোলনের একটি বড়

কেন্দ্র ছিল এই লখনৌ। এ আন্দোলনের যিনি প্রধান নেতা, স্বাধীনতাকামীদের পুরোধা রায়িসুল আহরার মাওলানা মুহাম্মাদ আলি জাওহর, তাঁর অন্তরেও প্রবহমান ছিল হুসাইন রা.-কে অনুসরণের আবেগ ও প্রত্যয়। কবিতায় তিনি বলেছেন,

যে পয়গাম এসেছিল হুসাইন ইবনু আলির কাছে
আমি আনন্দিত, সে ওফাদারির পয়গাম এসেছে এখন আমার জন্যও।

পরবর্তী ইতিহাস আপনারা দেখুন। হুসাইন রা.-এর নাতি ও জায়নুল আবিদিন রাহ.-এর সাহেবজাদা জায়েদ ইবনু আলি ইবনু হুসাইন যখন হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের (নিঃসন্দেহে যিনি ইয়াজিদের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো ছিলেন) মোকাবিলায় বুখে দাঁড়ালেন, তখন ইমাম আবু হানিফা রাহ. ১০ হাজার দিরহাম—যা ওই যুগের হিসাবে এবং ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর পক্ষ থেকে (একজন মুজতাহিদ ও ফকিহ হিসেবেই যিনি পরিচিত ছিলেন, বড় কোনো পুঁজিপতি ছিলেন না) অনেক বড় অঙ্কের অনুদান ছিল—তাঁর কাছে পাঠিয়ে বলেন, 'আপনি এ টাকা কাজে লাগান।'

এরপর মুহাম্মাদ জুন্নাফস জাকিয়্যা (হাসান রা.-এর ধারায় আলি রা.-এর পঞ্চম পুরুষ। মুহাম্মাদ জুন্নাফস জাকিয়্যা ইবনু আবদিল্লাহ আল মহজ ইবনি হাসান আল মুসান্না ইবনি হাসান আল মুজতাবা ইবনি সাইয়িদিনা আলি মুরতাজা রা.) যখন খলিফা মানসুরের মোকাবিলায় (যিনি খলিফা হারুনুর রশিদের দাদা ও বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা) বুখে দাঁড়ান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তখন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ. তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন এবং আর্থিক সহযোগিতাও করেছেন। তা ছাড়া খলিফা মানসুরের সেনাপতি হাসান ইবনু কুহতবাকে ইমাম আবু হানিফা এ কথা বলে নিবৃত্ত করেন যে, মুহাম্মাদ জুন্নাফস জাকিয়্যা ও তাঁর ভাই ইবরাহিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা তোমার জন্য জায়িজ হবে না। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ (জুন্নাফস) বুখে দাঁড়িয়েছিলেন মদিনায়। হাদিসে আছে, 'আমার বংশধরদের মধ্যে জুন্নাফস জাকিয়্যার জন্ম হবে এবং সে মদিনার আহজারে জায়তে শহিদ হবে।' এ ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁর ব্যাপারে সত্যে পরিণত হয়েছিল। অপর ভাই ইবরাহিম বুখে দাঁড়িয়েছিলেন বাগদাদে; কিন্তু দিন-তারিখের সমন্বয়ে কিছু অমিল হওয়ায় তারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। তবে ইমাম আবু হানিফা ও মালিক রা. দুজনকেই সমর্থন ও অর্থসহযোগিতা দিয়েছিলেন।

এখন কেউ যদি আপত্তি উঠিয়ে বলেন, হুসাইন রা., জায়েদ ইবনু আলি রাহ.

ও মুহাম্মাদ জুন্নাফস জাকিয়্যার আন্দোলন-সংগ্রাম ও পদক্ষেপগুলো ছিল ইসলামি ঐক্য ও ইসলামি শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে একেকটি অনুত্তম পদক্ষেপ ও অপরিণামদর্শী কাণ্ড, তাহলে তিনি যেন প্রকারান্তরে এটাই বলতে চাচ্ছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের চেয়েও বড় ফকিহ ও মুজতাহিদ এবং তাঁদের চেয়েও বেশি খোদাভীরু ও ধর্মপ্রাণ।

আপনাদের জানা আছে নিশ্চয়ই, তাঁরা দুজন শুধু ফকিহ ও মুজতাহিদই ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন এমনই উচ্চতর অবস্থানের ফকিহ ও মুজতাহিদ যে, শরিয়ত, ফিকহ ও বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের তুলনামূলক অধ্যয়নের একজন তালিবুল ইলম হিসেবে আমি বলছি, দুনিয়ার ধর্ম-জাতিগুলোর মধ্যে তাঁদের মতো ব্যক্তির কোনো নজির পাওয়া যাবে না। তাহলে কি তারা ভেবে দেখেননি, ইসলামি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে এ-সকল ব্যক্তি কেন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন? তাদের কী এমন সেনাশক্তি ছিল? তাদের পদক্ষেপের ফল তো তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না! এরপরও ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক চোখ বন্ধ করে কেন তাদের সমর্থন দিয়ে গেলেন?

এটিই আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনন্য বিশেষত্ব যে, আমরা সাহাবিগণের প্রতি, তাঁদের ফজিলত ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করি; আর আমাদের এই প্রাচুর্য নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই মিলনায়তনটি যার স্মৃতি বহন করছে (ইমামে আহলুস সুন্নাত মাওলানা আবদুশ শাকুর ফারুকি রাহ.) আমি নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাঁর নিজেরও মতাদর্শ এটিই ছিল। এটিই ছিল শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. ও তাঁর বংশধরদের মতাদর্শ। এ মতাদর্শটি লালন করতেন মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ.। আমি পড়েছি—স্পষ্ট মনে আছে—মুজাদ্দিদে আলফে সানির পিতার (শায়খ আবদুল আহাদ সেরহিন্দি রাহ.) ইনতিকালের সময় যখন ঘনিয়ে এল, একদম ঊর্ধ্বশ্বাস জারি হয়ে গেল, তখন মুজাদ্দিদে আলফে সানি বললেন, 'আব্বাজান, আপনি তো বহুবার বলেছেন, আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা পোষণ মানুষের ইমানসহ সুন্দর মৃত্যুর ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা রাখে।' উত্তরে তাঁর পিতা বললেন, 'আমি তো সেরকমই দেখতে পাচ্ছি।'

ওই গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনার পরপরই এ কবিতাটি লেখা হয়েছে, যার অর্থ—

ফাতিমা রা.-এর সন্তানদের অসিলায় হে আল্লাহ,
ইমানসহ আমাদের মৃত্যু দান করো।

এই মতাদর্শই আমাদের শিআর বা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য। কোনো মূল্যের বিনিময়ই এ মত-পথ আমরা ছাড়তে প্রস্তুত নই। এই ধারাবাহিকতার সঙ্গেই আমরা খুলাফায়ে রাশিদিনকে (সব মানুষের মধ্যে খিলাফতের সবচেয়ে বেশি হকদার) বিশ্বাস করি। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যও এই ধারাবাহিকতার সঙ্গে নির্ধারিত বলে আমরা বিশ্বাস করি। প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রা., দ্বিতীয় উমর ইবনুল খাত্তাব রা., তৃতীয় উসমান ইবনু আফফান রা. ও চতুর্থ আলি ইবনু আবি তালিব রা.। এই ধারাবাহিকতার প্রতি আমরা বিশ্বাস পোষণ করি। আমরা তাঁদের ধারাবাহিকতা, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও খিলাফতের সত্যতার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল। একই সঙ্গে আমরা আহলে বায়তের প্রতিও মহব্বত পোষণ করি এবং হাসান-হুসাইন রা.-এর পদক্ষেপকে সম্পূর্ণ সঠিক মনে করি।

আমাদের নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ ও ইমামদের সবাই ইয়াজিদের মাধ্যমে অনাচার ও পাপাচার সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে দ্বিধাহীন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ. সম্পর্কে পরিষ্কার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর ছেলে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আব্বাজান, কেউ কেউ বলে যে, আপনি ইয়াজিদকে পছন্দ করেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বেটা, আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর যে বিশ্বাস করে, সে কি ইয়াজিদকে পছন্দ করতে পারে?' ছেলে তাঁকে বললেন, 'তাহলে তাঁকে লানত করেন না কেন?' তখন তিনি বলেন, 'তুমি তোমার বাবাকে কখনো কারও প্রতি লানত করতে শুনেছ?'

ইমাম ইবনু তাইমিয়ারও মতাদর্শ ছিল এটি। যখন তাতার-নেতা বোলায়ির সঙ্গে তাঁর কথোপকথন হয়, তখন তিনি ইয়াজিদ সম্পর্কে কঠোর নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করেন। বোলায়ি তখন ইয়াজিদপ্রীতি থেকে নিজের দূরত্বের কথা ব্যক্ত করে এবং ইয়াজিদের কর্মকাণ্ডের ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরে।

মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ., শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ. এবং আমাদের পূর্বসূরির মতাদর্শ ও মাসলাক ছিল এটিই। ইমামে আহলুস সুন্নাত মাওলানা আবদুশ শাকুর রাহ.-কে আমি জানতাম। আহলে বায়তের প্রতি, হুসাইন রা.-এর প্রতি তাঁর গভীর মহব্বত ছিল। এমনকি আহলে বায়তের সঙ্গে সম্পর্কিত ও যুক্তজনদের প্রতিও তাঁর কী পরিমাণ ভালোবাসা ছিল, সেটি সবাই জানি। এই বিশেষত্ব থেকে আমাদের কখনো দূরে সরানো যাবে না। এ বিষয়ে আমাদের কখনো কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া চলবে না। না সাহাবিগণের প্রতি সম্মাননার বিষয়ে, না খুলাফায়ে রাশিদিনের ধারাক্রমের বিষয়ে এবং না হাসান-

হুসাইন রা.-এর কর্মের সঠিকতা ও তাঁদের পদক্ষেপের শুদ্ধতা ও বরকতময়তা সম্পর্কে। এসব বিষয়ে তাঁদের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধার অটুট অবস্থান বজায় রাখতে হবে।[১৭৩]

[১৭৩] ইয়াজিদের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হতে পারে তাঁর ছেলে মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের বক্তব্য। শাসনক্ষমতায় না যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদগণ লেখেন, 'তিনি তাঁর বাবার শাসনক্ষমতার আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর অসংগত আচরণ ও কর্মকাণ্ড, তাঁর নিজের ওপর অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, আল্লাহর বিধানের বিষয়ে দুঃসাহসী আচরণ আর রাসুলের বংশধরের চরম অবমাননা প্রসঙ্গে কথা বলেন। তাঁর দুই চোখে অশ্রু ভরে যায়। দীর্ঘদিন তিনি কাঁদতে থাকেন। (*তারিখুল খামিস* : ২/৩৩৬) এ ছাড়া কারবালার ঘটনার পাশাপাশি মাদিনার হাররাতেও বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে। এতে রাসুলের শহর দারুল হিজরার চরম অসম্মান এবং সেখানকার বাসিন্দাদের চূড়ান্ত অবমাননা হয়েছে। এটাও কম নিন্দাযোগ্য ঘটনা ছিল না। কারবালা-সংক্রান্ত আলোচনা আর দীর্ঘ করছি না। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

সফর : করণীয় ও বর্জনীয়

আরবি বর্ষপঞ্জির দ্বিতীয় মাস সফর। এ মাস নিয়েও রয়েছে কিছু ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি। সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

এক. সফর মাসকে অশুভ মনে করা

আমাদের দেশে বহু মানুষের ধারণা এমন, সফর মাস অশুভ। এ মাসে কোনো ভালোকাজ করা যাবে না। ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যাবে না! রাসুল ﷺ এ মাস আসার পর দুআ করতেন, যেন মাসটি দ্রুত শেষ হয়ে যায়! এ ধরনের চটকদার অনেক কথা সমাজে ছড়িয়ে আছে।

প্রথম কথা হলো, কোনো বিশেষ দিন বা সময় অশুভ হতে পারে না। ইসলামও এমন কথা সমর্থন করে না। এগুলো জাহিলি যুগের কুসংস্কার। রাসুল ﷺ সেগুলো স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। কারণ, আল্লাহ শুভ-অশুভের বিষয় কোনো দিনের সঙ্গে নির্দিষ্ট করেননি। তবে অনেক মানুষ যেহেতু সফর মাসকে অশুভ মনে করত, তাই রাসুল ﷺ বিষয়টির অসারতা একাধিক হাদিসে তুলে ধরেছেন।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ.

কোনো অশুভ অযাত্রা নেই। কোনো ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই এবং সফর মাসে কোনো অশুভত্বের অস্তিত্ব নেই। তখন একজন গেঁয়ো সাহাবি প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহর রাসুল, তাহলে ওই উটের কী হুকুম, যে মরুভূমির তপ্ত গরমে বাস করে, তখন ওই উটের ঘাড়ে রোগ হয়। এরপর সে পালে প্রবেশ করলে অন্যান্য উটে তা সংক্রমিত হয়।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তাহলে প্রথম

উটটি অসুস্থ হলো কীভাবে?'[১৭৪]

২. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا طِيَرَةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ فَتَجْرَبُ قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ.

কোনো অশুভ অযাত্রা নেই। কোনো ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই। সংক্রামক রোগ নেই এবং সফর মাসে কোনো অশুভত্বের অস্তিত্ব নেই। তখন একব্যক্তি বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা রোগে জর্জরিত ছাগল কিনে ছাগলের পালের সঙ্গে ছেড়ে দিই, তখন দেখা যায়, অন্য ছাগলও অসুস্থ হয়ে যায়।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তাহলে প্রথম ছাগলের অসুস্থতা কে দিয়েছে?'[১৭৫]

৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন,

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ النُّقْبَةُ مِنْ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِي الْإِبِلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا أَجْرَبَ الْأَوَّلَ لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا.

রাসুল ﷺ একবার দাঁড়িয়ে বললেন, 'কোনোকিছু এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে সংক্রমিত হয় না।' তখন একজন গেঁয়ো সাহাবি দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, উটের পালের সবচেয়ে বড় যে উট, অনেক সময় সে উটের মুখে বা কানে রোগ হয়, ফলে উটের পালে সে অসুস্থতা দেখা যায়।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তাহলে প্রথম উটের রোগ কোথা থেকে এল? কোনো অশুভ অযাত্রা নেই। কোনো ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই। রোগ-সংক্রমণ নেই এবং সফর মাসে কোনো অশুভত্বের অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তার হায়াত, মুসিবতসমূহ ও রিজিক লিখে দিয়েছেন।'[১৭৬]

৪. এ মর্মে আবু হুরায়রা রা. থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন; রাসুল ﷺ বলেছেন,

لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا ثَلَاثًا قَالَ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ

---

[১৭৪] *সহিহ বুখারি* : ৫৭১৭; *সহিহ মুসলিম* : ২২২০।

[১৭৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ৩০৩১; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৬৯২২।

[১৭৬] *মুসনাদু আহমাদ* : ৪১৯৮।

اللهِ إِنَّ النُّقْبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِعَجْبِهِ فَتَشْمَلُ الْإِبِلَ جَرَبًا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ مَا أَعْدَى الْأَوَّلَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا.

কোনোকিছু এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে সংক্রমিত হয় না। তখন একজন গেঁয়ো সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, উটের পালের সবচেয়ে বড় যে উট, অনেক সময় সে উটের মুখে বা কানে রোগ হয়। যার কারণে সকল উটে সে অসুস্থতা দেখা যায়।' রাসুল ﷺ কিছু সময় চুপ থেকে বললেন, 'তাহলে প্রথম উটের রোগ কোথা থেকে এল? কোনো অশুভ অযাত্রা নেই। কোনো ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই। রোগ-সংক্রামক নেই এবং সফর মাসে কোনো অশুভত্বের অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তার হায়াত, মুসিবতসমূহ ও রিজিক লিখে দিয়েছেন।'[১৭৭]

৫. জাবির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ.

সংক্রামক নেই। সফর মাসে কোনো অশুভত্ব নেই। বুদ্ধিলোপকারী কোনো প্রাণী নেই।[১৭৮]

৬. আলি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا يُعْدِي سَقِيمٌ صَحِيحًا.

সফর মাসে কোনো অশুভত্ব নেই। কোনো ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই। অসুস্থতা সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমিত হয় না।[১৭৯]

৭. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَ، وَلَا يَتِمُّ شَهْرَانِ.

রোগ সংক্রমণ নেই। সফর মাসে কোনো অশুভত্ব নেই। কোনো ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই। ধারাবাহিক দু-মাস ৩০ দিন হয় না।[১৮০]

সফর মাসে কোনো অশুভত্ব যে নেই, এ বিষয়ে রাসুলের অনেক হাদিস রয়েছে।

---

১৭৭ প্রাগুক্ত : ৮৩৪৩।

১৭৮ প্রাগুক্ত : ১৫১০৩।

১৭৯ *তাহজিবুল আসার* : ১২৪৭, তাবারি।

১৮০ *আল-মুজামুল কাবির* : ৭৭৬১, তাবরানি; *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৮৩৯৬।

যেহেতু জাহিলি যুগে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সফর মাস অশুভ, এ জন্য রাসুল ﷺ একাধিক হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। পাশাপাশি সেসব হাদিসে তিনি জাহিলি যুগের কিছু কুসংস্কারের খণ্ডন করেছেন। যেমন, রোগ সংক্রমণ করা। যে কুসংস্কার এখনো আমাদের দেশের অনেক মুসলমানের মধ্যে রয়েছে।

আমরা মনে করি, বিশেষত কুষ্ঠরোগীর ব্যাপারে এই কুসংস্কার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ জন্য রাসুল ﷺ হাদিসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আল্লাহর আদেশ ছাড়া রোগের সংক্রামক হওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। আমাদের অসুস্থতা ও সুস্থতা আল্লাহর হাতে; কিন্তু আমাদের ইমান যেহেতু দুর্বল, কোনো রোগীকে দেখে আসার পর যদি সে রোগ আমার হয়, অথবা অন্য কোনো দর্শনার্থীর হয়, তাহলে আমাদের অন্তর বলবে—ওই লোকের কাছে যাওয়ার কারণে আমার বা ওই দর্শনার্থীর শরীরে সেই রোগ চলে এসেছে। আমাদের ইমানে যাতে খটকা না আসে, এ জন্য রাসুল ﷺ আরেক হাদিসে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এটা মূলত রোগ সংক্রামক হয় এ জন্য নয়; বরং যাতে আমরা অযথা সন্দেহে না পড়ি, সে জন্য তিনি বলেছেন।

৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ.

তোমরা কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন করো, যেমন পলায়ন করো সিংহ থেকে।[১৮১]

উভয় হাদিসের ব্যাখ্যা করতে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'রাসুলের কথা—"রোগ সংক্রামক হয় না"—এর ব্যাপকতা এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। তবে কুষ্ঠরোগী থেকে রাসুল ﷺ পলায়নের নির্দেশ দিয়েছেন সংশয়ের দরজা বন্ধ করতে। কারণ, যে প্রথমে আল্লাহর কুদরতের ওপর বিশ্বাস করেছে, সে তখন সংশয়ের মধ্যে পড়ে বলবে, রোগীর সংশ্রবে যাওয়ার কারণে তার এই রোগ হয়েছে। ফলে তার বিশ্বাসেও পরিবর্তন চলে আসবে।'[১৮২]

হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ মোল্লা আলি কারি রাহ. বলেন, 'রাসুলের হাদিস—"কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন করো, যেমন পলায়ন করো সিংহ থেকে"—এর দ্বারা উদ্দেশ্য বৈধতা বোঝানো। (অর্থাৎ, কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকা যেতে পারে।) অথবা এমন হতে পারে, সৃষ্টিগতভাবে সে অসুস্থ হবে; কিন্তু সে বাতিল

[১৮১] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৫০৩১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৯৭২২।

[১৮২] *নুখবাতুল ফিকার* : ৪৫, ইবনু হাজার আসকালানি।

আকিদা পোষণ করে বসে থাকবে।'[১৮৩]

মোটকথা, রোগ কখনো নিজে নিজে সংক্রমিত হতে পারে না। এমনভাবে সফর মাসে অশুভত্ব বলতেও কিছু নেই।

দুই. সফর মাস-সংক্রান্ত জাল হাদিস

সফর মাসের অশুভত্ব প্রমাণের জন্য লোকমুখে কিছু বর্ণনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। বলা হয় এগুলো রাসুলের কথা; অথচ এগুলো জাল ও বানোয়াট। এ রকম একটি বর্ণনা হলো,

من بشرني بخروج صفر بشرته بدخول الجنة.

> যে আমাকে সফর মাস শেষ হওয়ার সংবাদ দেবে, আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবো।

এ ধরনের হাস্যকর কথা রাসুল ﷺ থেকে আশা করা যায় না। সফর মাসে এমন কী খারাপি রয়েছে যে, কেউ যদি সফর মাস শেষ হওয়ার সংবাদ দেয়, রাসুল ﷺ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন। এ ছাড়া মুহাক্কিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, বর্ণনাটি জাল।

ইমাম শাওকানি বলেন, 'ইমাম সাগানি ও ইরাকি রাহ. বলেছেন, বর্ণনাটি জাল।'[১৮৪]

সফর মাসের অশুভত্ব প্রমাণের জন্য অনেক কথা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে। যেমন : আদম আ. এ মাসে ফল খেয়েছিলেন এবং বেহেশত থেকে বেরিয়েছেন। আদম আ.-এর ছেলে হাবিলকে হত্যা করা হয় সফর মাসে। নুহ আ.-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয় সফর মাসে। ইবরাহিম আ.-কে আগুনে ফেলা হয় সফর মাসে। বাস্তবে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই, সম্পূর্ণ জাল ও বানোয়াট।

মোটকথা, সফর মাস সম্পর্কে অনেক কুসংস্কার জাহিলি যুগে ছিল। বর্তমানেও অনেকের ধারণা, এ মাস অশুভ। এ মাসে বিয়েশাদি করলে বরকত হবে না। এসব কুসংস্কার ইসলাম সমর্থন করে না।

তিন. আখেরি চাহার শোম্বা কি উদ্‌যাপনের বিষয়

প্রথমে আখেরি চাহার শোম্বার ফজিলত সম্পর্কে আলোকপাত করব। বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত *বারো চান্দের ফজিলত* নামক গ্রন্থ থেকে এ-সংক্রান্ত আলোচনাটি প্রথমে উল্লেখ করছি। সেখানে বলা হয়েছে,

---

[১৮৩] *মিরকাত* : ৮/৩৭১।

[১৮৪] *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমুআ* : ১/৪৩৮।

আখেরি চাহার শোম্বা অর্থ বুধবার অর্থাৎ, সফর মাসের শেষ বুধবার বোঝানো হয়েছে। এ দিনটি মুসলিমবিশ্বে খুশির দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এর কারণ, রাসুল ﷺ ইনতিকালপূর্ব সফর মাসের শেষ সপ্তাহে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়েছিলেন। এর পর তিনি এ মাসের শেষ বুধবার সুস্থ হয়ে গোসল করে কিছু খাবার খেয়ে মসজিদে নববিতে উপস্থিত হন এবং সালাতের ইমামতি করেন। উপস্থিত সাহাবিগণ তখন অত্যধিক আনন্দিত হয়েছিলেন। এমনকি তাঁরা তাদের খুশির প্রকাশ ঘটাতে অনেকে অনেক দান-সাদাকাও করেছিলেন। বর্ণিত আছে, আবু বকর রা. ৭ হাজার দিনার, উমর রা. ৫ হাজার দিনার, উসমান রা. ১০ হাজার দিনার, আলি রা. ৩ হাজার দিনার এবং আবদুর রাহমান ইবনু আউফ রা. ১০০ উট ও ১০০ ঘোড়া সাদাকা করেছিলেন। এর পর থেকে মুসলমানরা সাহাবিগণের নীতি অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য পৃথিবীময় প্রতিবছর আখেরি চাহার শোম্বা-দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। নবিজির এই দিনের গোসলই জীবনের শেষ গোসল ছিল। এরপর তিনি জীবিতকালে আর গোসল করেননি। তাই সকল মুসলমানের জন্য এই দিনে অজু-গোসল করে ইবাদত-বন্দেগি করা উচিত এবং নবিজির প্রতি দুরুদ পাঠ করে সাওয়াব রেসানি করা কর্তব্য।[১৮৫]

মকসুদুল মুমিনীনে বলা হয়েছে,

এই মাসের শেষ বুধবারকে আখেরি চাহার শোম্বা বলা হয়। (আখেরি শব্দের অর্থ শেষ এবং চাহার শোম্বা শব্দের অর্থ বুধবার) ১১ হিজরির সফর মাসের শেষভাগে নবিজি ﷺ অত্যন্ত অসুস্থ ও পীড়িত হয়ে পড়েন এবং এই মাসের শেষ বুধবার দিন তিনি শরীরে একটু সুস্থতা বোধ করায় গোসল করে কিছুটা প্রশান্তি লাভ করেন। এই গোসলই তাঁর জীবনের শেষ গোসল ছিল। এরপর তাঁর জীবনে গোসল করার সুযোগ হয়নি। এতএব, এই দিন মুসলমানদের বিশেষভাবে গোসল করে নফল সালাত ও রোজা ইত্যাদি আদায় করে নবিজির রুহের ওপর সাওয়াব পৌঁছানো উচিত।[১৮৬]

পর্যালোচনা

সফর মাসের শেষ বুধবার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেগুলো একেবারে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। আপনি যাকে ভালোবাসেন, সে যদি অসুস্থ হয়, এর পর আপনি

[১৮৫] *বারো চান্দের ফযিলত* : ১৪, ১৫।

[১৮৬] *মাকসুদুল মুমিনীন* : ৪৮।

যখন তার সুস্থতার সংবাদ পাবেন, তখন স্বভাবগতভাবেই আনন্দিত হবেন। সাহাবিগণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন রাসুল ﷺ-কে। এ ছাড়া রাসুলকে ভালোবাসা হলো ইমানের অঙ্গ। হাদিসে বলা হয়েছে,

> لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
>
> তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না তোমরা তোমাদের সন্তানাদি, মাতাপিতা ও সকল মানুষ থেকে আমাকে বেশি ভালোবাসবে।[১৮৭]

যেহেতু সাহাবিগণ রাসুল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, তাই তাঁর অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়ার সংবাদে আনন্দিত হতেন; কিন্তু সাহাবিগণ এ সংবাদ যে দিন শুনেছেন, সে দিন বিশেষ করে কোনোকিছু করেছেন বা বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করেছেন, এমন দাবির পক্ষে শক্তিশালী দলিল পাওয়া দূরের কথা, দুর্বলতম কোনো দলিলও পাওয়া যায় না।

রাসুলের জীবনে বিপদের পাহাড় এসেছে। মক্কাজীবনে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন তিনি। তায়িফের ময়দানে রাসুলের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনা এখনো অশ্রু ঝরায় প্রতিটি মুসলমানকে। উহুদের হৃদয়বিদারক ঘটনা কি ভোলার মতো! এ ছাড়া বদরযুদ্ধে মুসলমানদের অসাধারণ বিজয়ও তো সাহাবিগণ উৎসব করে বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্‌যাপন করেননি।

আখেরি চাহার শোম্বা নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি। পাঠকের বোঝার স্বার্থে তাঁর পুরো আলোচনাটি এখানে তুলে ধরছি :

আখেরি চাহার শোম্বা সম্পর্কে বর্ণনাগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন। যেমনটি ভিত্তিহীন উপরিউক্ত উভয় বিবরণ।

১. রাসুল ﷺ-কে এক ইয়াহুদি জাদু করে। এটা ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে মুহাররামের প্রথম দিনের ঘটনা। এ জাদুর প্রভাব কত দিন ছিল, সে সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনায় ছয় মাসের কথা এসেছে, অন্য বর্ণনায় এসেছে ৪০ দিনের কথা। তবে উভয় বর্ণনায় কোনো সংঘর্ষ নেই। এক বর্ণনায় পুরো সময়ের কথা এসেছে, আর অপর বর্ণনায় এসেছে শুধু সে সময়ের কথা, যখন জাদুর প্রতিক্রিয়া বেশি ছিল। তবে যাইহোক, সুস্থতার তারিখ কোনো

---

[১৮৭] *সহিহ বুখারি* : ১৫।

হিসাব অনুযায়ীই সফরের আখেরি চাহার শোম্বা হতে পারে না।[১৮৮]

২. জাদুর ঘটনা হাদিস ও সিরাতের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত এসেছে। তাতে সে সময় রাসুল ﷺ মসজিদে জামাআতে শরিক হতে না-পারা বা মুআওয়্যিজাতান (সুরা ফালাক ও নাস) দ্বারা জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁর গোসলের বর্ণনা—এসবের কিছুই উল্লেখ নেই।

৩. রাসুল ﷺ-এর সুস্থতার কারণে খুশি হওয়া কিংবা তাঁর সুস্থতার সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হওয়া প্রত্যেক মুমিনের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ দাবি করা যে, সাহাবিগণ কিংবা পরবর্তী যুগের মনীষীগণ সে খুশি প্রকাশের জন্য উপরিউক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন কিংবা একে উদ্‌যাপনের দিবস ঘোষণা করেছেন, এটা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, এ দাবির সপক্ষে দুর্বলতম কোনো দলিলও বিদ্যমান নেই।

রাসুলের ওপর অনেক বিপদ এসেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সেসব বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তায়িফ ও উহুদে আহত হওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে সুস্থ করেছেন। একবার ঘোড়া থেকে পড়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছেন, যার কারণে মসজিদে যেতে পারেননি, আল্লাহ তাঁকে সুস্থ করেছেন। তাঁর সুস্থতালাভের এসব আনন্দের স্মৃতিতে দিবস উদ্‌যাপনের কোনো সুযোগ আছে? তাহলে আখেরি চাহার শোম্বা—যার কোনো ভিত্তি নেই—তা কীভাবে উদ্‌যাপনের বিষয় হতে পারে?

৪. কোনো দিনকে বিশেষ ফজিলতের দিবস মনে করা কিংবা বিশেষ কোনো দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা, এগুলো হচ্ছে মুসলামানদের জন্য শরিয়তের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এগুলো শরয়ি দলিল ছাড়া শুধু মনগড়া যুক্তির ভিত্তিতে সাব্যস্ত করা যায় না। এটি শরিয়তের একটি অনন্য মূলনীতি। এ জন্য উপরিউক্ত তথ্য ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ হলেও এ দিবসকে ঘিরে এসব রুসুম-রেওয়াজ চালু করার কোনো বৈধতা নেই।

৫. *মকসুদুল মুমিনীন* গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, তা-ও সঠিক নয়। রাসুল ﷺ-এর ইনতিকাল হয়েছে সোমবারে। এর চার-পাঁচ দিন আগে তাঁর সুস্থতার জন্য যে সাত কুয়া থেকে সাত মশক পানি আনা হয়েছিল এবং সুস্থতার জন্য তাঁকে গোসল করানো হয়েছিল, তা কি বুধবারের ঘটনা, না বৃহস্পতিবারের?

---

[১৮৮] *ফাতহুল বারি* : ১০/২৩৭।

ইবনু হাজার ও ইবনু কাসির রাহ. একে বৃহস্পতিবারের ঘটনা বলেছেন।[১৮৯]

যদি বুধবারের ঘটনা হয়ে থাকে, তবে সফর মাসের শেষ বুধবার হবে কীভাবে? এসব প্রথার পৃষ্ঠপোষকগণ সবাই তাঁর ইনতিকালের তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল বলে থাকেন। সোমবার যদি ১২ রবিউল আউয়াল হয়ে থাকে, তাহলে এর আগের বুধবার তো সফর নয়, রবিউল আউয়ালই হচ্ছে। তা ছাড়া এ তথ্যও সঠিক নয় যে, বুধবারের পর তিনি আর গোসল করেননি। কেননা, সুস্থতার পর এক রাতে ইশার সালাতের আগে গোসল করার কথা সহিহ হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।[১৯০] আর এ কথাও ঠিক নয় যে, বুধবারের পর অসুস্থতায় কোনো উন্নতি হয়নি; বরং এরপর আরেকদিন সুস্থতাবোধ করেছিলেন এবং জুহরের সালাতেও শরিক হয়েছিলেন, যা সহিহ হাদিসে রয়েছে।[১৯১] সোমবার সকালেও সুস্থতাবোধ করেছিলেন, যে কারণে আবু বকর রা. অনুমতি নিয়ে নিজ বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।[১৯২]

সারকথা, রাসুলের ভালোবাসা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও তাঁর পবিত্র সিরাত-সুন্নাতের অনুসরণ, তাঁর জীবনাদর্শে আপন জীবন গঠন, তাঁর শরিয়তের প্রচার-প্রসার ইত্যাদি হক, যা উম্মতের জন্য অবশ্যপালনীয়। এগুলো থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং গাফলতির এই প্রকৃত ব্যাধি সম্পর্কে অসচেতন রাখার জন্য এসব ভিত্তিহীন রুসুম-রেওয়াজের উৎপত্তি ঘটেছে।[১৯৩]

আল্লাহ তাআলা উম্মাহকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং প্রচলিত ভুল বিশ্বাস থেকে তাদের রক্ষা করুন।

আখেরি চাহার শোম্বা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনাটি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেকের অনবদ্য গ্রন্থ *প্রচলিত ভুল* থেকে উল্লেখ করেছি। এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করি পাঠকের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়েছে যে, আখেরি চাহার শোম্বা নামে কোনোকিছু শরিয়তে নেই। সাহাবিগণ থেকে এ দিনের বিশেষ কোনো আমলও প্রমাণিত নয়। দিনটি উপলক্ষ্যে আমাদের সমাজে যে কাজগুলো

---

[১৮৯] *ফাতহুল বারি* : ৭/৭৪, ৪৪৪২; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/১৯৩।

[১৯০] *সহিহ মুসলিম* : ৪১৮; *সহিহ বুখারি* : ৬৮১ হাদিসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন।

[১৯১] *সহিহ বুখারি* : ৬৬৪; *সহিহ মুসলিম* : ৪১৮; *আর রাহিকুল মাখতুম* : ৫২৬।

[১৯২] *সিরাতু ইবনি ইসহাক* : ৭১১।

[১৯৩] *প্রচলিত ভুল* : ১১৮, ১২২, মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া থেকে প্রকাশিত।

প্রচলিত, এর একটিও সহিহভাবে প্রমাণিত নয়। সব মনগড়া ও মানুষের বানানো। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

চার. সফর মাসের শেষ বুধবারে বিশেষ সালাত

অনেক বক্তার মুখে এবং কিছু কিছু অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থে সফর মাসের শেষ বুধবারে একটি বিশেষ সালাতের কথা পাওয়া যায়। *জাওয়াহেরে গায়েবী* গ্রন্থে উল্লেখ আছে—'সফর মাসের শেষ বুধবারে চাশতের ওয়াক্তে দুই রাকআত সালাত নিম্ন নিয়মে আদায় করিলে আল্লাহ নামাজি ব্যক্তির অন্তর প্রশস্ত করিয়া দেবেন, রুজি-রোজগার বাড়াইয়া দেবেন। নিয়ম এই যে, প্রতি রাকআতে সুরা ফাতিহার পরে তিনবার সুরা ইখলাস পাঠ করিবে। আর সালাতের পরে সুরা আলাম নাশরাহ, সুরা ওয়াত্তিনি, সুরা ইজা জাআ ও সুরা ইখলাস ৮০ বার পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিবে।'[১৯৪]

এ আমলটি একবারে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। রাসুল ﷺ, সাহাবি, তাবিয়িন, তাবয়ে তাবিয়িন ও মুজতাহিদ ইমামদের থেকে সফর মাসের শেষ বুধবারে এ নিয়মের কোনো সালাত প্রমাণিত নয়। যদি বাস্তবে এ দিন সালাতের বিশেষ কোনো ফজিলত থাকত, তাহলে অবশ্যই রাসুল ﷺ পড়তেন এবং সাহাবিদের পড়তে বলতেন। আল্লামা আবদুল হাই লখনবি রাহ. এ সালাত সম্পর্কে বলেন, 'সফর মাসের শেষ বুধবারে বিশেষ পদ্ধতির সালাত জাল ও বানোয়াট। কোনো বিশেষ দিনে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করতে হলে শরিয়তে তা প্রমাণিত হতে হয়। সফরের শেষ বুধবারের বিশেষ সালাত প্রমাণিত নয়। এ জন্য এমন সালাত পড়া থেকে প্রত্যেক মুসলমানের বেঁচে থাকা অবশ্যই জরুরি।'[১৯৫]

[১৯৪] *বারো চান্দের ফযিলত* : ১৫।

[১৯৫] *আল-আসারুল মারফুআ* : ১১১।

চতুর্থ অধ্যায়

রবিউল আউয়াল : করণীয় ও বর্জনীয়

আরবি বর্ষপঞ্জিকার তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল। এ মাসে রাসুল ﷺ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করেছেন। সে হিসেবে এ মাস মুসলমানদের জন্য বিশেষ গুরুত্ববহ। বর্তমানে রবিউল আউয়াল মাস আসা মানেই মুসলমানদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি। কেউ কেউ রাসুলের ভালোবাসার নামে তাঁর জন্মদিনকে ইদ হিসেবে পালন করেন। জশনে জুলুস, আলোকসজ্জাসহ অনেক কিছু করে থাকেন। যারা করে না, তাদের রাসুলের দুশমন মনে করেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। কেউ কেউ আগ বেড়ে শয়তানও বলে ফেলেন। বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এটাকে রাসুলের ভালোবাসার মাপকাঠি বানানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আগে বিদআত সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরছি :

এক. বিদআতের বিশ্লেষণ

রাসুল ﷺ শিরকের পর বিদআতকে যেমন শক্তভাবে নিষেধ করেছেন, অন্য কোনো বিষয়কে সেভাবে করেননি।

১. রাসুল ﷺ বয়ানে বলতেন,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

জেনে রেখো, সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কথা। সর্বোত্তম হিদায়াত মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় নবআবিষ্কৃত বিষয়; আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।[১৯৬]

২. রাসুল ﷺ আরও বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

[১৯৬] *সহিহ মুসলিম* : ৮৬৭।

দীনের মধ্যে যদি কেউ এমন কোনো কাজ আবিষ্কার করে, যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে সেটা পরিত্যাজ্য।[১৯৭]

৩. রাসুল ﷺ আরও বলেন,

إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ.

আল্লাহ তাআলা বিদআতির তাওবা কবুল করেন না।[১৯৮]

৪. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ.

বিদআতি ব্যক্তি বিদআত পরিত্যাগ না-করা পর্যন্ত আল্লাহ তার আমল কবুল করেন না।[১৯৯]

৫. আবদুল্লাহ ইবনু বুসর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلَامِ.

যে ব্যক্তি কোনো বিদআতিকে সম্মান করল, সে ইসলাম মুছে যেতে সাহায্য করল।[২০০]

এ ছাড়া বহু হাদিস রয়েছে, যেগুলোতে সুন্নাতের বিপরীত যেসব রুসুম-রেওয়াজ, ইবাদত প্রচলিত আছে, সেগুলো বিদআত বলা হয়েছে। কেননা, বিদআত পরিষ্কার ভ্রষ্টতা এবং তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। বিদআতিদের তাওবা কবুল হয় না এবং তাদের সম্মান দেখানো হারাম।

দুই. বিদআতের সংজ্ঞা

মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ বিদআতের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে করেছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করছি :

আল্লামা আইনি রাহ. বিদআতের সংজ্ঞায় বলেন, 'এমন কোনো জিনিস সৃষ্টি করা, যা রাসুলের যুগে ছিল না।'[২০১]

---

[১৯৭] *সহিহ বুখারি* : ২৬৯৭, *সহিহ মুসলিম* : ১৭১৮।

[১৯৮] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৪২০২, তাবরানি; *শুআবুল ইমান* : ৯৪৫৭, বায়হাকি। হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সিকাহ। দেখুন, *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ১৭৪৫৭।

[১৯৯] *ইবনু মাজাহ* : ৫০।

[২০০] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৬৭৭২, তাবরানি।

[২০১] *উমদাতুল কারি* : ১৭/১৫৫।

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'বিদআতের মূল অর্থ হলো, এমন নতুন জিনিস সৃষ্টি করা, যার কোনো উপমা পূর্বে নেই। শরিয়তের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় সুন্নাহ-পরিপন্থি আমলকে। বিদআত নিন্দনীয়।'[২০২]

আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'বিদআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কোনো নতুন জিনিস আবিষ্কার করা, শরিয়তে যে বিষয়টি কোনোভাবে প্রমাণিত নয়। যদি বিষয়টি এমন হয় যে, কোনোভাবে শরিয়তে এর ভিত্তি রয়েছে, তাহলে সেটি বিদআত নয়; যদিও শাব্দিক অর্থে বিদআত।'[২০৩]

মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ রাহ. বলেন, 'বিদআত সেসব বিষয়কে বলা হয়, যার ভিত্তি শরিয়তে নেই। অর্থাৎ, কুরআন-হাদিসে এর কোনো ভিত্তি নেই। রাসুল ﷺ, সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবয়ে তাবিয়িনের যুগে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সে কাজকে দীনের কাজ মনে করা।'[২০৪]

মাওলানা শিব্বির আহমাদ উসমানি রাহ. লেখেন, 'এমন কাজ, যার ভিত্তি কুরআন-সুন্নাহ ও খাইরুল কুরুনে[২০৫] নেই, সে কাজকে দীনের কাজ ভেবে করা।'[২০৬]

আলিম ও ফকিহগণ এভাবেই বিদআতের সংজ্ঞা করেছেন। সেগুলো না বুঝে কিছু লোক বলে, শরিয়তে বিদআতের কোনো গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নেই। কেননা, বর্তমানে এমন বহু জিনিস আবিষ্কার করা হয়েছে, যার নাম-নিশানা খাইরুল কুরুনে ছিল না। তা ছাড়া সেসব নবআবিষ্কৃত জিনিস ছাড়া বর্তমানে জীবনধারণ অসম্ভব—যেমন : রেডিও, টেলিফোন, লাউড স্পিকার ইত্যাদি। যদি সেসব জিনিস বিদআত হয়, তাহলে মানুষের জীবন স্থবির হয়ে যাবে। এ জন্য তারা তাদের ইচ্ছামতো যা উত্তম মনে করে, সেগুলো 'বিদআতে হাসানা' নামে চালিয়ে দেয়! প্রয়োজনে তারা দলিলের বিকৃতিও করে।

লক্ষণীয়, আলিমগণ বিদআতকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটি শাব্দিক অর্থে অর্থাৎ, খাইরুল কুরুনের পর যে জিনিসই আবিষ্কার করা হবে—চাই সেটা ইবাদত হোক কিংবা দুনিয়ার কোনো বিষয়—সবই বিদআত। যারা এ অর্থে বিদআত ব্যবহার করেছেন, তাঁদের কাছে বিদআত দুই প্রকার : ১. বিদআতে হাসানা, ২. বিদআতে সাইয়িআ।

---

[২০২] *ফাতহুল বারি* : ৪/২৩৫।

[২০৩] *জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম* : ১৫৪, ইবনু রজব।

[২০৪] *কিফায়াতুল মুফতি* : ১/৩১৯।

[২০৫] খাইরুল কুরুন বলতে তিনটি যুগ বোঝানো হয়। রাসুল ﷺ, সাহাবা, তাবিয়ি ও তাবয়ে তাবিয়িদের যুগ।

[২০৬] *ফাতহুল মুলহিম* : ১/৪৫১।

বিদআতে হাসানা হলো, যার ভিত্তি শরিয়তে স্পষ্ট বা ইঙ্গিত-আকারে রয়েছে, যার কিছু অংশকে 'ওয়াজিব' এবং কিছু অংশকে 'মানদুব' তথা বৈধ বলা হয়। আর বিদআতে সাইয়িআ হলো, যার কোনো ভিত্তি শরিয়তে প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে নেই। যার কিছু অংশকে হারাম এবং কিছু অংশকে মাকরুহ বলা হয়েছে।

বিদআতের দ্বিতীয় অর্থ তথা শরিয়তের আলোকে বিদআত বলা হয়, 'দীনের মধ্যে এমন কোনো নতুন জিনিস সৃষ্টি করা, যার ভিত্তি শরিয়তে নেই।' এই প্রকারের বিদআত হলো ভ্রষ্টতা। হাদিসে এ ধরনের বিদআতকে ভ্রষ্টতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে দুনিয়ার যেসব বিষয়ের দলিল শরিয়তে পাওয়া যায়, সেটি বিদআত নয়। যদিও শাব্দিক অর্থে সেটিকে বিদআত বলা হয়।

সারকথা, যে জিনিসের ভিত্তি স্পষ্ট বা ইশারায় শরিয়তে নেই, সেটা সবার কাছে নিন্দনীয়। ব্যাপক অর্থে 'বিদআতে সাইয়িআ', বিশেষ অর্থে 'বিদআতে শারইয়া'। যে নবআবিষ্কৃত বিষয়ের ভিত্তি শরিয়তে স্পষ্ট বা ইঙ্গিতে আছে, সেটি কারও কাছে নিন্দনীয় নয়; প্রশংসনীয়। ব্যাপক অর্থে সেটি 'বিদআতে হাসানা', বিশেষ অর্থে সেটি বিদআত নয়। বিদআতের উভয় ব্যবহার আলিম ও ফকিহগণের কাছে শুদ্ধ। মর্মগত দিক দিয়ে সবাই একমত, যদিও শাব্দিক দিক দিয়ে কিছুটা মতভিন্নতা রয়েছে।

এভাবে বিদআতে শারইয়ার সংজ্ঞায় আলিমগণের মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ বলেন, 'যা রাসুলের যুগে ছিল না।' কেউ বলেন, 'যা সাহাবিদের যুগে ছিল না।' কেউ বলেন, যা খাইরুল কুরুনে ছিল না।'

এ ধরনের সংজ্ঞায় বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেননা, প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী সাহাবিদের কথা বিদআত হয়ে যায়। দ্বিতীয় কথা অনুযায়ী তাবিয়িন ও মুজতাহিদগণের কাজ বিদআত হয়ে যায়। সুতরাং বিদআতে শারইয়ার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই।

বাস্তবতা হলো, ফকিহগণের কথা রাসুলের যুগে পাওয়া এবং না-পাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরিয়তের আলোকে পাওয়া এবং না-পাওয়া। অর্থাৎ, যে নবআবিষ্কৃত বিষয়ের দলিল রাসুলের যুগ তথা কুরআন-হাদিসে নেই, সেটা হলো 'বিদআতে শারইয়া'; আর যে নবআবিষ্কৃত বিষয় জায়িজ হওয়ার দলিল কুরআন-হাদিসে পাওয়া যায়, যদিও সেটি অস্তিত্বে পরে আসে, তাহলে সেটি বিদআত নয়। সাহাবি, তাবিয়িন ও মুজতাহিদ ইমামগণের কাজ তো অবশ্যই কুরআন-হাদিস অনুযায়ী হবে; বরং তাঁদের কাজ শরিয়তের দলিল চতুষ্টয়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য।

কেননা, খাইরুল কুরুনের কাজ রাসুল ﷺ-এর যুগে থাকার নামান্তর।

যদি সে তিন যুগের কোনো যুগে কাজটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে সর্বযুগে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য কিছু ফকিহ বলেন, যার অস্তিত্ব রাসুলের যুগে ছিল না, সেটাকে বিদআতে শারইয়া বলে। কেউ কেউ নবিযুগের সঙ্গে সাহাবিযুগের কথাও যোগ করেছেন। কেউ কেউ খাইরুল কুরুনের কথা যোগ করেছেন। সবার কথার উদ্দেশ্য এক—অর্থাৎ, যে নবআবিষ্কৃত বিষয়ের দলিল কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট বা ইঙ্গিতে থাকবে না, সেটা বিদআত। এ জন্য বিদআতের সংজ্ঞায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ হলেও উদ্দেশ্য এক। কেউ সংক্ষিপ্তভাবে করেছেন, কেউ করেছেন বিস্তারিত। বাস্তবে কোনো বিরোধ নেই। শরিয়ত সম্পর্কে সঠিকভাবে না-জানার কারণে এমন ভুল ধারণা হয়েছে।

সতর্কবাণী

রাসুলের হাদিস—'যে দীনের মধ্যে এমন কোনো জিনিস সৃষ্টি করবে, যা পূর্বে ছিল না, তাহলে তা পরিত্যাজ্য'—এখানে 'مَنْ أَحْدَثَ' হলো ব্যাপক। এ জন্য মূল শরিয়তে কোনো জিনিস বৃদ্ধি করা; অথবা শরিয়তের কোনো বিষয়ে আলাদা কোনো গুণ বৃদ্ধি করা কিংবা পদ্ধতি বৃদ্ধি করা এবং যে পদ্ধতিতেই শরিয়তের বিধান পরিবর্তন হবে, সবই এ হাদিসের বিধানভুক্ত হবে। যেমন, কেউ কোনো মুবাহ বিষয়কে সুন্নাত মনে করল, অথবা ব্যাপক কোনো বিষয়কে নির্দিষ্ট করে ফেলল, অথবা এমন কোনো কাজ করল, যা দ্বারা বিধর্মীদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায়, এসব বিদআত ও ভ্রষ্টতা। গ্রন্থাদিতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। প্রথমে এ বিষয়ে সাহাবিগণের কিছু আলোচনা তুলে ধরছি :

১. এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-কে সংবাদ দেয় যে, মসজিদে মাগরিবের সালাতের পর একটি দল বসে আছে। তাদের একজন দাঁড়িয়ে বলছে, 'তাকবির এতবার বলো। তাসবি এতবার বলো এবং আলহামদুলিল্লাহ এতবার বলো।' এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেন, 'তারা কি বাস্তবেই এমনটা করছে?' সে বলল, 'হ্যাঁ'। ইবনু মাসউদ রা. বলেন, 'যদি তুমি তাদের এমনটা করতে দেখো, তাহলে আমাকে সংবাদ দেবে।' লোকটি তাকে সংবাদ দেয়। তিনি উপস্থিত হলেন, এমতাবস্থায় তাঁর মাথায় ছিল উঁচু টুপি। তিনি সেখানে বসে পড়েন। একজনকে এমনটা বলতে শুনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনু

মাসউদ। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তোমরা একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদআত করছ। তোমাদের ইলম কি রাসুলের সাহাবিদের থেকে অধিক হয়ে গেছে?'

তখন তাদের একজন দাঁড়িয়ে দুঃখপ্রকাশ করে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. তখন বলেন, 'এখনই তোমরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাও।'[২০৭]

শায়খুল ইসলাম ইবনু দাকিকিল ইদ রাহ. ইবনু মাসউদের বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন এভাবে,

مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ. تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ لَأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، يَعْنِي أَوْ إِنَّكُمْ لَمُتَعَلِّقُونَ بِذَنْبِ ضَلَالَةٌ.

যে আমাকে চিনেছ, তাকে আমার পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। যারা চিনতে পারোনি, জেনে নাও, আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ। তোমরা কি ধারণা করো, তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ থেকে বেশি পথপ্রদর্শনকারী? তোমরা স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় রয়েছ। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদআত করছ।[২০৮]

দেখুন, তাসবি-তাহলিল, তাকবির ও দুরুদ শরিফ তো অনেক ফজিলতের বিষয়। সাহাবিগণ সেগুলো একাকী ও গোপনে আদায় করতেন; কিন্তু কিছু লোক সেগুলো সম্মিলিত ও জোরে আমল শুরু করে। এ জন্য আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. সেটাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদআত বলেছেন।

২. প্রসিদ্ধ তাবিয়ি মুজাহিদ রাহ. বলেন, আমি ও উরওয়া মসজিদে প্রবেশ করি। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনু উমর আয়েশার হুজরার পাশে বসা ছিলেন। লোকেরা তখন মসজিদে চাশতের সালাত পড়ছিল। আমরা তাঁকে সে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'বিদআত'।[২০৯]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি বলেন, 'এখানে বিদআত দ্বারা উদ্দেশ্য, মসজিদে সম্মিলিতভাবে সালাত পড়া। নতুবা মূলত চাশতের সালাত বিদআত নয়।'[২১০]

৩. রাফি রাহ. বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু উমরের সামনে হাঁচি দিয়ে বলে,

---

[২০৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া* : ২/২৫৮, আবু নুআইম ইসফাহানি।

[২০৮] *ইহকামুল আহকাম শারহু উমদাতিল আহকাম* : ১/১২৩।

[২০৯] *সহিহ মুসলিম* : ৩০৯।

[২১০] *আল-মিনহাজ* : ৮/২৩৮।

'আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ', ইবনু উমর তার হাঁচির উত্তর না দিয়ে বললেন, 'আমিও বলি— "আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ"। জেনে রেখো, রাসুল ﷺ আমাকে এমনটা শিক্ষা দেননি। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন সর্বদা "আলহামদুলিল্লাহ" বলি।'[২১১]

এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো, হাঁচিদাতা 'আলহামদুলিল্লাহ'-এর সঙ্গে রাসুলের ওপর সালাম পেশ করেছিল; আর রাসুল ﷺ সেটা তাঁদের শিক্ষা দেননি। এ জন্য তিনি আপত্তি করেছেন।

৪. মুজাহিদ রাহ. বর্ণনা করেন, এক মুআজ্জিন আজানের পর 'আস-সালাত, আস-সালাত' বলে লোকদের ডাকছিল। ইবনু উমর রা. বলেন, 'একে বের করে দাও। কেননা, সে বিদআতি।'[২১২]

এভাবে হানাফি মাজহাবের গ্রন্থ *আল-বাহরুর রায়িকে* রয়েছে, আলি রা. একজন মুআজ্জিনকে ইশার সময় মানুষকে সালাতের দিকে ডাকতে দেখে বললেন, এ বিদআতিকে মসজিদ থেকে বের করে দাও।[২১৩]

দেখুন, আজানের পর জামাআতের জন্য লোকদের ডাকা বাহ্যত ভালো কাজ। তবে এটা রাসুলের যুগে ছিল না। এ জন্য ইবনু উমর সেটাকে বিদআত বলেছেন এবং নিজের চূড়ান্ত রাগ প্রকাশ করেছেন। তিনি সে মসজিদে সালাত পড়েননি। অপরদিকে আলি রা. সেই মুআজ্জিনকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৫. বর্ণিত আছে; একব্যক্তি ইদগাহে ইদের সালাতের পূর্বে নফল সালাত পড়া শুরু করে। আলি রা. তাকে বাধা দিলে সে বলে, 'আমি জানি, সালাত পড়ার কারণে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবেন না।' আলি রা. বললেন, 'আমি জানি যে, আল্লাহ কোনো কাজের ওপর ততক্ষণ নেকি প্রদান করেন না, যতক্ষণ রাসুল ﷺ সে কাজ করেননি; অথবা তিনি সে কাজের উৎসাহ প্রদান করেননি। সুতরাং তোমার এ সালাত অনর্থক। আর অনর্থক কাজ হারাম। আল্লাহ হয়তো রাসুলের বিরোধিতার কারণে তোমাকে শাস্তিও দিতে পারেন।'[২১৪]

---

[২১১] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৭৩৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫০৩৭।

[২১২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫৩৮।

[২১৩] *আল-বাহরুর রায়িক* : ২/২৯০।

[২১৪] *কানজুল উম্মাল* : ৫৬২৩।

লক্ষ করুন, সালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত জায়গামতো আদায় না করায় আলি রা. কত শক্তভাবে নিষেধ করেছেন এবং সেটাকে শাস্তিযোগ্য মনে করেছেন।

৬. বর্ণিত আছে; একব্যক্তি আসরের সালাতের পর অধিকাংশ সময় দু-রাকআত নফল সালাত আদায় করত। সে সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহ.-এর কাছে জিজ্ঞেস করে, 'আবু মুহাম্মাদ, আল্লাহ তাআলা কি আমার সালাতের কারণে আমাকে শাস্তি দেবেন?' তিনি বললেন, 'সালাত পড়ার কারণে আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন না; কিন্তু সুন্নাতের পরিপন্থি আমল করায় আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন।'[২১৫]

৭. অপর বর্ণনায় রয়েছে; ইবনু উমর রা. দুআয় লোকদের হাত বেশি উপরে তুলতে দেখে বলেন, 'তোমাদের হাত তোলা বিদআত। কেননা, রাসুল ﷺ তাঁর দুআয় বুকের ওপর হাত তোলেননি।'[২১৬]

৮. আরেক বর্ণনায় রয়েছে, উসমান রা.-কে একব্যক্তি খতনা অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে। তিনি অস্বীকার করে বলেন, 'আমরা রাসুলের যুগে খতনা অনুষ্ঠানে যেতাম না এবং দাওয়াতও করা হতো না।'[২১৭]

এ-সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আপাতত এখানে শেষ করলাম। উল্লিখিত বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্ট হলো, সাহাবিগণ তাসবি, সালাত, দুরুদ, হাঁচি, দুআ, দাওয়াত কবুল ইত্যাদি বিষয়ে রাসুলের অনুসরণ করেছেন। এটিও প্রমাণিত হলো, তাঁরা কতটুকু দৃঢ়তার সঙ্গে রাসুলের আদর্শের অনুসরণ করতেন। প্রত্যেক কাজকে তাঁরা ওই কাজের পন্থা অনুসারে আদায়কে জরুরি মনে করতেন। কোনো কমবেশি করতেন না। এমনকি সালাত ও জিকিরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত জায়গামতো আদায় না করা ও সুন্নাহর উলটো পদ্ধতি হওয়ায় সেটাকে বিদআত এবং শাস্তিযোগ্য মনে করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تختصوا يَوْم الْجُمُعَة
بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم.

জুমুআর রাতকে তোমরা অন্য রাত থেকে আলাদা করে ইবাদতের

[২১৫] *সুনানু দারিমি* : ৪৩৬।

[২১৬] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭৯০৮।

[২১৭] প্রাগুক্ত : ১৭৯০৮।

> জন্য নির্দিষ্ট করো না। জুমুআর দিনকে অন্য দিন থেকে আলাদা করে রোজার জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে কেউ যদি আগ থেকে রোজা রেখে আসে এবং ঘটনাক্রমে জুমুআর দিন চলে আসে, তাহলে ভিন্ন কথা। রোজা রাখতে পারবে।[২১৮]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, জুমুআর দিনের ফজিলত রয়েছে, শুধু এ কারণে জুমুআর রাতকে আলাদা করে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। প্রত্যেক ফজিলতের দিনে নিজের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোনো ইবাদত করা যাবে না।

রাসুলের কথা ও ইঙ্গিত বেশি বুঝতেন সাহাবিগণ। তাঁদের অনুসরণ ছাড়া ইবাদত ইবাদতই হবে না। ইমাম শাতিবি রাহ. হুজায়ফা রা.-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, 'যে ইবাদত রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণ করেননি, তোমরা সে ইবাদত করো না।'[২১৯]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেন, 'তোমরা আমাদের অনুসরণ করো। নতুন কোনো বিদআত আবিষ্কার করো না। কেননা, কোনো ইবাদত তোমাদের জন্য ছাড়া হয়নি।'[২২০]

১. রাসুলের দরবারে ইবনু মাসউদের অবস্থান

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আসার[২২১] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য রাসুলের দরবারে তাঁর মর্যাদা কী ছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করব :

ইবনু মাসউদের ওপর রাসুলের কী পরিমাণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, তা এই হাদিস থেকে প্রতিভাত হয়। রাসুল ﷺ বলেন,

> আমি উম্মতের জন্য সে বিষয়ের ওপর সন্তুষ্ট, যে বিষয়ের ওপর ইবনু মাসউদ সন্তুষ্ট।[২২২]

ইমাম নববি রাহ. লেখেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. খুলাফায়ে রাশিদিন থেকে কুরআনের বড় আলিম ছিলেন।'[২২৩]

---

[২১৮] *সহিহ মুসলিম* : ১১৪৪।

[২১৯] *আল-ইতিসাম* : ২/১৩২।

[২২০] প্রাগুক্ত : ১/৭৯।

[২২১] আসার (أثر) : 'আসার' শব্দটি কখনো কখনো রাসুল ﷺ-এর হাদিসকে নির্দেশ করে। তবে অনেকেই হাদিস ও আসারের কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে, সাহাবিগণ থেকে শরিয়ত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আসার বলে।

[২২২] *আল-মুসতাদরাক* : ৫৩৮৩৪।

[২২৩] *আল-মিনহাজ* : ৩/৪৩১।

ইমাম আবু হানিফা রাহ. ও হানাফি মাজহাবের অন্যান্য ইমাম তাঁর বর্ণনা দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন।

২. ইবনু উমরের অবস্থান

পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি ইবনু উমর রা.। সাহাবিগণের মধ্যে তিনি সুন্নাতের অধিক অনুসারী হওয়ায় বিখ্যাত হন। তিনি 'হামামুল মসজিদ' তথা মসজিদে সর্বদা অবস্থানকারী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। গ্রন্থাদিতে তাঁর অনেক মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে।

এ সিদ্ধান্ত সাহাবিগণের সিদ্ধান্ত। এবার শুনুন আলিমগণের সিদ্ধান্ত। ইমাম শাতিবি রাহ. বিদআতিদের আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, 'বিদআতের আরেকটি পন্থা হচ্ছে, ব্যাপক কোনো ইবাদতকে কোনো অবস্থা বা পদ্ধতির সঙ্গে নির্দিষ্ট করা। যেমন, সমবেত হয়ে জিকির করা। রাসুলের জন্মদিনকে ইদ হিসেবে গ্রহণ করা। কোনো ইবাদতকে কোনো সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা, শরিয়ত যা নির্দিষ্ট করেনি।'[২২৪]

আল্লামা ইবনু নুজাইম মিসরি রাহ. মোল্লা আলি কারি রাহ.-এর সূত্রে উল্লেখ করেন, 'যে ব্যক্তি কোনো নফল বা মুসতাহাবের ওপর সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিয়মিত তা আদায় করে, রুখসাতের ওপর আমল না করে, তাহলে শয়তান তাকে ভ্রষ্টতায় ফেলে দিয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বিদআত ও পরিত্যাজ্য কাজ গুরুত্বসহকারে করে, তার কী হবে?'[২২৫]

মাবসুত গ্রন্থে রয়েছে, 'রাসুল ﷺ জুমুআর সালাতে সুরা আলা ও গাশিয়া পড়েছেন। যদি কেউ বরকত মনে করে রাসুলের অনুসরণ করে, তাহলে ভালো; কিন্তু কোনো সালাতের জন্য কোনো সুরা নির্দিষ্ট করা মাকরুহ, যে সুরা ছাড়া অন্য কোনো সুরা সে তিলাওয়াত করে না।'[২২৬]

এসব বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, নফল বা মুসতাহাব কোনো আমলকে ওয়াজিব বা সুন্নাতের মতো গুরুত্বারোপ করা মাকরুহ। প্রত্যেক জিনিসকে আপন জায়গায় রাখা চাই। এভাবে নফল সালাতের জামাআত যদিও গুরুত্বপূর্ণ এবং আহ্বান করা ছাড়া রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত; কিন্তু জামাআতে পড়াকে গুরুত্বারোপ করা এবং

---

[২২৪] *আল-ইতিসাম*: ১/৩৯।

[২২৫] *আল-বাহরুর রায়িক*: ২/২৯০।

[২২৬] *আল-মাবসুত*: ২/৭২, সারাখসি।

নিয়মিত পড়াকে ফকিহগণ মাকরুহে তাহরিমি বলেছেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ. তাঁর *মাকতুবাতে* এমনই লিখেছেন।

আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানি রাহ. লেখেন, 'আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেছেন, রাসুল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, সুন্নাত ও নফল সালাত ঘরে পড়া। তবে কখনো ভিন্ন কারণে অন্য কোথাও পড়েছেন; যেভাবে রাসুলের অভ্যাস ছিল ফরজ সালাত মসজিদে পড়া। তবে ভিন্ন কারণে কখনো বাইরে পড়েছেন।' আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানি আরও লেখেন, 'এ জন্য নফল সালাত জামাআতে পড়া মাকরুহ। কেননা, সেটা সুন্নাতে মুআক্কাদার উলটো। এভাবে খুলাফায়ে রাশিদিন ও সাহাবিগণের আমলেরও উলটো। কারণ, তাঁরা সুন্নাতে মুআক্কাদা, নফল ও মুসতাহাব সালাত কখনো জামাআতে পড়েননি। সুতরাং বোঝা গেল, শর্তহীনভাবে নফল ও বিতর সালাত জামাআতে পড়া মাকরুহ। তবে আমরা শর্ত লাগিয়েছি, মানুষকে ডেকে পড়া যাবে না। কেননা, মানুষকে আহ্বান করা ছাড়া নফল সালাত কখনো কখনো জামাআতে পড়া তাঁদের থেকে প্রমাণিত।'[২২৭]

ফকিহুল মিল্লাত মাওলানা রাশিদ আহমাদ গাংগুহি রাহ. তাঁর *ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়াতে* লেখেন, 'হাদিসে যেসব জায়গায় নফল সালাত প্রমাণিত, সেসব জায়গা ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় নফল সালাত জামাআতে পড়া মাকরুহে তাহরিমি। সুতরাং সালাতে কুসুফ, তারাবি, ইসতিসকা জামাআতে পড়া যাবে। বাকি সালাত জামাআতে পড়া মাকরুহ।'[২২৮]

সাহাবি ও আলিমগণের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, শরিয়তের পরিভাষায় বিদআত শুধু এই জিনিসের নাম নয়, যা মূলত খারাপ; বরং সেসব ইবাদতেও হতে পারে, যা শরিয়ত ব্যাপক রেখেছে। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলো নির্দিষ্ট করা অথবা তার পদ্ধতি পালটে দেওয়া; অথবা শরিয়তের নির্দেশ ছিল চুপিচুপি আদায় করা, সেটাকে জোরে আদায় করা, শরিয়তের নির্দেশ ছিল একাকী আদায় করা, সেটাকে সম্মিলিত আদায় করা, সবগুলোই বিদআত। অর্থাৎ, কমানো ও বাড়ানো এবং যে জিনিস শরিয়তের চার দলিলের আলোকে প্রমাণিত নয়, তা স্পষ্ট বিদআত।

এভাবে যদি অমুসলিমদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে সেটাও নিষিদ্ধ। *হিদায়া* গ্রন্থে রয়েছে, 'ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেন, যদি ইমাম সালাতে কুরআন দেখে পড়ে, তাহলে ইমাম আবু হানিফার মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবু

---

২২৭ *ইলাউস সুনান*: ৪/২৮৬।

২২৮ *ফাতাওয়া রাশিদিয়া*: ৮৫।

ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ফাসিদ হবে না, তবে মাকরুহ হবে।'

নিহায়া গ্রন্থে রয়েছে, 'কারণ আহলে কিতাব সালাতে তাদের ধর্মীয় কিতাব দেখে পড়ত, এ জন্য মাকরুহ। কেননা, স্বভাবজাত প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোথাও আহলে কিতাবের সাদৃশ্য গ্রহণে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।'

হিদায়াতে আছে, 'ইমাম একাকী উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো মাকরুহ। কেননা, এর দ্বারা আহলে কিতাবের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায়।'[২২৯]

ফিকহের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল, শরিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদতকে অমুসলিমদের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত রাখতে হবে। যখন কোনোভাবে সাদৃশ্য চলে আসবে, তখন ইবাদতে বিঘ্নতা চলে আসবে। ইবাদত মাকরুহ হয়ে যাবে। কেননা, এটাও দীনের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতির নামান্তর। অমুসলিমদের সঙ্গে সাদৃশ্য শুধু ইবাদতে নয়; বরং স্বভাবজাত ও প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোথাও জায়িজ নেই। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى.

> যে মুসলমান ছাড়া অন্য কারও সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না।[২৩০]

হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলি থানবি রাহ.-এর সংশ্রবপ্রাপ্ত আল্লামা কাজি ইবরাহিম রাহ. *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিদআত* নামে একটি চমৎকার গ্রন্থ লিখেছেন। মূল গ্রন্থটি উরদু ভাষায় লেখা। অনুবাদ ও তাখরিজের কাজ আল্লাহ আমাকে করার তাওফিক দিয়েছেন। সেটি সামনে রেখে বিদআত-সংক্রান্ত নিম্নের দীর্ঘ আলোচনাটি কিছুটা পরির্তন-পরিবর্ধন করে এখানে যোগ করেছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন। আমিন।

৩. বিদআতের পক্ষে কিছু দলিল ও সেগুলোর পর্যালোচনা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, কেউ যখন কোনো বিদআত আবিষ্কার করে অথবা প্রচলিত কোনো বিদআত সমর্থন করে, তখন সে সেগুলোর পক্ষে কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল বের করার চেষ্টা করে, অথবা কুরআনের আয়াত ও হাদিসের অর্থ বিকৃত করে; কিংবা পূর্ববর্তীদের কোনো ইমামের বক্তব্য নিজের মনমতো ব্যাখ্যা করে

---

[২২৯] *হিদায়া* : ১/৬৪।

[২৩০] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৬৯৫।

নিজে ভুলে পতিত হয় এবং অন্যকেও ভ্রষ্ট করে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবি রাহ. বলেন, 'প্রত্যেক বিদআতি তার বিদআতের পক্ষে শরিয়তের নস দ্বারা দলিল পেশ করে। সে দলিলকে এমনভাবে পেশ করবে, যা তার বোধ ও প্রবৃত্তির পক্ষে হয়।'[২৩১]

বিদআতিদের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, তারা শর্তহীন ও ব্যাপক ইবাদতকে নির্দিষ্ট করে রুসুম-রেওয়াজযুক্ত অবস্থায় আদায় করে বলে, 'এভাবে আদায় করতে সমস্যা কোথায়? এভাবে করলে কেন গুনাহ হবে? এখানে অনিষ্টের কী আছে? বরং এভাবে করা মুসতাহাব এবং সাওয়াবের কাজ।' এখানে চিন্তার বিষয়, শরিয়ত যে জিনিসকে মুতলাক তথা শর্তহীন রেখেছে, সেটাকে মুতলাকভাবে আদায় করতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে কোনোকিছু যুক্ত করা দীনকে বিকৃতির নামান্তর। এ কারণে সে ইবাদত নিষিদ্ধ ও বিদআত হয়ে যাবে। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যারা তাকদির অস্বীকার করত, তাদের ব্যাপারে উমর ইবনু আবদিল আজিজ রাহ. বলেন, 'তোমরা যেসব আয়াত পড়ে তাকদির অস্বীকার করছ, সাহাবিগণও সেসব আয়াত পড়েছেন। আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা তোমাদের চেয়ে তাঁরা বেশি বুঝেছেন। এরপরও তাঁরা তাকদিরের কথা স্বীকার করেছেন।'[২৩২]

শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ. *ফাতওয়ায়ে আজিজিয়াতে* লেখেন, 'হক ও বাতিলকে চেনার মাপকাঠি হলো সাহাবি ও তাবিয়িনের বুঝ। কেননা, সাহাবিগণ রাসুল ﷺ থেকে চাক্ষুষ দেখে বুঝেছিলেন। তাঁদের বোঝে ভুলের সম্ভাবনা নেই।'[২৩৩]

বিদআতিগণ তাদের বিদআতের পক্ষে কুরআন-হাদিস থেকে যেসব দলিল দিয়ে থাকে, সেগুলোর বিস্তারিত জবাব রয়েছে। একটি স্বীকৃত বাস্তবতা হলো, এসব দলিল সাহাবি, তাবিয়ি ও মুজতাহিদ ইমামদের সামনে ছিল; কিন্তু তাঁরা তখন সেসব দলিল থেকে এসব বিদআত আমল আবিষ্কার করেননি, তখন এ আমলগুলো কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে? এ-সকল লোক কি সাহাবি ও তাবিয়িনের থেকে বেশি বোঝে? উমর ইবনু আবদিল আজিজ রাহ. বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলেন। বিদআতিগণ যদিও কিছু হাদিসের ব্যাপকতা দ্বারা দলিল পেশ করে থাকে। এ জন্য সেসব দলিল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি :

---

[২৩১] *আল-ইতিসাম* : ১/১৩৪।

[২৩২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬১২।

[২৩৩] *ফাতওয়ায়ে আজিজিয়া* : ৩২১।

প্রথম দলিল

বর্ণিত আছে; রাসুল ﷺ বলেছেন,

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ.

> মুসলমানগণ যে বিষয়কে ভালো মনে করবে, আল্লাহও সে বিষয়কে ভালো মনে করেন।[২৩৪]

তারা এ হাদিস দ্বারা তাদের বিদআতের পক্ষে দলিল পেশ করে। এসব আমল যেহেতু মুসলমানগণ করছে, সুতরাং তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, বিদআত হতে পারে না!

পর্যালোচনা

বাহ্যিকভাবে হাদিসের অর্থ সঠিক মনে হলেও বাস্তবে সঠিক নয়। কেননা, হাদিসের অর্থ তা-ই হয়, যা হাদিসের মূলনীতি অনুযায়ী হয় এবং এ শাস্ত্রের ইমামদের থেকে বর্ণিত। ভালো করে লক্ষ করুন, উসুলে হাদিসের একটি মূলনীতি হলো, একটি বর্ণনার ব্যাখ্যা আরেকটি বর্ণনা দ্বারা করা হয়। যখন অপর বর্ণনায় এই বর্ণনার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, তখন এই বর্ণনার অর্থ নির্ধারিত হয়ে যায় এবং সে সময় ভিন্ন অর্থ করা সঠিক নয়। উল্লিখিত হাদিসে মুহাদ্দিসগণ দুই প্রকারের আলোচনা করেছেন :

প্রথমত সনদ-সংক্রান্ত। সঠিক কথা হলো, বর্ণনাটি মাওকুফ। মারফুসূত্রে রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। আল্লামা জায়লায়ি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি আমি ইবনু মাসউদ রা. থেকে মাওকুফসূত্রে পেয়েছি।'[২৩৫]

দ্বিতীয় আলোচনা হলো, হাদিসে উল্লিখিত 'الْمُسْلِمُونَ' দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? এর শুরুতে যে 'আলিফ-লাম' আছে, সেটা কোন প্রকারের? যদি 'আলিফ-লাম' 'ইসতিগরাকি' হয়, তাহলে উদ্দেশ্য হবে সকল মুসলমান। অর্থাৎ, যে বিষয়টি সকল মুসলমান ভালো মনে করবে, সেটা আল্লাহর কাছেও ভালো। তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ইজমা তথা উম্মাহর ঐকমত্য। তখন এই হাদিস দ্বারা বিদআতিদের কোনো ফায়দা হবে না। কেননা, বিদআত তো রাসুলের স্বীকৃতপ্রাপ্ত খাইরুল কুরুনে ছিল না; বরং ঐকমত্য ছিল বিদআতের বিপরীত।

---

[২৩৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৬০০।

[২৩৫] *নাসবুর রায়াহ* : ৪/১৩৩।

যদি 'আলিফ-লাম' 'জিনসি' হয়, তাহলে উদ্দেশ্য হবে উম্মতের কোনো দল কোনো কাজ ভালো মনে করলে সেটি আল্লাহও ভালো মনে করেন। তখন আর উম্মতে কোনো ভ্রান্ত দল থাকবে না, সবাই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে; অথচ রাসুল ﷺ বলেছেন, 'মুক্তিপ্রাপ্ত শুধু সে দল, যারা আমার ও সাহাবিগণের অনুসরণ করে।'[২৩৬]

যদি 'আলিফ-লাম' 'আহদে খারিজি' ধরে নেওয়া হয়, তখন হাদিস দ্বারা মুসলমানদের একটি বিশেষ দল উদ্দেশ্য হবে। এখন প্রশ্ন, সে বিশেষ দল কারা? অন্য হাদিসে সেটি স্পষ্ট করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন,

> আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তর দেখলেন। পরে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্বাচন করলেন। তাঁকে রিসালাতের মহান দায়িত্ব দ্বারা ভূষিত করলেন। এর পর মানুষের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সাহাবিদের নির্বাচন করলেন। তাঁদের দীনের সাহায্যকারী ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী নির্ধারণ করলেন। সুতরাং যে জিনিস মুসলমানগণ উত্তম মনে করবে, সে জিনিস আল্লাহ তাআলা উত্তম মনে করেন। যে জিনিস মুসলমানগণ মন্দ মনে করে, আল্লাহও সে জিনিস মন্দ মনে করেন।[২৩৭]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত অপর বর্ণনায় রয়েছে,

> যদি কোনো ব্যক্তি কারও তরিকা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সে যেন ওই বান্দাদের তরিকা গ্রহণ করে, যারা পৃথিবী থেকে চলে গেছে। কেননা, জীবিতগণ ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। আর সে-সকল লোক হলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবি। তাঁরা উম্মতের সর্বোত্তম লোক। তাঁরা নেক হৃদয়ের অধিকারী। গভীর ইলমের অধিকারী। সবচেয়ে কম লৌকিকতার অধিকারী। আল্লাহ তাঁদের রাসুলের সান্নিধ্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করেছেন। তাঁদের মর্যাদা জানো এবং তাঁদের পথে চলো। তাঁদের জীবনচরিত ও চরিত্রকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো। কেননা, তাঁরা ছিলেন সঠিক পথের পথিক।[২৩৮]

স্পষ্ট কথা হলো, এসব বর্ণনা দ্বারা ইবনু মাসউদের উদ্দেশ্য হলো, সাহাবিদের মর্যাদা প্রমাণিত করা এবং তাঁদের অনুসরণের জন্য লোকদের উৎসাহ দেওয়া। কেননা, আল্লাহ তাআলা সাহাবিগণকে রাসুলের সান্নিধ্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য

---

[২৩৬] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৬৪১।
[২৩৭] *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৬০০।
[২৩৮] *মিশকাত* : ১৯৩।

নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা হলেন উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম। রাসুলের সান্নিধ্যের কারণে আল্লাহ তাঁদের এ পরিমাণ গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যে জিনিস ভালো মনে করবেন, আল্লাহও সে জিনিস ভালো মনে করবেন। তাঁরা যে জিনিস অপছন্দ করবেন, আল্লাহও সে জিনিস অপছন্দ করবেন। তোমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। কেননা, তাঁরা অনুসরণযোগ্য। এতেই রয়েছে তোমাদের সফলতা।

এসব হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হলো, হাদিসে উল্লিখিত 'মুসলিমুনা' দ্বারা সাহাবিগণ উদ্দেশ্য। সর্বাবস্থায় তাঁদের অনুসরণ জরুরি। এসব বিদআত তো সাহাবিগণের আমলের পরিপন্থি, যা তোমরা আবিষ্কার করেছ। এ হাদিস মূলত বিদআতের বিরুদ্ধে একটি শক্ত দলিল; কিন্তু বিদআতিরা অজ্ঞতাবশত এটিকে তাদের দলিল মনে করে বসে আছে।

দ্বিতীয় দলিল

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদিস দ্বারা অধিকাংশ বিদআতি দলিল দিয়ে থাকে। রাসুল ﷺ বলেন,

> مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.
>
> যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালোকাজ শুরু করল এবং তার ওপর কেউ আমল করল, আল্লাহ ওই আমলকারী ব্যক্তির মতো তাকেও সাওয়াব প্রদান করবেন। তবে তার কারণে আমলকারীর কোনো সাওয়াব কমবে না।[২৩৯]

পর্যালোচনা

এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা একেবারে অনর্থক কাজ। কেননা, পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, ব্যাপকতা হিসেবে বিদআত দুই প্রকার : সাইয়িআ ও হাসানা।

বিদআতে 'হাসানা' হলো, যা জায়িজ হওয়ার দলিল শরিয়তে রয়েছে। হয়তো স্পষ্টভাবে অথবা ইশারায়; আর বিদআতের বিশেষ অর্থ হলো, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা—চাই সেটা 'হাসানা' হোক অথবা 'সাইয়িআ'। এ জন্য 'হাসানা' মূলত

[২৩৯] *সহিহ মুসলিম* : ১০১৭।

বিদআতই নয়; বরং সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ হাদিস দ্বারা দলিল দেওয়া যাবে না যে, কিছু বিদআত রয়েছে 'হাসানা'। যদি দলিল দেওয়াও হয়, তবু কোনো ফায়দা নেই। কারণ, এ বিদআতগুলো যে 'হাসানা', এর পক্ষে কী দলিল রয়েছে? মোটকথা, দলিল পেশ করা কখনো সম্ভব নয়।

এ হাদিসেরও সঠিক অর্থ অন্য হাদিস দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। যেমন :

> وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.
>
> যে কাউকে হিদায়াতের দিকে ডাকল এবং সে তার ডাকে সাড়া দিলো, তাহলে সে ওই ব্যক্তির আমলের সাওয়াব পাবে। তবে আমলকারীর আমলনামা থেকে কোনো সাওয়াব কমবে না।[২৪০]

সুনানুত তিরমিজিতে বর্ণিত অপর হাদিসের শব্দ, من أحيى سنة অর্থাৎ, যে কোনো সুন্নাতকে জীবিত করল, তার জন্য পূর্বোল্লিখিত প্রতিদান রয়েছে।[২৪১]

এ দুই হাদিস দ্বারা প্রতিভাত হলো, হাদিসে উল্লিখিত سن শব্দ দ্বারা নবআবিষ্কার উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য জীবিত করা। অর্থাৎ, যদি কেউ মৃত কোনো সুন্নাতকে জীবিত করে অথবা প্রয়োজনের কারণে শরিয়তের দলিলের আলোকে কোনো কাজ করে—যেমনটা করেছেন মুজতাহিদগণ—তার পরবর্তী কেউ যদি এর ওপর আমল করে, তাহলে সে আমলকারীর মতো প্রতিদান পাবে। এ হাদিস স্পষ্ট হলো, মৃত সুন্নাতকে জীবিত করার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি বিদআতের বিরুদ্ধে দলিল, পক্ষে নয়।

সমাজে প্রচলিত যত বিদআত আছে, সেগুলোর পক্ষে এ দুটি হাদিস দ্বারা দলিল দেওয়া হয়। এ জন্য হাদিস দুটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো। উপরিউক্ত আলোচনা সামনে রাখলে ইদে মিলাদুন্নবি বিদআত নাকি মুসতাহাব, তা পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তিন. ইদে মিলাদুন্নবি পালনের ইতিহাস

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে, কোনো আমল শরিয়তসম্মত হতে হলে তা রাসুলের যুগে অথবা খাইরুল কুরুনে স্পষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিতে প্রমাণিত হতে হবে।

---

[২৪০] *ইবনু মাজাহ* : ২০৫।

[২৪১] *সুনানুত তিরমিজি* : ৪৩১৮।

সুতরাং রাসুলের জন্ম-উপলক্ষ্যে যে ইদের আয়োজন করা হয়, সাহাবি, তাবিয়ি, তাবয়ে তাবিয়ি ও মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে এমন কোনো অনুষ্ঠান ছিল না।

রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ। রাসুলের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবনের সব ঘটনা জানা মুসলমানদের করণীয় এবং তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসার নিদর্শন। বিশেষত, নবুওয়াতের পরের কথা এবং কাজ জানা তো দীনের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবিগণ যেহেতু রাসুল ﷺ-কে অধিক ভালোবাসতেন, তাই রাসুলের আলোচনাও তাঁরা বেশি করতেন। এ জন্য হাদিসের গ্রন্থাদিতে রাসুলের দৈহিক কাঠামো, গুণাবলি ও খুঁটিনাটি অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা কখনো বয়ানের মজলিসে, কখনো পরস্পর আলোচনায়, কখনো দারস-তাদরিসে রাসুলের আলোচনা করেছেন; কিন্তু রাসুলের জন্ম এবং সে-সংক্রান্ত ঘটনার তেমন উল্লেখ তাতে পাওয়া যায়নি। অন্যান্য সাধারণ ঘটনার মতো জন্মের ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। বলা যায়, খাইরুল কুরুনে বয়ানের পদ্ধতি এমনই ছিল।

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, রাসুলের জন্মের আলোচনা করা মানদুব ও মুসতাহাব। তবে কথা হচ্ছে মিলাদ নিয়ে। এটা স্পষ্ট যে, রাসুলের জন্মবৃত্তান্ত ও প্রচলিত মিলাদ ভিন্ন। কোনো শর্ত-আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া সেটি করা মুসতাহাব। কেননা, খাইরুল কুরুনে বিষয়টি প্রমাণিত। আর মিলাদ মাহফিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সময় নির্ধারণ করে মানুষ ডেকে গুরুত্বের সঙ্গে রাসুলের জন্মের আলোচনা করা, যার অস্তিত্ব খাইরুল কুরুনে ছিল না। এবার আমরা শরিয়তের আলোকে মিলাদের হুকুম নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে জানা দরকার, রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে জন্মবার্ষিকী পালন কবে শুরু হয়েছে? *তারিখু ইবনি খাল্লিকানে* বর্ণিত; প্রথমত ৬০৪ হিজরিতে ইরাকের মসুল শহরের বাদশাহ মুজাফফার উদ্দিনের নির্দেশে এই বিদআত সৃষ্টি হয়। যারা রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে মিলাদ করেন, তারাও এ কথা মানেন যে, বাদশাহ মুজাফফার উদ্দিনের আগে কেউ রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে মিলাদের আয়োজন করেনি। মুজাফফার উদ্দিন যে মিলাদের আবিষ্কারক, এ বিষয়ে কয়েকজন আলিমের বক্তব্য তুলে ধরছি :

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ হাফিজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির রাহ. বলেন, ‘বাদশাহ মুজাফফার রবিউল আউয়ালে রাসুলের মিলাদ পালন করতেন এবং এ উপলক্ষ্যে মাহফিলের ব্যবস্থা করতেন।’[২৪২]

---

[২৪২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৩/১২৭।

এ ছাড়া যারা মিলাদ মাহফিলকে শরিয়তসিদ্ধ বলেন, তারাও এ কথা স্বীকার করেন যে, মিলাদ মাহফিলের প্রচলন শুরু করেছেন বাদশাহ মুজাফফার উদ্দিন। জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. ও সালিহ আশ শামির বক্তব্য সামনে আসছে।

বাদশাহ মুজাফফার সম্পর্কে অনেক ইতিহাসবিদই নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। এবার দেখব, তার সম্পর্কে সে যুগের আলিমগণ কী বলেছেন। তার ব্যাপারে দুই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। কেউ তাকে সুফি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, আবার কেউ তার ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু নুসাইর তার সম্পর্কে লেখেন, 'সে ছিল অপচয়কারী বাদশাহ। সে যুগের কিছু আলিমকে নির্দেশ দেয়, তারা যেন তাদের ইজতিহাদের ওপর আমল করেন। অন্য কারও মাজহাবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেন। এভাবে তার প্রতি কিছু আলিম ধাবিত হন এবং রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে রবিউল আউয়ালে মিলাদের ব্যবস্থা করেন। সে-ই এই আমলের প্রথম আবিষ্কারক।'[২৪৩]

ইবনু নুসাইরের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি যে, ১২ রবিউল আউয়ালে যার নির্দেশে ইদে মিলাদুন্নবি প্রথম শুরু হলো, সে বাদশাহর অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ। তিনি ছিলেন অপচয়কারী। যদিও ইতিহাসে তার কিছু ভালো গুণের কথা উল্লেখ আছে। বাদশাহ মুজাফফার উদ্দিনের নির্দেশকে যে আলিম সমর্থন করেছিলেন, এবার তার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব।

মাওলানা আবদুস সামি *আনওয়ারে সাতিআ* গ্রন্থে লেখেন, 'রবিউল আউয়ালে এ আমল নির্ধারিত হয়েছিল মসুল শহরে। সেখানে উমর ইবনু হাসান নামে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ আমল আবিষ্কার করেন। সে যুগের বাদশাহ ওই ব্যক্তির অনুসরণ করেন। প্রত্যেক বছর রবিউল আউয়ালে প্রচুর অর্থ খরচ করে মিলাদ মাহফিলের ব্যবস্থা করতেন।'

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. উমর ইবনু হাসান সম্পর্কে বলেন, 'সে ইমাম ও পূর্ববর্তী মনীষীদের ব্যাপারে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানকারী। খারাপ ভাষার অধিকারী। বোকা ও অধিক অহংকারী। দীনের বিধিবিধানের ব্যাপারে উদাসীন।'[২৪৪]

ইবনুন নাজ্জার রাহ. তার সম্পর্কে বলেন, 'সে যে একজন মিথ্যুক ও দুর্বল, এ বিষয়ে আমি সবাইকে একমত দেখেছি।'[২৪৫]

---

[২৪৩] *রাহে সুন্নাত* : ১৬২, সরফরাজ খান সফদর।

[২৪৪] *লিসানুল মিজান* : ৪/২৯৬, ইবনু হাজার।

[২৪৫] প্রাগুক্ত : ৪/২৯৭।

উমর ইবনু হাসান ইবনু দিহয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ ভালো মন্তব্য করেছেন যদিও; কিন্তু এককথায় তিনি বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। এ ছাড়া তারা যখন ইদে মিলাদুন্নবি প্রথম শুরু করেন, তখন যে অবস্থায় ছিল, পরে আর এ অবস্থায় থাকেনি। সময়ের আবর্তে তার সঙ্গে এমন বহু কাজ যুক্ত হয়েছে, শরিয়ত যেগুলো সমর্থন করে না। বর্তমানে ইদে মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়। 'মারহাবা ইয়া মুসতাফা'র স্লোগান দিয়ে 'জশনে জুলুস' মিছিল বের করা হয়; অথচ মিছিলের সঙ্গে রাসুলের জন্মের কোনো সম্পর্ক নেই। রাসুল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন সাহাবিগণ। তাঁরা কখনো রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে মিছিল বের করেননি।

চার. রাসুল ﷺ জন্ম উপলক্ষ্যে কী করতেন

রাসুল ﷺ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সবার জন্য আদর্শ। এখানে লক্ষণীয়, রাসুল ﷺ নিজে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কী করতেন?

১. আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ.

রাসুল ﷺ সোমবারে রোজা রাখতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'সোমবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এ ছাড়া সোমবারে আমার ওপর প্রথম ওহি অবতীর্ণ হয়েছে।'[২৪৬]

এ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, রাসুল ﷺ প্রত্যেক সোমবারে রোজা রাখতেন। সোমবারে রাজা রাখার একাধিক কারণ ছিল। এর মধ্যে দুটি কারণ এ হাদিসে উল্লেখ আছে। একটি হলো, সোমবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, সে দিন প্রথম তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া সোমবারে রোজা রাখার আরও দুটি কারণ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

২. উসামা রা. বর্ণনা করেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ، وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ، إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا، قَالَ: أَيُّ يَوْمَيْنِ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، قَالَ: ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

---

[২৪৬] *সহিহ মুসলিম* : ১১৬২।

আমি বলি, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি কখনো ধারাবাহিক রোজা রাখেন, মনে হয় আর ভাঙবেন না। আবার কখনো ধারাবাহিকভাবে খেতে থাকেন, মনে হয় আর রোজা রাখবেন না। তবে দুই দিন ছাড়া—সে দুই দিন আপনি নিয়মিত রোজা রাখেন।' তিনি বললেন, 'কোন দুই দিন?' আমি বলি, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার।' তিনি বললেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়, আর আমি পছন্দ করি যে, রোজা অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক।'[২৪৭]

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল পেশ করা হয়। আমি পছন্দ করি, আমার আমল রোজা অবস্থায় আল্লাহর কাছে পেশ করা হোক।[২৪৮]

এ দুই হাদিস থেকে সোমবারে রোজা রাখার আরেকটি কারণ আমরা জানতে পাই। সোমবারে আল্লাহর কাছে বান্দার আমল পেশ করা হয়। এ ছাড়া তিনি এটি পছন্দ করতেন যে, রোজা অবস্থায় তাঁর আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হোক।

৪. এ ছাড়া আরেকটি কারণ পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা রা. বলেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ.

সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করেনি, তারা ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তবে কারও অন্তরে অপর ভাই সম্পর্কে বিদ্বেষ থাকলে তাকে ক্ষমা করা হয় না।[২৪৯]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে সোমবারে রোজা রাখার মোট চারটি কারণ জানতে গেল। জন্মগ্রহণ, প্রথম ওহি অবতরণ, আল্লাহর কাছে আমল পেশ হওয়া এবং জান্নাতের দরজা খুলে যাওয়া। তাঁর জন্ম উপলক্ষ্যে সোমবার রোজা রাখা ছাড়া অন্য কোনো আমল প্রমাণিত নয়। সোমবার বছরে ৪৬ দিন থেকে ৫৪ দিন আসে। সে হিসেবে চাইলে কেউ বছরে প্রতি সোমবার রোজা রাখতে পারে। তবে ১২ রবিউল আউয়াল নিজের জন্মদিন নির্ধারণ করে কোনো আমল তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়।

---

[২৪৭] *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৭৫৩।

[২৪৮] *শামায়িলুত তিরমিজি* : ২৮৮।

[২৪৯] *সহিহ মুসলিম* : ২৫৬৫।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, রাসুল ﷺ যে দিন জন্মগ্রহণ করেছেন, রোজা রাখার জন্য সে দিন নির্ধারণ করেননি। যদি তারিখ নির্ধারণ করতেন, তাহলে রাসুল ﷺ প্রতিবছর শুধু ১২ রবিউল আউয়াল রোজা রাখতেন। কারণ, সে তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

যারা রাসুলের জন্মদিবস পালন করেন, তারা এ ক্ষেত্রে রাসুলের আদর্শের অনুসরণ করেননি। রাসুল রাখতেন রোজা; কিন্তু তারা সেটাকে বানিয়ে নিয়েছে ইদ। আর এখন তো 'জশনে জুলুস'সহ অনেক কিছু যুক্ত হয়েছে। রাসুল ﷺ যেখানে প্রতিসোমবারে রোজা রাখতেন, সেখানে তারা ইদ পালন করে বছরে মাত্র একদিন!

১. আবু লাহাবের দাসী আজাদ বনাম ইদে মিলাদুন্নবি

রাসুলের জন্মের সংবাদ শুনে আবু লাহাব তার দাসী সুয়াইবাকে স্বাধীন করে দেয়। ফলে ইনতিকালের পর একজন তাকে স্বপ্নে দেখে, কবরে তার শাস্তি কিছুটা লাঘব হয়েছে। রাসুলের জন্মের কারণে আবু লাহাব খুশি হয়ে বাঁদি স্বাধীন করার কারণে যদি কবরের শাস্তি লাঘব হয়, তাহলে আমরা ইদে মিলাদুন্নবি পালন করতে সমস্যা কোথায়? প্রথমে *বুখারি* থেকে ঘটনাটি দেখুন,

> قَالَ عُرْوَةُ وثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ.
>
> উরওয়া বলেন, সুয়াইবা ছিলেন আবু লাহাবের দাসী। আবু লাহাব তাকে মুক্ত করে দেয়। সুয়াইবা পরে রাসুল ﷺ-কে দুধ পান করান। আবু লাহাব যখন মারা যায়, তখন তার পরিবারের কেউ একজন স্বপ্নে দেখে যে, সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হয়েছে?' সে বলে, 'যখন থেকে তোমাদের থেকে দূরে আছি; তবে সুয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে এ আঙুল দ্বারা কিছু পানি পাই।'[২৫০]

উরওয়ার মুরসাল[২৫১] এই বর্ণনা দ্বারা আমরা জানতে পারি, আবু লাহাব সুয়াইবাকে

---

[২৫০] *সহিহ বুখারি*: ৫১০১।

[২৫১] **মুরসাল** (مرسل) : যে হাদিসের সনদে ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে। অর্থাৎ, সাহাবির নাম বাদ পড়েছে

আজাদ করেছিল; কিন্তু রাসুল ﷺ-এর জন্মের খবরে তাকে আজাদ করে দেয়, এমন কথা হাদিসে নেই।

আবু লাহাব সুয়াইবাকে কখন স্বাধীন করেছিল, এ ব্যাপারে মতভিন্নতা আছে। মুহাদ্দিসগণের অনেকের মতে, জন্মের সংবাদ শুনেই স্বাধীন করেছিল। কিন্তু অনেক ইতিহাসবিদের মত হলো, জন্মের সুসংবাদ শুনে তাকে স্বাধীন করা হয়নি; বরং পরবর্তী সময়ে হিজরতের আগে কিংবা পরে তাকে স্বাধীন করা হয়। এখানে কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরছি :

আল্লামা ইবনু সাআদ বলেন, 'আমার কাছে মুহাম্মাদ ইবনু উমর বলেছেন, তিনি অনেক আলিম থেকে বর্ণনা করেছেন; তাঁরা বলেন, তিনি মক্কায় ছিলেন, রাসুল ﷺ তখন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন, খাদিজা রা.-ও তাঁকে সম্মান করতেন। সুয়াইবা তখন দাসী ছিলেন। তাঁকে মুক্ত করতে তাঁরই কাছে বিক্রির জন্য খাদিজা রা. আবু লাহাবের কাছে প্রস্তাব করেন; কিন্তু আবু লাহাব তাতে রাজি হয়নি। এরপর রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরত করলে সে তাঁকে মুক্ত করে দেয়।'[২৫২]

ইমাম ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. *আল-ইসতিআব* নামে সাহাবিগণের জীবনী-বিষয়ক একটি গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটি সর্বযুগে সমাদৃত ও পঠিত। রাসুল ﷺ-কে সুয়াইবা দুধ পান করিয়েছেন, এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'রাসুল ﷺ সুয়াইবাকে সম্মান করতেন। তিনি খাদিজা রা.-কে বিয়ে করার পর সুয়াইবা তাঁদের কাছে আসেন। তখন খাদিজাও তাঁকে সম্মান করেন। তখনো তিনি দাসী ছিলেন। রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরতের পর আবু লাহাব তাঁকে মুক্ত করে দেয়।'[২৫৩]

ইমাম ইবনুল জাওজি রাহ. বলেন, 'রাসুল ﷺ খাদিজাকে বিয়ে করার পর সুয়াইবা তাঁদের কাছে এলেন। রাসুল ﷺ ও খাদিজা রা. তাঁকে সম্মান করেন। সে সময়ে তিনি দাসী ছিলেন। এরপর আবু লাহাব তাঁকে মুক্ত করে দেয়।'[২৫৪]

আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, আবু লাহাব সুয়াইবাকে মুক্ত করেছিল মদিনায় রাসুলের হিজরতের পর। ইবনুল জাওজির বর্ণনায় দেখা যায়, রাসুল ﷺ খাদিজাকে বিয়ে করার পরও তিনি বাঁদি ছিলেন। রাসুলের জন্ম-সংবাদ শুনে আবু লাহাব তাঁকে

এবং তাবিয়ি সরাসরি রাসুল ﷺ-এর উল্লেখ করে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

[২৫২] *আত-তাবকাতুল কুবরা* : ১/১০৮।

[২৫৩] *আল-ইসতিআব* : ১/২৮।

[২৫৪] *আল-জামি লি ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতিল উলামা ফিল মাওলিদ* : ১২/১৯।

মুক্ত করেছিল, নিশ্চিতভাবে সে কথা বলার সুযোগ নেই। এ ছাড়া কবরে তার শাস্তি লাঘবের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ আপত্তি করেছেন। অনেকেই বলেছেন, এ কথা সঠিক নয়।

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'হাদিস থেকে বোঝা যায়, কাফিরের ভালোকাজ আখিরাতে উপকারে আসবে; অথচ এটি কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট বিপরীত কথা। তাহলে এ হাদিসের ব্যাখ্যা কী? প্রথম জবাব হলো, হাদিসটি মুরসাল। উরওয়া কার থেকে বর্ণনা করেছেন, নাম উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, যদি ধরে নিই যে, তিনি মাওসুল তথা সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, তাহলে হাদিসে একজন লোকের স্বপ্নের কথা বলা হচ্ছে; আর স্বপ্ন কখনো দলিল হয় না। যে স্বপ্ন দেখেছে, সে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি, পরবর্তীকালে করেছে। এ জন্য তাঁর স্বপ্ন দ্বারা দলিল দেওয়া যায় না। আর সত্য হলেও সেটা রাসুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেমনটা হয়েছিল আবু তালিবের সঙ্গে। তার কবরের শাস্তি লাঘব হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে।'[২৫৫]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানির বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায় যে, আবু লাহাবের কবরের শাস্তি লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। প্রথমত, হাদিসটি মুরসাল। দ্বিতীয়ত, হাদিসটি সরাসরি কুরআনের আয়াতের বিপরীত। এ জন্য আবু লাহাবের কবরের শাস্তি লাঘব হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বলা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়।

২. ইদে মিলাদুন্নবি সম্পর্কে আলিমগণের বক্তব্য

আমরা আলোচনা করেছি রবিউল আউয়ালে রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে ইদে মিলাদুন্নবি পালন করা শুরু হয়েছে খাইরুল কুরুনের অনেক পরে। এ ছাড়া শুরুতে যে দুজন লোক রয়েছেন, তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যায়। বিশেষত ওই আলিমের ব্যাপারে কঠোর বক্তব্য পাওয়া যায়। এবার দেখব ইদে মিলাদুন্নবি সম্পর্কে প্রথিতযশা আলিমগণ কী বলেন।

তাজ উদ্দিন ফাকিহানি রাহ. এ সম্পর্কে বলেন, 'কুরআন-সুন্নাহে আমি ইদে মিলাদুন্নবির কোনো ভিত্তির কথা জানতে পারিনি। উম্মাহর আলিম—যারা দীনের ক্ষেত্রে আদর্শ—তাঁদের কারও থেকে এ ইদের কথা বর্ণিত হয়নি। এটা হলো বিদআত; বাতিল সম্প্রদায় আবিষ্কার করেছে। মূলত পেটুকদল তাদের কুপ্রবৃত্তির

[২৫৫] *ফাতহুল বারি* : ৯/১৪৫।

অনুসরণ থেকে এটার প্রচলন শুরু করেছে। শরিয়তের বিধানসমূহ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই—হয়তো সেটা ওয়াজিব, মানদুব, মুবাহ, মাকরুহ কিংবা হারাম হবে। ইদে মিলাদুন্নবি সবার মতে ওয়াজিব নয়; মানদুবও নয়। কারণ, মানদুব হলো শরিয়ত যা করতে বলেছে; তবে না করলে ভর্ৎসনা করেনি। এটার অনুমতি শরিয়ত প্রদান করেনি। সাহাবি, তাবিয়ি ও মুজতাহিদ ইমামগণ এটা করেননি।'[২৫৬]

ইবনু আমির আলহাজ সানআনি রাহ. তিনি তাঁর গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন—'রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে সৃষ্ট বিদআত, যদিও তারা মনে করে তা সবচেয়ে বড় ইবাদত!' এরপর বলেন, 'রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে তারা যা করে, সেগুলো দীনের নিদর্শন মনে করে; অথচ সে কাজে অনেক বিদআত ও হারাম কাজ রয়েছে।'

ইদে মিলাদুন্নবির অনেক খারাপ দিক আলোচনার পর তিনি আরও বলেন, 'যদি মিলাদুন্নবিতে উপরিউক্ত খারাপ কাজসমূহ না-ই পাওয়া যায়, শুধু খাবার পাক করা হয় এবং ভাই-বন্ধুদের মিলাদের নিয়তে দাওয়াত করা হয়, তাহলে শুধু মিলাদের নিয়তের কারণে তা বিদআত হয়ে যাবে। কেননা, এটা দ্বারা দীনের মধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তীগণ এমন কোনো আমল করেননি; অথচ পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করা উত্তম। কেননা, তারা রাসুলের সুন্নাতের অধিক অনুসরণ করতেন এবং রাসুল ﷺ-কে অধিক ভালোবাসতেন। তাঁদের কারও থেকে বর্ণিত হয়নি যে, তারা ইদে মিলাদুন্নবি পালন করেছেন। আমরা তো তাঁদের অনুসারী।'[২৫৭]

ইবনু আমির আলহাজ সানআনির বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হলো। প্রথমত, রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে মহা-ধুমধামে ইদ পালনের সবব বা কারণ সাহাবি, তাবিয়ি, তাবয়ে তাবিয়ি ও মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে বিদ্যমান ছিল। কারণ, আমাদের মতো তাঁরাও রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসতেন হৃদয় থেকে। সাহাবিদের ভালোবাসার সঙ্গে অন্য কারও ভালোবাসার তুলনা হয় না। তাঁরা তাঁদের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন রাসুল ﷺ-কে; কিন্তু রাসুলকে ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ তারা ১২ রবিউল আউয়ালে কখনো কোনো আয়োজন করেননি। বর্তমানে ১২ তারিখে রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসার নামে যা করা হয়, সাহাবিগণ সেটা দেখলে হয়তো আশ্চর্যান্বিত হতেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'কিছু মানুষ হয়তো খ্রিষ্টানদের দেখে

---

[২৫৬] *আল-মাওরিদ ফি আমালিল মাওলিদ* : ১০, ফাকিহানি।

[২৫৭] *আল-মাদখাল* : ১/৪৮২।

রাসুলের জন্মদিনকে ইদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা ইসা আ.-এর জন্মদিনে উৎসব করে; অথবা রাসুলের ভালোবাসা ও সম্মান প্রকাশের জন্য। তারা তাদের ভালোবাসা ও ইজতিহাদের বিনিময় পেয়ে যাবে; কিন্তু জন্মদিনকেই ইদ বানানো বিদআতের বিনিময় পাবে না। যদিও রাসুলের জন্মতারিখ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। সেটা সঠিক পথবিরোধী। কেননা, পূর্ববর্তী কেউ এ ধরনের ইদ পালন করেননি। যদি তা পুণ্যের এবং এটা করা সঠিক হতো, তাহলে পূর্ববর্তীগণ অবশ্যই ইদ পালন করতেন। কেননা, তাঁরা রাসুল ﷺ-কে অধিক ভালোবাসতেন ও সম্মান করতেন। পুণ্যকাজের ব্যাপারে তাঁরা অতি আগ্রহী ছিলেন।'[২৫৮]

শায়খুল ইসলাম আরও বলেন, 'শরিয়তে অনির্দিষ্ট কোনো দিনকে উৎসবের জন্য নির্ধারণ করা—যেমন, রবিউল আউয়ালকে মিলাদ হিসেবে—সেটা বিদআত। সালাফ এমনটি করেননি এবং করাও ভালোবাসেননি।'[২৫৯]

ইবনু হাজার হায়তামি রাহ. বলেন, 'অনেক লোক রাসুলের জন্ম-উপলক্ষ্যে মিলাদ-কিয়াম করে থাকে। সেটাও বিদআত। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী কারও থেকে বর্ণিত হয়নি যে, তাঁরা রাসুলের সম্মানার্থে এগুলো করেছেন।'[২৬০]

আহমাদ ইবনু আবদির রাহমান আদ দুয়াইশ বলেন, 'রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে মিলাদের মাহফিল করা জায়িজ নয়। কেননা, এটা বিদআত। রাসুল ﷺ, খুলাফায়ে রাশিদিন ও খাইরুল কুরুনের কেউ করেননি।'[২৬১]

আল্লামা ইবনু কাসির রাহ. বলেন, 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী আলিমগণ বলেন, প্রত্যেক এমন কথা ও কাজ, যা সাহাবিগণ থেকে প্রমাণিত নয়, সেটা বিদআত। কেননা, যদি কথা বা কাজ কল্যাণকর হতো, তাহলে সাহাবিগণ অবশ্যই এ কাজে অগ্রগামী হতেন। কারণ, প্রত্যেক কল্যাণকর কাজে তাঁরা অগ্রগামী ছিলেন।'[২৬২]

হাফিজ ইমামুদ্দিন ইবনু কাসির রাহ. একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এখানে উল্লেখ করেছেন। যেকোনো কল্যাণকর কাজে সাহাবিগণ সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁদের অন্যান্য মানুষ থেকে বাছাই করে

---

[২৫৮] *ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম* : ২/৮৪, ইবনু তাইমিয়া।

[২৫৯] *মাজমুআতু ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া* : ২৫/২৯৭।

[২৬০] *আল-ফাতাওয়া আল-হাদিসিয়া* : ১/৫৮।

[২৬১] *ফাতাওয়া আল-লাজনাতিত দায়িমা* : ৩/২১৪।

[২৬২] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৭/২৭৮।

রাসুলের সাহাবি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তাঁরা সবার চেয়ে অগ্রগামী। রাসুলের জন্য তাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়েছেন। অত্যাচারের পাহাড় সহ্য করেছেন। জীবনের নজরানা পেশ করেছেন। ত্যাগের চূড়ান্ত নমুনা প্রদর্শন করেছেন। রাসুলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইদ পালন করা, জশনে জুলুসের নামে বিশাল মিছিল করা যদি শরিয়তসম্মত হতো, তাহলে রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ মদিনায় আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। রাসুল ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে সাহাবিগণ মহা-ধুমধামে জশনে জুলুস বের করতেন। যে কারণ দেখিয়ে আপনি ইদে মিলাদুন্নবি জায়িজ প্রমাণিত করার চেষ্টা করছেন, সে কারণ সাহাবিগণের যুগেও ছিল। আপনি যেমন রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসেন, সাহাবিগণও ভালোবাসতেন। রাসুলের জীবদ্দশায় তাঁরা অনেক ১২ রবিউল আউয়াল পার করেছেন; কিন্তু আমাদের মতো সে দিনকে ধুমধামের সঙ্গে পালন করেননি। অন্য দিনের মতো সাধারণভাবে পার করেছেন। কারণ বিদ্যমান থাকার পর কোনো সাহাবি না করা; সে কাজ বিদআত হতে যথেষ্ট। ইবনু কাসির রাহ. যেমনটি বলেছেন।

নাসিরুদ্দিন শাফিয়ি রাহ. বলেন, '১২ রবিউল আউয়ালে ইদে মিলাদুন্নবি পালন করা যাবে না। কেননা, তা খাইরুল কুরুনের পরের যুগে শুরু হয়েছে। যে বিষয়কে পূর্ববর্তীরা অহেতুক বলেছেন, আমরা সেটার অনুসরণ করতে পারি না।'[২৬৩]

ইবাদতের ক্ষেত্রে এটাই সর্বযুগের স্বীকৃত মূলনীতি! যে ইবাদত খাইরুল কুরুনে ছিল না, সাহাবিগণ করেননি; সেটা কখনো ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। রাসুলের প্রসিদ্ধ সাহাবি হুজায়ফা রা. বলেন, 'এমন ইবাদত, যা রাসুলের সাহাবিগণ করেননি, সে ইবাদত তোমরা করো না।'[২৬৪]

এখন কথা হলো, ইদে মিলাদুন্নবি ও মিলাদকে বর্তমানে রাসুল ﷺ-কে সম্মান জানানোর স্বতন্ত্র ইবাদত বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ইবাদত কি সাহাবিগণ করেছেন? অথচ তাঁরাও রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসতেন। সম্মান করতেন।

ইমাম শাতিবি রাহ. বলেন, 'বিদআতের আরেকটি প্রকার হচ্ছে, ব্যাপক কোনো ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করা। যেমন, এক সুরে সবাই জিকির করা। রাসুলের জন্মগ্রহণের দিনকে ইদ হিসেবে গ্রহণ করা।'[২৬৫]

ইমাম শাতিবি রাহ. এখানে দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির দিকে ইঙ্গিত

---

[২৬৩] *ফাতাওয়া রাশিদিয়া* : ১/১৯৩।

[২৬৪] *আল-ইতিসাম* : ২/১৩২।

[২৬৫] প্রাগুক্ত : ১/৩৯।

করেছেন। শরিয়ত যে ইবাদতকে ব্যাপক রেখেছে, সে ইবাদতের বিশেষ কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাবে না। যদি ব্যাপক কোনো ইবাদতকে কেউ একটি বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে নির্ধারণ করে ফেলে, তাহলে সেটা বিদআত হয়ে যাবে। পূর্বে এ ব্যাপারে সাহাবিদের নসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সাহাবিগণের আমল থেকে আমরা দেখেছি যে, শরিয়ত কোনো আমল ব্যাপক রেখেছে অথবা একাকী করতে বলেছে, সে আমল বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ধারণ করলে অথবা একাকী আমলকে সম্মিলিতভাবে করলে সাহাবিগণ সেটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

রাসুল ﷺ-কে দুনিয়ার সকল মুসলমান সম্মান করে। তাঁকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করতেন সাহাবিগণ। শরিয়তের আলোকে যুগে যুগে সবাই রাসুল ﷺ-কে সম্মান করেছেন; কিন্তু সম্মান প্রদর্শনের বিশেষ কোনো পদ্ধতি ছিল না। ১২ রবিউল আউয়াল প্রত্যেক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; কিন্তু তাঁরা সে দিন বিশেষ কোনো আমল করেননি। অথচ বর্তমানে এটাকে রাসুল ﷺ-কে সম্মানের পদ্ধতি নির্ধারণ করে ফেলা হয়েছে। যারা ১২ রবিউল আউয়ালে ইদে মিলাদুন্নবি পালন করে না, জশনে জুলুসে শরিক হয় না, তাদের রাসুলের দুশমন মনে করা হয়। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়; অথচ পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইদে মিলাদুন্নবি পালন করা বিদআত।

আহমাদ ইবনু আবদির রাজ্জাক আদ দুয়াইশ রাহ. বলেন, 'বিদআত হবে শরিয়তসিদ্ধ নয় এমন কোনো বিষয় আবিষ্কারের মাধ্যমে। যেমন, রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে মিলাদের আয়োজন করা। এটা পরিত্যাজ্য।'[২৬৬]

এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শায়খের পুরো আলোচনা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, 'রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা অথবা মিরাজের রাতে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, এ ব্যাপারে আপনার মত কী?' উত্তরে তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ কথা, কাজ ও জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। দাওয়াতের পদ্ধতি, প্রচার ও দীনের শাআইর তথা নিদর্শন সম্পর্কে তিনি অধিক জ্ঞাত। রাসুল ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত হিদায়াত ও ইসলামের নিদর্শনাবলিতে ইদে মিলাদুন্নবি ছিল না। এর পর সাহাবিগণ রাসুলের দেখানো পথে দাওয়াত ও ইসলামের নিদর্শনাবলি প্রচার করেছেন। রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে তাঁরা কোনো মাহফিলের ব্যবস্থা

---

[২৬৬] *ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়িমা* : ৩/১২৯।

করেছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কোনো গ্রহণযোগ্য ইমাম থেকে এ ধরনের ইদে মিলাদুন্নবির আয়োজনের কথা পাওয়া যায় না। বিদআতি ও দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়িকারী রাফিজি ও শিয়াদের থেকে মিলাদের কথা পাওয়া যায়, যারা দীনের ব্যাপারে সামান্য জ্ঞান রাখে। এ জন্য রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে মিলাদের আয়োজন করা বিদআত।'[২৬৭]

ইদে মিলাদুন্নবিকে বিদআত বলেছেন, এমন বহু আলিমের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যাবে। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির কথা ভেবে বিখ্যাত কয়েকজন আলিমের মাত্র কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করলাম। উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য এতেই রয়েছে অনেক পাথেয়।

পাঁচ. 'দাওয়াতে ইসলামি'র লিফলেট : একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশে বড় গলায় যারা নিজেদের সুন্নি দাবি করেন, 'দাওয়াতে ইসলামি'র ভাইয়েরা তাদের মধ্যে অন্যতম। যারা ১২ রবিউল আউয়ালে ইদে মিলাদুন্নবি পালন করে না, তারা তাদের আবু লাহাবের উত্তরসূরি বলে খিস্তিখেউড় করেন। ইদে মিলাদুন্নবিকে তারা 'সাইয়িদুল আইয়াদ' তথা 'সব ইদের সেরা ইদ' বলে ঘোষণা দিয়ে প্রচার করেন। দাওয়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাদেরি লিখিতি *বসন্তের প্রভাত* গ্রন্থটি যারা পড়েছেন, তারা হয়তো দেখেছেন যে, ১২ রবিউল আউয়াল নিয়ে তাদের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। তাতে এমন উদ্ভট কথাবার্তা বলা হয়েছে, যা শুনলে যেকোনো সচেতন মানুষ হাসবে। সে গ্রন্থের ২৩ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'বারো রবিউল আউয়াল বেশি বেশি আলো জ্বালান। প্রতিটি ঘরে সম্ভব হলে ১২টি করে বাতি জ্বালান!'

একজন সাধারণ মানুষের মনেও এ সংশয় সৃষ্টি হবে, রাসুলের জন্মদিনের সঙ্গে ১২টা বাতি জ্বালানোর কী সম্পর্ক? রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে বাতির কী সম্পর্ক? রাসুলের সংশ্রবপ্রাপ্ত সাহাবি, তাবিয়ি, তাবয়ে তাবিয়ি ও মুজতাহিদ ইমামগণ কি এভাবে বাতি জ্বালিয়েছেন? এ ছাড়া যেখানে একটি বাতি দ্বারা কাজ করা সম্ভব, সেখানে ১২টা বাতি জ্বালানো কি অপচয় হবে না?

প্রথম দলিল

দাওয়াতে ইসলামির ভাইয়েরা রবিউল আউয়াল এলেই মসজিদে মসজিদে লিফলেট বিতরণ করেন। সেই লিফলেটে থাকে ইদে মিলাদুন্নবির ফজিলত নিয়ে

---

[২৬৭] প্রাগুক্ত : ৩/১২৯।

আলোচনা। এখানে আমি তাদের লিফলেটে উল্লিখিত দলিল নিয়ে পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

লিফলেটে ইদে মিলাদুন্নবি প্রমাণের জন্য কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

আপনি বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া এবং সেটারই ওপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, তা তাদের সমস্ত ধনসম্পদের চেয়ে উত্তম। [সুরা ইউনুস : ৫৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার ওপর আনন্দ প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন মুসলমানদের; আর মানুষের জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো রাসুল ﷺ। সুতরাং রাসুল ﷺ যে দিন পৃথিবীতে এসেছেন, সে দিন অবশ্যই আনন্দিত হওয়া কুরআন সমর্থন করে।

পর্যালোচনা

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার ওপর আনন্দ প্রকাশ করতে বলেছেন। এখন আমাদের প্রথমে জানতে হবে, এই আয়াতে উল্লিখিত অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। কারও মতে, রহমত দ্বারা নবি উদ্দেশ্য, আবার কারও মতে কুরআন উদ্দেশ্য। যদি কুরআন ধরে নিই, তাহলে তো এ আয়াত দ্বারা ইদে মিলাদুন্নবি পালনের প্রশ্নই আসে না। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরছি :

এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মুফাসসির আল্লামা ইবনু জারির তাবারি রাহ. বলেন, 'এ আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলাম; আর রহমত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন।'[২৬৮]

আল্লামা কুরতুবি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, 'ইবনু আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন; আর দয়া তথা রহমত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি আমাদের কুরআনের পরিবারভুক্ত করেছেন। মুজাহিদ, জাহহাক, হাসান ও কাতাদা রাহ. বলেন, অনুগ্রহ দ্বারা উদ্দেশ্য ইমান; আর রহমত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। ইসলাম ও কুরআনের কারণে আল্লাহ আনন্দ প্রকাশ করতে বলেছেন।'[২৬৯]

আয়াতে রহমত দ্বারা নবি উদ্দেশ্য নিলেও ইদে মিলাদুন্নবি পালনের কথা বলা

---

[২৬৮] *তাফসিরু ইবনি জারির তাবারি* : ১১/১২৭।

[২৬৯] *তাফসিরু কুরতুবি* : ৪/৬৫৩।

হয়নি। কীসের জন্য আনন্দ প্রকাশের কথা বলা হয়েছে, সেটি হাফিজ ইবনু কাসির রাহ. স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,'আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও সত্য ধর্ম এসেছে, তার জন্য তোমরা আনন্দ প্রকাশ করো।'[২৭০] আল্লামা মাহমুদ আলুসি রাহ.-ও এমনটা বলেছেন।[২৭১]

এ আয়াত আল্লাহ তাআলা জিবরিলের মাধ্যমে সরাসরি অবতীর্ণ করেছেন রাসুলের ওপর। রাসুল ﷺ শুনিয়েছেন সাহাবিদের। রাসুল ﷺ থেকে প্রথম শুনেছেন সাহাবিগণ। এ জন্য প্রথমে তাঁরা আনন্দিত হয়েছেন; কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাঁরা তাঁদের আনন্দে কি ইদে মিলাদুন্নবি পালন করেছেন? নারায়ে রিসালাতের ধ্বনি তুলে রাজপথ কাঁপিয়ে জশনে জুলুস বের করেছেন? আপনাদের কথা অনুযায়ী এ আয়াত দ্বারা যদি ইদে মিলাদুন্নবি ও জশনে জুলুস উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সাহাবিগণ এ আয়াতের ওপর আমল করেননি। কেননা, তাঁরা যে রাসুলের জন্মদিনে ইদ পালন করেননি! মিছিল বের করেননি!

আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে হিদায়াতের আলোকবর্তিকা দিয়ে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন, এ জন্য আল্লাহ আনন্দিত হতে বলেছেন। কারণ, তিনি যদি রাসুলকে না পাঠাতেন, তাহলে মানুষ আলোর দিশা পেত না। জাহান্নামের তিমিরাচ্ছন্ন পথ থেকে জান্নাতের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে উঠে আসত না। এ জন্য আলোচ্য আয়াতে আনন্দিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পূর্ণভাবে রাসুলের অনুসরণ করা এবং তাঁর আনীত হিদায়াত অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করা। রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে ইদ পালন ও মিছিল বের করা এ আয়াতে কখনো উদ্দেশ্য নয়। যদি হতো, তাহলে অবশ্যই সাহাবি, তাবিয়ি, তাবয়ে তাবিয়ি ও মুজতাহিদ ইমামগণ মহাসমারোহে ইদ পালন করতেন। পৃথিবীর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে নারায়ে রিসালতের ধ্বনি তুলতেন।

দ্বিতীয় দলিল

দাওয়াতে ইসলামির লিফলেট এবং রাজারবাগ দরবার শরিফের মাসিক মুখপত্র *আল-বায়্যিনাতে* ইদে মিলাদুন্নবির প্রমাণে কয়েকজন সাহাবির আসার উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমে আসারগুলো দেখুন :

> *আবু বকর রা. বলেন, যে মওলুদখানি তথা ইদে মিলাদুন্নবির জন্য একটি দিরহাম খরচ করবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।*

---

[২৭০] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৪/২৭৫।

[২৭১] *রুহুল মাআনি* : ১১/১৮২।

উসমান রা. বলেন, যে ব্যক্তি মওলুদখানির জন্য একটি দিরহাম খরচ করল, সে যেন বদর ও হুনাইনযুদ্ধে অংশ নিল।

হাসান বসরি রাহ. বলেন, হায়! আমার যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকত, তাহলে আমি তা মওলুদখানির জন্য খরচ করতাম।

ইমাম শাফিয়ি রাহ. বলেন, যে মওলুদখানির জন্য তার বন্ধুদের সমবেত করে, খাবারের আয়োজন করে, একটি স্থান শূন্য রাখে, ইহসানের সঙ্গে আমল করে এবং মওলুদখানির ব্যবস্থা করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সিদ্দিকিন, শুহাদা ও সালিহিনের সঙ্গে হাশর করাবেন এবং তাকে জান্নাতুন নায়িমে অবস্থান করাবেন।

জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. তাঁর রচিত 'আল-ওয়াসাইল ফি শারহিশ শামায়িল' গ্রন্থে লেখেন, যে ঘর, মসজিদ বা মহল্লায় মওলুদখানি হয়, সেই ঘর, মসজিদ ও মহল্লাকে ফেরেশতাগণ ঘিরে ফেলেন এবং তাদের জন্য দুআ করেন, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন। আর যারা নুর দ্বারা পরিবেষ্টি—অর্থাৎ, জিবরিল, মিকাইল, ইসরাফিল ও আজরাইল আ.—সে-সকল মওলুদখানির ব্যবস্থাকারীদের জন্য দুআ করতে থাকেন।

সব কথার প্রমাণ হিসেবে তারা আল্লামা ইবনু হাজার হায়তামির *আন-নিমাতুল কুবরার* সূত্র উল্লেখ করেছে।

উসতাজে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দলিলগুলো সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'উপরিউক্ত বর্ণনাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যাঁদের নামে এসব কথা চালানো হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলোর ভিত্তিহীনতা একেবারে স্পষ্ট। কারণ, যদি এগুলোর কোনো ভিত্তি থাকত, তাহলে তো মিলাদকে পরবর্তীকালের উদ্ভাবিত বিদআত বলে স্বীকার করার প্রয়োজন হতো না; বরং সহেজেই মিলাদকে সাহাবিগণের আমল বলে প্রমাণিত করা যেত। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, মওলুদখানির প্রচলনের পরে কোনো মূর্খ এগুলো তৈরি করেছে।'

রাজারবাগীরা এসব জাল বর্ণনার সমর্থনে *আন-নিমাতুল কুবরা আলাল আলমের* উদ্ধৃতি পেশ করেছে; অথচ তাতে এগুলোর চিহ্নমাত্র নেই। এ গ্রন্থটির মাখতুতা (পাণ্ডুলিপি) দারুল কুতুবিল মিসরিয়া কায়রোতে (ইতিহাস ২৫০৮/১৯২১) সংরক্ষিত আছে এবং আমাদের কাছে তার ফটোকপিও রয়েছে। আমরা তা আদ্যোপান্ত পড়েছি।

এর বিপরীতে *আন-নিমাতুল কুবরা* গ্রন্থে ইবনু হাজার মাক্কি রাহ. মিলাদকে ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীর অনেক পরের উদ্ভাবিত বিষয় বলেছেন এবং মিলাদের তথাকথিত বর্ণনাগুলো খণ্ডন করে বলেছেন, 'মানুষকে এগুলো থেকে দূরে রাখা ওয়াজিব।'[২৭২]

রাজারবাগীরা মানুষকে ধোঁকা দিতে একটি নকল *আন-নিমাতুল কুবরার*[২৭৩] সূত্র দিয়েছে, যা ইস্তাম্বুলের 'মাকতাবাতুল হাকিকা'র ছাপা। তুরস্কের এ প্রকাশনাটি কট্টর বিদআতপন্থিদের। তারা বিভিন্ন শিরক ও বিদআতের সমর্থনে বইপত্র প্রকাশ করে থাকে। এমনকি কখনো কখনো কোনো বিদআতপন্থি লেখকের বাজারি বই উপস্থপান করে অথবা লেখকের নাম পরিবর্তন করে পূর্ববর্তী কোনো স্বীকৃত আলিমের নামে তা চালিয়ে দেয়। পরে তাতে এমন একটি নাম জুড়ে দেয়, যে নামে ওই মনীষীর কোনো রচনা ছিল; কিন্তু বর্তমানে তা মুদ্রিত নেই। এখানেও মাকতাবাতুল হাকিকা-সংশ্লিষ্টরা এ কারসাজি করেছে। ইবনু হাজার মাক্কির নাম ও তাঁর গ্রন্থ *আন-নিমাতুল কুবরার* নাম এমন একটি গ্রন্থের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা কোনো বেদীন ও নির্বোধ বিদআতির রচনা। যে জাল বর্ণনা তৈরির ক্ষেত্রে সামান্য বুদ্ধিরও পরিচয় দিতে সক্ষম হয়নি, যাতে কিছু সময়ের জন্য হলেও মানুষের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে! সে এত কাঁচা মিথ্যা বলেছে যে, শোনামাত্র সেটা ধরা পড়ে যায়।

সে এতটুকু চিন্তা করেনি যে, ৮০০-৯০০ বছর পরের উদ্ভাবিত মওলুদখানির ফজিলত যদি আবু বকর ও উসমান রা.-এর নামে চালানো হয়, তবে কে তা বিশ্বাস করবে? তেমনি হাসান বসরি ও ইমাম শাফিয়ির নামে এমন প্রলাপ চালু করা হলে তা কি বাজারে চলবে? সে এটাও চিন্তা করেনি যে, জালালুদ্দিন সুয়ুতি তো আমাদের নিকটবর্তী সময়ের ব্যক্তি। তাঁর নামে কোনোকিছু বানানো হলে তা কি গোপন থাকবে? অথচ সে তা-ই করেছে এবং সুয়ুতি রাহ.-এর নামে এমন রচনা জুড়ে দিয়েছে, যে নামে তাঁর কোনো রচনাই নেই। সুয়ুতি রাহ. নিজে তাঁর রচনাবলির তালিকা লিখে গেছেন এবং তাঁর পরের আলিমগণও তাঁর রচনাগুলো গণনা করেছেন, যা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে *আল-ওয়াসায়িল ফি শারহিশ শামায়িল* নামে তাতে কিছুই নেই। এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল হালিম চিশতি কৃত *তাজকেরায়ে জালালুদ্দিন সুয়ুতি* (১১৭-৩৮০ পৃষ্ঠা) দেখা যেতে পারে।

---

[২৭২] *আন-নিমাতুল কুবরা*: ২-৩ পাণ্ডুলিপি।

[২৭৩] দারুশ শাফকা, ফাতিহ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।

তদুপরি সুয়ুতি রাহ. নিজে তাঁর গ্রন্থ *আল-হাবি* (১/২৫১-২৫২)-তে মিলাদ অনুষ্ঠানকে নব-উদ্ভাবিত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে তিনি কীভাবে এসব ফজিলত বয়ান করতে পারেন?

ওই মিথ্যুক যেমন মিথ্যা বলতে বুদ্ধি খরচ করেনি, তেমনি ইসতাম্বুলের মাকতাবাতুল হাকিকার লোকেরাও তাঁর গ্রন্থে ইবনু হাজার মাক্কি রচিত *আন-নিমাতুল কুবরার* নাম ব্যবহারের প্রতারণা সুন্দরভাবে করতে পারেনি। তাদের ভাবা উচিত ছিল, ইবনু হাজার মাক্কি একজন প্রসিদ্ধ আলিম এবং তাঁর *আন-নিমাতুল কুবরাও* একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, যার পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রয়েছে। সুতরাং সেসব পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এই প্রকাশিত গ্রন্থটি মিলিয়ে দেখলেই তাদের প্রতারণা ফাঁস হয়ে যাবে; বরং বিজ্ঞ আলিমগণ এই গ্রন্থ পড়ামাত্র বলে দেবেন, তা ইবনু হাজার মাক্কির রচনা হতেই পারে না। এটাকে তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছেমাত্র।

রাজারবাগীরা এসব ইতিহাস জানা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দিতে এসব জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনার ওপর *আন-নিমাতুল কুবরার* উদ্ধৃতি ব্যবহার করে থাকে। তাদের পক্ষ থেকে অন্যকে বিপথগামী করার এটি একটি নতুন দৃষ্টান্ত। অবশ্য এমন নজির তাদের আরও আছে। আর যদি অজ্ঞতাবশত তারা এরূপ করে থাকে—এ সম্ভাবনা অবশ্য খুবই ক্ষীণ—তাহলে বাস্তব বিষয়টি জানার পর এখন তাদের তাওবা করা এবং সাধারণ মানুষকে প্রকৃত বিষয় অবগত করার জন্য সংশোধনী প্রকাশ করা জরুরি।[২৭৪]

দাওয়াতে ইসলামির লিফলেট ও রাজারবাগীদের মুখপত্র *আল-বায়্যিনাতের* দলিলের অসারতার বিষয়টি আশা করি বুঝতে পেরেছেন—তারা কীভাবে জনসাধারণকে হাদিসের নামে ধোঁকা দিচ্ছে। বিদআত প্রমাণিত করতে গিয়ে কীভাবে সাহাবিগণের নামে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেছে! আল্লাহ আমাদের এমন নির্লজ্জ মিথ্যুকদের থেকে রক্ষা করুন।

ছয়. রাসুলের জন্মদিন কি ১২ রবিউল আউয়াল

বর্তমানে প্রচার করা হয়, রাসুল ﷺ ১২ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেছেন। আসলে কি নিশ্চিতভাবে এ কথা বলার সুযোগ আছে যে, তিনি ১২ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেছেন?

---

[২৭৪] *নির্বাচিত প্রবন্ধ* : ১৬৭-১৬৯।

প্রথমে মনে রাখতে হবে, রাসুল ﷺ কোন বারে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে কোন মাস ও তারিখে, সেটি নিয়ে মতবিরোধ আছে। এখানে আমি হাফিজ ইবনু কাসির রাহ.-এর বক্তব্য তুলে ধরছি। এর দ্বারা পাঠকের সামনে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন,

'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুল ﷺ সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। যারা বলেন রাসুল ﷺ ১৭ রবিউল আউয়াল শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের দাবি ভুল।

জুমহুরের মতে, তিনি রবিউল আউয়ালে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, ২ রবিউল আউয়াল। ইবনু আবদিল বার *আল-ইসতিআব* গ্রন্থে এ অভিমত উল্লেখ করেন এবং ওয়াকিদি এ বর্ণনাটি আবু মাশার নাজিহ ইবনু আবদির রাহমান আল মাদানি থেকেও উদ্ধৃত করেন।

কেউ বলেন, ৮ রবিউল আউয়াল। হুমায়দি এ বর্ণনাটি ইবনু হাজম থেকে বর্ণনা করেছেন; আর মালিক, উকাইল ও ইউনুস ইবনু ইয়াজিদ প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন জুহরি থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনু জুবায়ের ইবনু মুতয়িম থেকে। ইবনু আবদিল বার বলেন, ইতিহাসবিদগণ এ মতটি সঠিক বলেছেন। হাফিজ মুহাম্মাদ ইবনু মুসা আল খাওয়ারিজমি এ তারিখের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। হাফিজ আবুল খিতাব ইবনু দিহইয়াহ *আত-তানবির ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজির* গ্রন্থে এ মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন।

কেউ বলেন, ১০ রবিউল আউয়াল। এ মতটি ইবনু দিহইয়াহ তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু আসাকির এ মতটি আবু জাফর আল বাকির থেকে এবং মুজালিদ নামক বর্ণনাকারী শাবি থেকে বর্ণনা করেছেন।

কেউ বলেন, ১২ রবিউল আউয়াল। ইবনু ইসহাক এ মতটি উল্লেখ করেছেন। ইবনু আবি শায়বাহ তাঁর *মুসান্নাফে* এ মতটি আফফান থেকে, তিনি সায়িদ ইবনু মিনা থেকে, তিনি জাবির ও ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, "রাসুল ﷺ হস্তিবাহিনীর বছর, ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। এ দিনেই তাঁকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়, এ দিনেই তাঁর মিরাজ হয়েছিল, এ দিনেই তিনি হিজরত করেছেন এবং এ দিনেই তিনি ইনতিকাল করেন।" জুমহুর আলিমের কাছে এই মত বেশি প্রসিদ্ধ।

কেউ কেউ বলেন, তিনি রমজান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। কারও মতে, সফর মাসে।'[২৭৫]

---

[২৭৫] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া* : ১/১৯৭, ১৯৯, ইবনু কাসির।

ইবনু কাসিরের আলোচনা থেকে আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, ১২ রবিউল আউয়াল রাসুল ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলার কোনো সুযোগ নেই। জন্মতারিখ নিয়ে এত মতপার্থক্য থেকে সহজেই অনুমান হয় যে, রাসুলের জন্মতারিখ সাহাবিদের মধ্যে আলোচনার কোনো বিষয় ছিল না। এ জন্য মতবিরোধ হয়েছে। কারণ, আমরা দেখেছি সাহাবিগণ রাসুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করেছেন। এরপরও তাঁরা যেহেতু জন্মতারিখ নিয়ে আলোচনা করেননি, ১২ রবিউল আউয়াল কোনো ইদ পালন করেননি, এ জন্য এমন বানোয়াট ইদ থেকে আমরা সবাই বেঁচে থাকব। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

পঞ্চম অধ্যায়

রবিউস সানি : করণীয় ও বর্জনীয়

মুমিনের জন্য জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের বর্তমানকে কীভাবে অতীতের তুলনায় ফলপ্রসূ করা যায়, সে জন্য মুমিন নিরন্তর চেষ্টা করবে। তবে বিশেষ কোনো দিনকে যদি আল্লাহ বিশেষ কোনো মর্যাদায় ভূষিত করেন, সেটি তো মুমিনের জন্য সোনায় সোহাগা। নিজের সর্বোচ্চ ব্যয় করে সে ওই দিনটি কাজে লাগাবে। কোনো দিন বা মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো ফজিলত নেই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। মুমিন সর্বদা তার জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে চিন্তা করবে। প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ ও রাসুলের প্রদর্শিত পথে পরিচালনার চেষ্টা করবে।

আরবি বর্ষপঞ্জিকার চতুর্থ মাস রবিউস সানি। এ মাসের বিশেষ কোনো আমল কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। মুমিন ব্যক্তি অন্যান্য মাসের মতো এ মাসেও আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে। প্রতিদিনের যেসব আমল কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলো পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

এক. প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখার বিধান

এখানে সংগত মনে করে একটি আলোচনা যুক্ত করছি। রাসুল ﷺ প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোজা রাখতে উম্মতকে অনেক উৎসাহ জুগিয়েছেন। মাসে তিন দিন রোজা রাখা তেমন কঠিন না। আমরা ইচ্ছা করলেই প্রতিমাসে খুব সহজেই তিনটি রোজা রাখতে পারি।

১. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.

আমাকে রাসুল ﷺ তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত আমি সেগুলো ছাড়ব না—প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা, চাশতের সালাত পড়া এবং ঘুমের পূর্বে বিতরের সালাত পড়া।[২৭৬]

২. আবু দারদা রা. বর্ণনা করেন,

أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدعهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ.

আমাকে আমার প্রিয়তম বন্ধু তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আমি সেগুলো ছাড়ব না—প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা, চাশতের সালাত পড়া এবং ঘুমের পূর্বে বিতরের সালাত পড়া।[২৭৭]

৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেছেন,

صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه.

প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা পুরো বছর রোজা রাখার নামান্তর।[২৭৮]

কেউ যদি মাসে তিন দিন রোজা রাখে, আল্লাহ তাকে পূর্ণ এক বছর রোজা রাখার সাওয়াব দেবেন।

৪. আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.

এক রমজান থেকে আরেক রমজানের মধ্যবর্তী সময়ে প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা পুরো বছর রোজা রাখার নামান্তর।[২৭৯]

৫. কুররা ইবনু ইয়াস রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেছেন,

صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِفْطَارُهُ.

প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোজা রাখা পুরো বছর রোজা রাখার সমান।[২৮০]

৬. আবু জার রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ

---

[২৭৬] *সহিহ বুখারি*: ১১৭৮; *সহিহ মুসলিম*: ৭২১।

[২৭৭] *সহিহ মুসলিম*: ৭২২।

[২৭৮] *সহিহ বুখারি*: ১৯৭৮।

[২৭৯] *সহিহ মুসলিম*: ১১৬২; *সুনানু নাসায়ি*: ২৩৮৭।

[২৮০] *মুসনাদু আহমাদ*: ১৫৫৯৪; *সহিহু ইবনি হিব্বান*: ৩৬৫৩।

ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ.

যে প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তাকে পুরো বছর রোজা রাখার সাওয়াব দেবেন। আল্লাহ তখন এ কথাকে সত্যায়িত করে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন—'যে ব্যক্তি কোনো সাওয়াবের কাজ করবে, আল্লাহ তা ১০ গুণ বাড়িয়ে দেবেন।' সুতরাং মাসের ১ দিন ১০ দিনের সমান।[২৮১]

৭. আমর ইবনু সারাহবিল রাহ. জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন,

قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ، قَالُوا: فَثُلُثَيْهِ، قَالَ: أَكْثَرَ، قَالُوا: فَنِصْفَهُ، قَالَ: أَكْثَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'একব্যক্তি পুরো বছর রোজা রাখতে চায়...।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আমি কি তোমাদের এমন আমলের কথা বলব, যার দ্বারা তোমাদের অন্তরের বক্রতা দূর হবে? আর তা হলো প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখা।'[২৮২]

কেউ যদি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখে, তাহলে সে সহজেই সারা বছর রোজা রাখার সাওয়াব পেয়ে যাচ্ছে। রবিউস সানিসহ অন্যান্য মাসেও আমরা এ আমল করার চেষ্টা করব। যখন কেউ প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখবে, তখন চেষ্টা করবে যেন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রাখে।

৮. আবু জার রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

তোমাদের কেউ যদি প্রত্যেক মাসের তিনটি রোজা রাখে, তাহলে সে যেন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা রাখে।[২৮৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করার তাওফিক দিন।

দুই. ফাতিহায়ে ইয়াজদাহম : একটি ভুল প্রথা

সমাজে কিছু লোক এমন আছে, কুরআন-হাদিসে বর্ণিত সহিহ আমল নিয়ে তাদের

---

[২৮১] *সুনানুত তিরমিজি* : ৭৬২।

[২৮২] *সুনানু নাসায়ি* : ৭৬২।

[২৮৩] *সুনানুত তিরমিজি* : ৭৬১।

কোনো মাথাব্যথা নেই; রুসুম-রেওয়াজ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। আখেরি চাহার শোম্বা, ফাতিহায়ে ইয়াজদহমসহ বিভিন্ন দিবস পালন করে। রুসুম-রেওয়াজ আদায়কারী লোকেরা দীর্ঘদিন থেকে ফাতিহায়ে ইয়াজদহম নামে একটি রুসুম পালন করে। 'ইয়াজদহম' শব্দের অর্থ হলো ১১। ফাতিহায়ে ইয়াজদহম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রবিউস সানির ১১ তারিখে কৃত ফাতিহা বা ইসালে সাওয়াব মাহফিল। তারা বলে, রবিউস সানির ১১ তারিখে বড়পির আবদুল কাদির জিলানি রাহ. ইনতিকাল করেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে এ দিবস পালন করা হয়।

ইসলামে জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোনো প্রথা নেই। রাসুলের আগে পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল এসেছেন। আমাদের রাসুল ﷺ কারও জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেননি। এ ছাড়া রাসুলের জীবদ্দশায় তাঁর অনেক সাহাবি ইনতিকাল করেছেন। ইনতিকাল করেছিলেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা.। উহুদযুদ্ধে মর্মান্তিকভাবে শাহাদত বরণ করেছিলেন রাসুলের চাচা হামজা রা.; কিন্তু রাসুল ﷺ তাঁদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

রাসুল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন সাহাবিগণ। তাঁরা কখনো রাসুলের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেননি। কেননা, মৃত্যুবার্ষিকী যদি পালন করা শরিয়তসিদ্ধ হয়, তাহলে প্রত্যেক দিনই মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে হবে। কারণ, বছরে দিন মাত্র ৩৬৫টি। আর শুধু ইসলামের ইতিহাসে কত মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন। বছরের প্রতিটি দিন কোনো-না-কোনো মহামানব মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন উম্মত আর কোনো কাজ করার সুযোগ পাবে না। সারা জীবন শুধু মৃত্যুবার্ষিকী আর তাবাররুকের পেছনে ব্যয় করতে হবে।

এ ছাড়া যার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে, সেই বড়পির আবদুল কাদির জিলানি রাহ. জীবদ্দশায় কারও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছেন অথবা তাঁর কোনো শিষ্যকে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, এমনটি কোনো ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারবে না। এ জন্য রবিউস সানির ১১ তারিখে জাঁকজমকের সঙ্গে ফাতিহায়ে ইয়াজদহম পালন করা নিকৃষ্ট বিদআত। আপনার মন চাইলে একাকী কোনো ভালো কাজ করে বড়পিরকে ইসালে সাওয়াব করতে পারেন।

১. আবদুল কাদির জিলানির মৃত্যুতারিখ

এবার একটু ইতিহাসের পাতা ঘুরে আসব, আসলে বড়পির আবদুল কাদির জিলানি রাহ. কত তারিখে ইনতিকাল করেছেন? আমরা দেখি, বড়পির যে ১১

তারিখ ইনতিকাল করেছেন, এমন কোনো কথা ইতিহাসে নেই; বরং ৮, ৯ বা ১০ রবিউল আউয়াল ৫৬১ হিজরির কথা রয়েছে।

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন, আবদুল কাদির জিলানি ৯১ বছর বয়সে ৫৬১ হিজরিতে ইনতিকাল করেছেন।[২৮৪]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ ইমাম জাহাবি রাহ. বলেন, 'আবদুল কাদির জিলানি ৯০ বছর জীবিত ছিলেন। ৫৬১ হিজরির ১০ রবিউল আউয়াল তিনি ইনতিকাল করেছেন।'[২৮৫]

ইমাম জাহাবি রাহ. তাঁর ইতিহাসবিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ *তারিখুল ইসলামে* বলেন, 'আবদুল কাদির জিলানি ৫৬১ হিজরির রবিউল আউয়ালের ১০ তারিখে ইনতিকাল করেছেন।'[২৮৬]

আল্লামা আবদুর রাহিম লাজপুরি রাহ. বলেছেন, 'আবদুল কাদির জিলানির মৃত্যুতারিখ নিয়ে বেশ মতভিন্নতা রয়েছে। *তাফরিহুল খাতির ফি মানাকিবি আবদিল কাদির* গ্রন্থে প্রায় ৮টি মত উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ ১১ তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সঠিক হলো ১০ তারিখ।'[২৮৭]

মোটকথা, বড়পির আবদুল কাদির জিলানির মৃত্যু রবিউস সানির ১১ তারিখ নয়, ১০ তারিখ। এ জন্য ১১ তারিখ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা ও নিকৃষ্ট বিদআত। আল্লাহ তাআলা পুরো মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন।

২. ফাতিহায়ে ইয়াজদাহম নামে শিরকি কথাবার্তা

ফাতিহায়ে ইয়াজদাহাম এমনিতেই ভ্রষ্টতাপূর্ণ বিদআত। তা ছাড়া এ দিন বড়পির আবদুল কাদির জিলানির নামে যেসব কথাবার্তা বলা হয়, সেগুলো শিরক। যেমন, এ দিন তিনি কারামত আলোচনা করতে গিয়ে খুব প্রচার করা হয়, আবদুল কাদির জিলানি রাহ. মৃতকে জীবিত করতে পারতেন! অথচ এটি একটি স্পষ্ট শিরকি কথা। কারণ, জীবন-মরণের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাউকে জীবিত ও মৃত করার ক্ষমতা নেই। কেউ যদি এটা বিশ্বাস

---

[২৮৪] *শায়খ আবদুল কাদির জিলানি* : ২৬৫; *নাশআতুল কাদিরিয়া* : ১৩৩—*আবদুল কাদির জিলানি*, ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি সূত্রে।

[২৮৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৫/১৮৯।

[২৮৬] *তারিখুল ইসলাম* : ৮/৪৪০।

[২৮৭] *ফাতাওয়া রাহিমিয়া* : ২/৭৬, ৭৭।

করে যে, আবদুল কাদির জিলানির মৃতকে জীবিত করার শক্তি ছিল, তাহলে তার ইমান থাকবে না।

এ ছাড়া তাঁর নামে অনেক অহেতুক বানোয়াট কাহিনি খুব জোরেশোরে প্রচার করা হয়। যেমন : আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে বড়পিরের দোজখ দেখতে যাওয়া, মিরাজের রাতে রাসুল ﷺ বুরাকে উঠতে পারছিলেন না, বড়পির পাথর হয়ে এসেছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁর কাঁধে পা দিয়ে বুরাকে আরোহণ করেন। মিরাজে যাওয়ার সময় বড়পির আকাশে রাসুলের বুরাক আটকিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ইত্যাদি। এসব কাহিনির পরতে পরতে রয়েছে ইমানবিধ্বংসী কথাবার্তা। ফাতিহায়ে ইয়াজদাহম এমনিতেই বিদআত; উপরন্তু বর্তমানে তা মানুষের ইমান হন্তারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে হিফাজত করুন।[২৮৮]

[২৮৮] বড়পির শায়খ আবদুল কাদির জিলানি রাহ.-এর জীবনী বিশুদ্ধ সূত্রে জানতে কালান্তর প্রকাশিত ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির *আবদুল কাদির জিলানি* গ্রন্থটি পড়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রজব : করণীয় ও বর্জনীয়

আরবি বর্ষপঞ্জিকার সপ্তম মাস রজব। সম্মানিত মাসের একটি। রাসুল ﷺ চার মাসকে সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে একটি রজব। আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

> الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.
>
> আসমান, জমিন সৃষ্টিলগ্ন থেকে সময় তার মতো করে চলছে। বছর ১২ মাসে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত মাস। তিনটি ধারাবাহিকভাবে। জুলকাদাহ, জিলহজ ও মুহাররাম। চতুর্থটি রজব।[২৮৯]

এ হাদিসে রজব মাসের সঙ্গে 'মুজার' গোত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, তারা রজব মাসকে বিশেষভাবে সম্মান করত।

এক. সম্মানিত মাসের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ

সহিহ হাদিসের আলোকে আমরা জেনেছি সম্মানিত মাস চারটি। এখন প্রশ্ন হলো, চার মাসের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'সম্মানিত মাসের কোনটি সবচেয়ে সম্মানিত, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন রজব। শাফিয়ি মাজহাবের কিছু আলিম এমনটি বলেছেন। ইমাম নববি ও অন্যরা এ মতকে দুর্বল বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন মুহাররাম। হাসান বসরি এমনটি বলেছেন এবং নববি রাহ. এ মত প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন জিলহজ। সায়িদ ইবনু জুবায়ের রা. ও অন্যদের থেকে এমনটি বর্ণিত হয়েছে। এটিই বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী।'[২৯০]

---

[২৮৯] *সহিহ বুখারি* : ৩১৯৭।

[২৯০] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ১৫৮।

দুই. সম্মানিত মাসে যুদ্ধবিগ্রহের বিধান

কেউ কেউ বলেন, সম্মানিত মাসে এখনো যুদ্ধবিগ্রহ হারাম। তারা তাদের মতের পক্ষে *মুসনাদু আহমাদের* একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। জাবির রা. বর্ণনা করেন,

> لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ.
>
> রাসুল ﷺ সম্মানিত মাসে কখনো যুদ্ধবিগ্রহ করতেন না। যুদ্ধের সময় সম্মানিত মাস উপস্থিত হলে মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।[২৯১]

তবে উম্মাহর অধিকাংশ আলিমের মতে, সম্মানিত মাসে যুদ্ধবিগ্রহের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কেননা, সাহাবিগণ সেসব মাসে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'জুমহুর আলিম তাঁদের মতের পক্ষে দলিল পেশ করেন—রাসুলের ইনতিকালের পরে সাহাবিগণ এসব মাসে জিহাদ করেছেন এবং বিভিন্ন এলাকা বিজয় করেছেন। তাঁদের কারও থেকে এমনটি বর্ণিত হয়নি যে, তাঁরা এসব মাসে যুদ্ধ থেকে বিরত থেকেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, যুদ্ধ নিষিদ্ধের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।'[২৯২]

মোটকথা, রজব সম্মানিত মাসের একটি। এ মাসের রয়েছে বিশেষ কিছু হুকুম। সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তিন. 'আতিরা' তথা রজবে জবাইকৃত বিশেষ প্রাণী

আমরা যেভাবে জিলহজে আল্লাহর নির্দেশে কুরবানি করি, জাহিলি যুগে লোকেরা রজবে প্রাণী কুরবানি করত। তাদের ভাষায় এর নাম ছিল 'আতিরা'। রজবের সম্মানার্থে তারা সে পশু জবাই করত। প্রশ্ন হলো, 'আতিরা'র হুকুম ইসলামে বহাল রয়েছে, নাকি রহিত হয়ে গেছে?

কোনো কোনো আলিম বলেন, 'আতিরা'র হুকুম রহিত হয়ে যায়নি; এখনো মুসতাহাব হিসেবে রয়ে গেছে। কেউ চাইলে রজবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু জবাই করতে পারবে। দলিল হিসেবে তাঁরা রাসুলের কয়েকটি হাদিস পেশ করেন।

---

[২৯১] *মুসনাদু আহমাদ*: ১৪৫৮৩।

[২৯২] *লাতায়িফুল মাআরিফ*: ১৬২।

১. নাবিশা রা. বর্ণনা করেন,

ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: اذْبَحُوا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا.

রাসুল ﷺ-কে বলা হলো, আমরা জাহিলি যুগে রজবে পশু জবাই করতাম। রাসুল ﷺ বললেন, যে মাসেই হোক, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জবাই করো এবং মানুষকে আহার করাও।[২৯৩]

এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, 'আতিরা'র হুকুম একেবারে রহিত হয়ে যায়নি। কেননা, রাসুল ﷺ জবাই করতে নিষেধ করেননি। এ জন্য হুকুমটি এখনো মুসতাহাব পর্যায়ের। কেউ চাইলে আদায় করতে পারে।

২. আবু রাজিন রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَب ذَبَائِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مِنْهَا مَنْ جَاءَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا بَأْس بِذَلِكَ فَقَالَ وَكِيعٌ لَا أَدَعُهَا أَبَدًا.

তাঁরা রাসুল ﷺ-কে বললেন, 'আমরা রজবে প্রাণী জবাই করতাম। নিজেরা খেতাম ও অন্যকেও খাওয়াতাম।' রাসুল ﷺ বললেন, 'এখন জবাই করতে সমস্যা নেই।' হাদিসের বর্ণনাকারী ওয়াকি বলেন, আমি কখনো এ আমল ছাড়ব না।[২৯৪]

এর পক্ষে নুসুসও রয়েছে। এ জন্য ইবনু সিরিন, বসরাবাসী ও শেষ যুগের কিছু আলিম বলেন, 'আতিরা'র হুকুম রহিত হয়ে যায়নি। এখনো মুসতাহাব পর্যায়ে রয়েছে। কেউ চাইলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য রজবে পশু কুরবানি করতে পারে। সে পশুর গোশত নিজে খাবে এবং অন্যকে খাওয়াবে।

তবে উম্মতের অধিকাংশ আলিম বলেন, 'আতিরা'র হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তাঁরা বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'আতিরা'র বিধান ছিল ঠিকই; কিন্তু কুরবানির বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর 'আতিরা'র বিধান রহিত হয়ে গেছে। তাঁরা আবু হুরায়রার সূত্রে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। রাসুল ﷺ বলেন,

لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَب.

---

[২৯৩] *সুনানু নাসায়ি* : ৪২২৮।

[২৯৪] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৪৭৯১; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬২০২।

> ‘ফারা’ ও ‘আতিরা’র বিধান ইসলামে নেই। বর্ণনাকারী বলেন, ‘ফারা’ হলো, উটের প্রথম বাচ্চা, যা তারা তাদের ভ্রান্ত প্রভুদের উদ্দেশে জবাই করত। আর ‘আতিরা’ হলো, যে প্রাণীকে তারা রজবে জবাই করত।[২৯৫]

অধিকাংশ আলিম বলেন, এ হাদিস দ্বারা ‘আতিরা’র হুকুম রহিত হয়ে গেছে। মুবারাক ইবনু ফুজালা হাসান থেকে বর্ণনা করেন; ‘ইসলামে কোনো “আতিরা”র বিধান নেই। এর বিধান ছিল জাহিলি যুগে। তারা রজবে রোজা রাখত এবং পশু জবাই করত।’[২৯৬]

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, রজবে পশু জবাইয়ের কারণে তা ইদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায়; অথচ ইসলামের ইদ মাত্র দুটি। ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রজবকে ইদ হিসেবে গ্রহণ করতে অপছন্দ করতেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আতা বলেন, ‘ইবনু আব্বাস রা. মানুষদের পুরো রজব মাস রোজা রাখতে নিষেধ করতেন, যাতে মানুষ এটাকে ইদ বানিয়ে না নেয়।’[২৯৭] এ ছাড়া হানাফি মাজহাবের ফিকহ ও ফাতওয়ার সব গ্রন্থে ‘আতিরা’ মানসুখ তথা রহিত হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।

মোটকথা, রজব মাসে বিশেষ কোনো প্রাণী জবাইয়ের হুকুম জাহিলি যুগে ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও রাসুল ﷺ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু জবাইয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন; কিন্তু কুরবানির বিধান আসার পর ‘আতিরা’র বিধান রহিত হয়ে যায়।

চার. সালাতুর রাগায়িব : একটি ভিত্তিহীন আমল

বর্তমানে প্রথাপালনে যারা আগ্রহী, তারা সালাতুর রাগায়িব নামে রজবের প্রথম বৃহস্পতিবারে মাগরিবের পর একটি বিশেষ সালাত পড়েন। সে সালাতের বিশেষ ফজিলত কিছু বক্তার মুখে মুখে এবং অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে রয়েছে। এখানে *বারো চান্দের ফজিলত* থেকে প্রথমে সে সালাতের ফজিলত উল্লেখ করছি। পরে সেগুলোর ওপর পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ। *বার চান্দের ফজিলত* গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> *মশহুর মাশায়িখ রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রাতকে ‘লাইলাতুর রাগায়িব’ বলে অভিহিত করেছেন। এই রাতে মাগরিবের সালাতের পরে দুই*

---

[২৯৫] *সহিহ বুখারি* : ৫৪৭৩।

[২৯৬] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ২৬৫।

[২৯৭] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৭৮৫৪।

রাকআতের নিয়তে মোট ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে। এই সালাতের প্রতিরাকআতে সুরা ফাতিহার পরে সুরা কদর তিনবার এবং সুরা ইখলাস ১০ বার পড়বে। সালাত শেষে নিম্নের দুরুদ শরিফ ৭০ বার পড়বে—

اللّٰهُمَّ صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.

তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যাবে এবং নিচের দুআ ৭০ বার পড়বে—

سبوح قدوس رب الملائكة والروح.

তারপর সিজদা থেকে উঠে বসে নিম্নের দুআ ৭০ বার পড়বে—

رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأعظم.

তারপর পুনরায় সিজদায় গিয়ে দ্বিতীয় দুআটি ৭০ বার পড়বে। সিজদা থেকে উঠে বসে পুনরায় তৃতীয় দুআটি ৭০ বার পড়বে। এখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলে যা-ই প্রার্থনা করবে, তিনি তা-ই কবুল করবেন।[২৯৮]

এই গ্রন্থে বর্ণনার যে ভাবার্থ উল্লেখ করা হয়েছে, সেটার আরবি ইবারতে এমন কিছু ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে, যা *বারো চান্দের ফযিলতে* উল্লেখ করা হয়নি। বর্ণনাটির শেষে বলা হয়েছে,

যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহর যে বান্দা এ সালাত পড়বে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা অথবা বালুকণা পরিমাণ হোক। অথবা পাহাড়ের ওজন পরিমাণ হোক। বৃষ্টির ফোঁটা পরিমাণ হোক। গাছের পাতা পরিমাণ হোক। সে কিয়ামতের দিন তার পরিবারের ৭০০ জনকে সুপারিশ করবে। কবরের প্রথম দিন এ সালাতের সাওয়াব তার কাছে আলোকোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে এসে মধুর ভাষায় বলবে, 'হে আমার বন্ধু, সুসংবাদ গ্রহণ করো। তুমি সব ধরনের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছ।' ওই ব্যক্তি বলবে, 'তুমি কে? আল্লাহর শপথ, আমি তোমার মতো সুন্দর চেহারার কাউকে দেখিনি। তোমার চেয়ে মিষ্ট কারও কথা শুনিনি। তোমার থেকে যে ঘ্রাণ আসছে, তার চেয়ে উত্তম ঘ্রাণ আর কখনো আমার অনুভূত হয়নি।' সে বলবে, 'হে আমার বন্ধু, আমি হলাম তোমার সে রাতের সালাতের সাওয়াব, যে সালাত তুমি অমুক মাসের এত তারিখে পড়েছিলে। আজ আমি তোমার সঙ্গ দিতে তোমার

[২৯৮] *বারো চান্দের ফযিলত* : ২০-২১।

কাছে এসেছি। যখন কিয়ামতের জন্য শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, আমি কিয়ামতের ময়দানে তোমার মাথায় ছায়া হয়ে থাকব। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। প্রভুর কল্যাণে তুমি সর্বদা বিভূষিত হবে।'[২৯৯]

এ বর্ণনাটি যদি সঠিক হয়, তাহলে এক সালাত দ্বারাই তো কেল্লা ফতেহ! কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করলে দেখি, এটি জাল ও বানোয়াট বর্ণনা। দুষ্ট লোক বানিয়েছে। রাসুলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্য লাইলাতুর রাগায়িবের সালাত পরিষ্কার বিদআত। বর্ণনাটি সম্পর্কে বিদগ্ধ মুহাদ্দিসগণ কী বলেছেন, আমরা এখন তা উল্লেখ করব।

ইমাম ইরাকি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি রাজিন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে এটি জাল।'[৩০০]

ইমাম ইবনুল জাওজি বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেন, 'বর্ণনাটি রাসুলের নামে জালকৃত। এর একজন বর্ণনাকারী ইবনু জাহজাম, সে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। কেউ কেউ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আমার শায়খ হাফিজ আবদুল ওয়াহহাবকে বলতে শুনেছি, এ বর্ণনার সকল বর্ণনাকারী মাজহুল তথা অজ্ঞাত। আমি সকল গ্রন্থে খুঁজেছি; কিন্তু তাদের জীবনবৃত্তান্ত পাইনি।'[৩০১]

ইবনু জাহজাম লাইতুর রাগায়িবের এ বর্ণনাটি তৈরি করে রাসুলের নামে চালিয়ে দিয়েছে। ইমাম জাহাবির বক্তব্য থেকেও এমনটা বোঝা যায়। তিনি তার সম্পর্কে বলেন, 'ইবনু জাহজাম হাদিস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

ইবনু খাইরুন বলেছেন, 'তার ব্যাপারে অনেকেই নেতিবাচক কথা বলেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'কেউ কেউ তাকে মিথ্যুক বলেছেন।'

কেউ কেউ বলেন, তাকে 'সালাতুর রাগায়িবে'র হাদিস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন অনেকেই।'[৩০২]

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'সালাতুর রাগায়িবের ফজিলত-সংক্রান্ত সব বর্ণনা মিথ্যা ও বাতিল। এ সালাত উম্মতের অধিকাংশ আলিমের মতে বিদআত। মুতাআখখিরিন তথা পরবর্তীদের থেকে হাফিজ আবু ইসমাইল আনসারি, আবু

---

[২৯৯] *আল-আসারুল মারফুআ* : ৬৫, লখনবি।

[৩০০] প্রাগুক্ত : ৪৯, লখনবি।

[৩০১] *কিতাবুল মাওজুআত* : ২/১০৯।

[৩০২] *মিজানুল ইতিদাল* : ৩/১৪২, জীবনী নং-৫৮৭৯।

বকর ইবনুস সামআনি, আবুল ফজল ইবনু নাসির, ইবনুল জাওজিসহ অনেকে এমনটা উল্লেখ করেছেন। তবে পূর্ববর্তী কেউ এ সম্পর্কে কিছু বলেননি। কেননা, এটা আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁদের পরে। এ সালাত শুরু হয়েছে ৪০০ বছর পরে। এ জন্য পূর্ববর্তীগণ এ সালাত সম্পর্কে জানেননি এবং কথাও বলেননি।'[৩০৩]

ইমাম নববি রাহ. বলেন, '"সালাতুর রাগায়িব" হলো রজবের প্রথম জুমুআর রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ পদ্ধতির সালাত। এটা সুন্নাত নয়; বরং নিন্দিত ও ঘৃণিত বিদআত। আবু তালিব মাক্কির *কুতুল কুলুব* ও গাজালি রাহ.-এর *ইহইয়ায়ু উলুমিদ দীনে* উল্লেখ করার কারণে তুমি ধোঁকায় পড়ো না। উল্লিখিত হাদিস দ্বারাও ধোঁকায় পড়ো না। কেননা, এটা বাতিল।'[৩০৪]

ইমাম ইবনুস সালাহ রাহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সালাতুর রাগায়িবের ব্যাপারে ফকিহগণ কী বলেন? এটা বিদআত কি না? এ বিষয়ে কি কোনো হাদিস রয়েছে? তিনি বলেন, এ-সংক্রান্ত হাদিসটি জাল। আর এ সালাত বিদআত। এটা আবিষ্কৃত হয়েছে ৪০০ বছর পরে, শামে। তারপর বিভিন্ন শহরে বিস্তৃত হয়েছে। তবে এমনিতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে একাকী সালাত পড়তে সমস্যা নেই। আর সাধারণভাবে নফল সালাত জামাআতে পড়তে সমস্যা নেই। এ সালাতকে দীনের 'শিআর' তথা নিদর্শন বানানো নিকৃষ্ট বিদআত।'[৩০৫]

ইবনু আমির আলহাজ সানআনি রাহ. বলেন, 'রজবের বিদআতের মধ্য একটি হলো, রজবের প্রথম বৃহস্পতিবার রাতে জামে মসজিদে একত্রিত হয়ে সালাত পড়া। যেটাকে বলা হয় সালাতুর রাগায়িব। মানুষ এ বিদআত এমনভাবে করছে, যেন এটি একটি শরিয়তসিদ্ধ বিষয়। এ ছাড়া বিদআতের সঙ্গে আরও অনেক হারাম কাজ যুক্ত হয়—সেটা হলো পুরুষ ও মহিলা রাতে একত্রিত হওয়া। অতিরিক্ত আলোকসজ্জা। কেননা, অতিরিক্ত আলোকসজ্জার কারণে সম্পদের অপচয় হয়। বিশেষত বাতিগুলো যদি ওয়াকফের সম্পদ দ্বারা জ্বালানো হয়, তাহলে এটা তো মারাত্মক ধৃষ্টতা। ওয়াকফকারী যদি বিষয়টি উল্লেখও করে, তারপরও সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না।'[৩০৬]

আল্লামা আবদুল হাই লখনবি রাহ. বর্ণনাটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর লেখেন, 'সালাতুর রাগায়িবের হাদিস ইমাম গাজালির *গুনয়াহ* ও অন্যান্য সুফির গ্রন্থে

---

[৩০৩] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ১৬৫।

[৩০৪] *আল-আসারুল মারফুআ* : ৫৫।

[৩০৫] প্রাগুক্ত : ৫৬।

[৩০৬] *আল-মাদখাল* : ৫৬।

উল্লেখের কোনো মূল্য নেই। কেননা, হাদিসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হলো বর্ণনাকারী নিয়ে পর্যালোচনা। কোন গ্রন্থে কে এনেছে এটা বিষয় নয়। সালাতুর রাগায়িবের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ অনেক বেশি বলেছেন। কেননা, তারা যখন দেখেছেন, এ সালাত আম-খাস নির্বিশেষে সবার মধ্যে প্রচার হচ্ছে এবং তারা ধারণা করছে যে, এটা রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত। যদি মুহাদ্দিসগণ এমনটা না করতেন, তাহলে সুফিগণ তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করার দ্বারা অনেক মানুষ ধোঁকায় পড়ে যেত।'[৩০৭]

মোটকথা, রজবের প্রথম বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ কোনো সালাত রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ থেকে প্রমাণিত নয়। রাসুলের যুগের ৪০০ বছর পর এ সালাত প্রবর্তন হয়। এ জন্য সে রাতে বিশেষ পদ্ধতির যে সালাত আদায় করা হয় তা বিদআত; আর সেই সালাতের ফজিলত বোঝানোর জন্য রাসুলের নামে যে হাদিস চালানো হয়, সেটা জাল ও বানোয়াট। কারণ, রাসুল ﷺ এ ধরনের কোনো সালাত আদায় করলে সাহাবিগণ অবশ্যই তা আদায় করতেন এবং অনেক সাহাবি থেকে সে আমল বর্ণিত হতো।

পাঁচ. শবে ইসতিফতা : একটি বিদআতের পর্যালোচনা

রুসুম-রেওয়াজে যারা বিশ্বাসী, তারা রজব মাসের এক রাতে খুব ঘটা করে আরেকটি সালাত আদায় করেন, যে রাতের আমলের নাম দিয়েছেন 'শবে ইসতিফতা'। প্রথমে *বারো চান্দের ফজিলত* থেকে শবে ইসতিফতাহর ফজিলত জেনে আসি। সেখানে লেখা হয়েছে,

> *রজবের ১৫ তারিখের রাতকে অলি ও শায়েখগণ 'শবে ইসতিফতা' বলে অভিহিত করেছেন। এই মহান রাতের নফল ইবাদতের কারণে অনেক মুমিন বান্দার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় এবং ভাগ্য খুলে যায়। এই রাতের নফল ইবাদতের কিছু নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :*
>
> ১. *রজবের ১৫ তারিখ রাতে অজু-গোসল করে পাক-পবিত্র পোশাক পরিধান করে দুই দুই রাকআতের নিয়তে মোট ৮ রাকআত সালাত আদায় করবে। তার প্রত্যেক রাকআতের সুরা ফাতিহার পরে তিনবার করে সুরা ইখলাস পাঠ করবে। এই নামাজি ব্যক্তি অসংখ্য সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং দুনিয়ার জীবনে সৌভাগ্যশীল ও মানসম্মানের অধিকারী হবে।*

---

[৩০৭] *আল-আসারুল মারফুআ* : ৬২।

২. *বর্ণিত আছে, এই রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের পরে দুই দুই রাকআতের নিয়তে মোট ৫০ রাকআত সালাত আদায় করবে। এর প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহার পরে তিনবার করে সুরা ইখলাস পাঠ করবে অথবা অন্য যেকোনো সুরা মিলিয়ে পড়বে। এই সালাতের বরকত ও ফজিলত অত্যধিক। যথা : এই নামাজি সালাত শেষে আল্লাহর কাছে যা-ই প্রার্থনা করবে, তিনি তা-ই কবুল করবেন। এই নামাজির সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এই নামাজির কবর অত্যধিক উজ্জ্বল হবে। এই নামাজি কিয়ামতের ময়দানে মুত্তাকি, নেকবখত ও শহিদানের সঙ্গে শামিল হবে এবং নবিগণের সঙ্গে জান্নাতে দাখিল হবে।*

৩. *হাদিসে বর্ণিত আছে; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রজবের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট সময় (তারিখ) রয়েছে। সেই তারিখে নফল সালাত পড়লে তার তাকদিরে ১০০ বছরের নফল সালাতের সাওয়াব লেখা হবে। তবে বুজুর্গ ব্যক্তিগণ ধারণা করেছেন, এই সৌভাগ্যের রাতটি হচ্ছে ১৫ রজবের রাত যা 'শবে ইসতিফতা' নামে আখ্যায়িত।*

৪. *বর্ণিত আছে, ১৫ রজবের রাতে দুই দুই রাকআতের নিয়তে মোট ৭০ রাকআত নফল সালাত আদায় করবে। এর প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহার পরে তিনবার সুরা ইখলাস পাঠ করবে। এই নামাজির আমলনামায় দুনিয়ার বৃক্ষসমূহের সংখ্যানুযায়ী সাওয়াব লেখা হবে।*[৩০৮]

প্রথমে একটি কথা বলে রাখি, রজবের কোনো বিশেষ সালাত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সবগুলো মানুষের বানানো। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'রজবে কোনো বিশেষ সালাত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।'[৩০৯]

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহ.-এর কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, রজবে কোনো বিশেষ সালাত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং 'সালাতুল ইসতিফতা' নামে কোনো সালাত নেই। রাসুলের ইনতিকালের বহু পরে মানুষ এগুলো আবিষ্কার করেছে। তাই বিশেষ পদ্ধতির এ সালাত বিদআত ও মানুষের বানানো।

আল্লামা আবদুল হাই লখনবি রাহ.-ও এ সালাত নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন,

---

৩০৮ *বারো চান্দের ফযিলত* : ২১-২২।

৩০৯ *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ১৬৫।

১২৮৪ হিজরিতে এক সফরে আমি রজবের ১৫ তারিখে হায়দারাবাদে প্রবেশ করি। তখন আমার সঙ্গে আমার মা-বাবাও ছিলেন। সে জায়গার কিছু শায়খের সাক্ষাৎ হয়। তারা বললেন, "আপনি কত উত্তম দিনে এসেছেন।" আমি মনে মনে বলি, হয়তো এ দিনের কোনো ফজিলত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এরপর আমি ব্যাপক অনুসন্ধান করেছি; কিন্তু এর কোনো ভিত্তি পাইনি। এরপর শায়খ দেহলবি রাহ.-এর *মা সাবাতা বিস-সুন্নাহ* গ্রন্থে এ সম্পর্কে তাঁর লিখিত কথাগুলো পড়লাম। তাতে তিনি লেখেন, "আমরা হাদিসের গ্রন্থে রজবের ১৫ তারিখের ইবাদতের কথা পাইনি, আবার নিষেধও পাইনি। যে দিন মানুষ সালাত, রোজাসহ অন্যান্য ইবাদত করে এবং সে দিনকে ইসতিফতা ও মারইয়ামদুজা বলে নামকরণ করেছে।"'

আবদুল হাই লখনবি রাহ. বলেন, 'এরপর আমি জানতে পারি, সালাতুল ইসতিফতা সুফিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তবে এর কোনো ভিত্তি নেই।'[৩১০]

রজবের বিশেষ সালাতের আলোচনা করতে গিয়ে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'রজবের বিশেষ কোনো সালাত দলিলযোগ্য সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আমার আগে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে বলেছেন হাফিজ ইমাম ইসমাইল হারাওয়ি। তাঁর থেকে সহিহ সনদে প্রমাণিত। এভাবে অনেকের থেকে সহিহ সনদে বিষয়টি প্রমাণিত।'[৩১১]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ হজরাতুল উসতাজ শায়খ আবদুল মালেক এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'এভাবে ১৫ রজবের রাত সম্পর্কিত একটি জাল বর্ণনা—"এ রাতে চার রাকআত সালাত বিশেষ নিয়মে আদায় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দুরুদ, তাসবি-তাহমিদ ও তাহলিল আদায় করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে ১ হাজার ফেরেশতা পাঠানো হয়। যারা ওই ব্যক্তির জন্য সাওয়াব লিখতে থাকেন এবং ওই রাত পর্যন্ত যত গুনাহ সে করেছে, সব ক্ষমা করে দেন। অবশেষে তার কাঁধে হাত রেখে একজন ফেরেশতা বলেন, তুমি নতুন করে আমল শুরু করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমার পূর্ববর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন..."[৩১২]—গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নতুন করে আমল শুরু করার এই বানোয়াট বর্ণনার কারণেই সম্ভবত এই রাতের নাম রাখা হয়েছে 'শবে ইসতিফতা।" উল্লিখিত বর্ণনা ছাড়াও এ দু-রাকআত সম্পর্কে এমন প্রচুর

---

[৩১০] *আল-আসারুল মারফুআ* : ৬৩।

[৩১১] *তাবয়িনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফি শাহরি রাজাব* : ১।

[৩১২] *মাসিক আল কাউসার* : ডিসেম্বর-২০১২।

ভিত্তিহীন বর্ণনা রয়েছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, শরিয়তে "লাইলাতুর রাগয়িব" ও "শবে ইসতিফতা" নামে বিশেষ কোনো রাতের অস্তিত্ব নেই।

নামে-বেনামে রজবে এ বিশেষ রাত উদ্‌যাপন নব-উদ্ভাবিত বিদআত; কুরআন-সুন্নাহে যার কোনো প্রমাণ নেই। তেমনিভাবে উল্লিখিত রাত বা দিনগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট সালাত-রোজা বা অন্য কোনো বিশেষ আমলের কথাও ইসলামে নেই। এ সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও জাল।

অতএব "লাইলাতুর রাগায়িব" হোক কিংবা "শবে ইসতিফতা" এগুলো উদ্‌যাপন কিংবা কল্পিত ও ভিত্তিহীন বর্ণনার ওপর নির্ভর করে বিশেষ ধরনের আমল করা সবই পরিত্যাজ্য। এগুলো থেকে দূরে থাকাই একজন মুমিনের কর্তব্য।'[৩১৩]

আশা করি, এ আলোচনার পর রজবের ১৫ তারিখের রাতের বিশেষ সালাতের বাস্তবতা পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। এ জন্য এসব রুসুম-সর্বস্ব সালাত থেকে মুসলামনদের বেঁচে থাকা জরুরি। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

ছয়. রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা আমাদের সমাজে প্রচলিত। বিশেষত কিছু বাজারি বক্তার কারণে এ ধরনের কথা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। এ ধরনের একটি বর্ণনা হলো,

> إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ: رَجَب، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَب يَوْمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ النَّهْرِ.
>
> রাসুল ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতে একটি নদী রয়েছে, যার নাম রজব। যে রজবে একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সে নদী থেকে পানি পান করাবেন।'[৩১৪]

হাদিসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কঠোর আপত্তি করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওজি রাহ. বলেন, 'এটি সহিহ নয়। হাদিসের সনদে অনেক মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছে। আমরা জানি না তারা কারা।'[৩১৫]

হাদিসের একজন বর্ণনাকারী মানসুর ইবনু ইয়াজিদ। তার সম্পর্কে ইমাম জাহাবি রাহ.

---

[৩১৩] *প্রচলিত ভুল*: ১৭৯-১৮০।

[৩১৪] *শুআবুল ইমান*: ৩৮০০, বায়হাকি।

[৩১৫] *আল-ইলালুল মুতানাহিয়া*: ২/৬৫, ইবনুল জাওজি।

লেখেন, 'মানসুর ইবনু ইয়াজিদ, তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু মুগিরা রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মাজহুল। আর হাদিসটি বাতিল।'[৩১৬]

জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. যদিও হাদিসকে জয়িফ বলেছেন, তবে ইমাম মুনাবি তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, 'ইবনুল জাওজি বলেছেন, হাদিসটি সহিহ নয়। বর্ণনাকারী অনেকেই মাজহুল। অনেককে চেনা যায় না। ইমাম জাহাবি *মিজানে* বলেছেন, বর্ণনাটি বাতিল।'[৩১৭]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. হাদিসটি জয়িফ বলেছেন। তিনি তাঁর লিখিত গ্রন্থ *তাবয়িনুল আজাবে* লেখেন, 'রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত হাদিসগুলো দুই প্রকারের। কিছু জয়িফ ও কিছু জাল। আমি জয়িফগুলো উল্লেখ করে জাল বর্ণনাগুলোর দিকে ইশারা করব।' এরপর জয়িফ হাদিসের তালিকায় প্রথমে পূর্বোক্ত হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি ইমাম ইবনুল জাওজি ও ইমাম জাহাবির কথার ওপর লম্বা পর্যালোচনার পর বলেন, 'সমষ্টিগতভাবে হাদিসের সনদ জয়িফ। তবে জাল বলার সাহস করা যাবে না।'[৩১৮]

বর্ণনাটিতে যেহেতু মুহাদ্দিসগণের কঠোর আপত্তি রয়েছে, অনেকে বাতিলও বলেছেন, এ জন্য রজবের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে এমন বর্ণনা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

সাত. রজবের বিশেষ দুআ ও ফজিল-সংক্রান্ত দুটি বর্ণনা

১. রজবের দুআ

রজব মাস এলেই আমরা একটি দুআ পড়ি। মসজিদে মসজিদে আলোচনা হয় যে, রাসুল ﷺ রজব থেকে রমজানের প্রস্তুতি শুরু করতেন এবং এ দুআটি পড়তেন—

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

হে আল্লাহ, আপনি রজব ও শাবানে বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজানে পৌঁছিয়ে দিন।

হাদিসটি আনাস রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

كَانَ إِذَا دَخَلَ رَجَب قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

---

[৩১৬] *মিজানুল ইতিদাল* : ৭/১৫৭।

[৩১৭] *ফাইজুল কাদির* : ২/৬০৬।

[৩১৮] *তাবয়িনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফি শারহি রাজাব* : ৩-৫, ইবনু হাজার।

যখন রজব মাস প্রবেশ করত, তখন রাসুল ﷺ এই দুআটি পড়তেন, 'হে আল্লাহ, আপনি রজব ও শাবানে বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজানে পৌঁছিয়ে দিন।[৩১৯]

ইমাম তাবরানি হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, 'রাসুল ﷺ থেকে এই সনদ ছাড়া অন্য কোনো সনদে বর্ণিত হয়নি। জায়িদা ইবনু আবির রাক্কাদ ছাড়া তাঁর শায়খ থেকে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।'[৩২০]

ইমাম হায়সামি রাহ. হাদিস সম্পর্কে বলেন, 'হাদিসটি ইমাম বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী জায়িদা ইবনু আবি রাক্কাদ। ইমাম বুখারি তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন। এ ছাড়া অনেকে তাকে 'মাজহুল' বলেছেন।'[৩২১] হায়সামি রাহ. অন্যত্র বলেন, 'বর্ণনাটি ইমাম তাবরানি ও বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী জায়িদা ইবনু আবি রাক্কাদ। তার ব্যাপারে নেতিবাচক কথা রয়েছে। তবে কেউ কেউ তাকে সিকাহ বলেছেন।'[৩২২]

ইমাম বায়হাকি রাহ. *ফাজায়িলুল আওকাতে* হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, 'হাদিসটি জিয়াদ থেকে জায়িদা এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদিসটি শক্তিশালী নয়।'[৩২৩]

হাদিসের বর্ণনাকারী জায়িদার ব্যাপারে অনেক ইমাম নেতিবাচক বক্তব্য দিয়েছেন। ইমাম আবু হাতিম বলেন, 'তার বর্ণিত হাদিস আপত্তিকর।' ইমাম বুখারি রাহ. বলেন, 'সে চরম আপত্তিকর বর্ণনাকারী।' ইমাম নাসায়ি রাহ. বলেন, 'আমি জানি না সে কে?' ইমাম নাসায়ি অন্যত্র বলেন, 'সে চরম আপত্তিকর বর্ণনাকারী।'[৩২৪] ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, 'তার বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল দেওয়া যাবে না।'[৩২৫]

মোটকথা, হাদিসের একজন বর্ণনাকারী সিকাহ নয়। এর কারণে মুহাদ্দিসগণ হাদিসটিকে জয়িফ বলেছেন। ইমাম নববি রাহ. বলেন, 'আবু নুআইম ইসফাহানি রাহ. *হিলয়াতুল আউলিয়াতে* দুর্বল সনদে জিয়াদ থেকে, তিনি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, যখন রজব মাস আসত, তখন রাসুল ﷺ এ দুআটি করতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি রজব ও শাবানে বরকত দিন এবং আমাদের রমজানে পৌঁছিয়ে দিন।'[৩২৬]

---

[৩১৯] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৪৬; *আল-মুজামুল আওসাত* : ৩৯৩৯; *মুসনাদু বাজ্জার* : ৬৪৯৪।

[৩২০] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৩৯৩৯।

[৩২১] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩০০৬।

[৩২২] প্রাগুক্ত : ৪৭৭৪।

[৩২৩] *ফাজায়িলুল আওকাত* : ১৪, বায়হাকি।

[৩২৪] *মিজানুল ইতিদাল* : ৪/৮২।

[৩২৫] *তাবয়িনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফি শাহরি রাজাব* : ৫।

[৩২৬] *আল-আজকার* : ৪১৪।

আল্লামা তাহির পাটনি রাহ. বলেন, 'পূর্বোক্ত দুআটি দুর্বলসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর ফাজায়িলের ক্ষেত্রে জয়িফ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা যায়।'[৩২৭]

মোটকথা, আমাদের দেশের অনেকেই দুআটি সহিহ ভেবে বেশ গুরুত্ব দিয়ে পড়ে থাকেন; কিন্তু এ বিশেষ দুআকে কোনো ইমাম সহিহ বলেননি। সর্বসম্মতক্রমে হাদিসটি দুর্বল। যদিও দুর্বল হাদিস ফাজায়িলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। এ জন্য কেউ চাইলে রজবে এ দুআটি পড়তে পারে।

২. রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত বানোয়াট বর্ণনা

সাধারণভাবে রজবের মর্যাদা, এ মাসে কী কী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে এবং এ মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোনো সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের সালাত, সিয়াম, দান, দুআ ইত্যাদি ইবাদত করলে কী অকল্পনীয় পরিমাণে সাওয়াব বা পুরস্কার পাওয়া যাবে, তার বর্ণনায় অনেক জাল হাদিস বানানো হয়েছে। আমাদের দেশের প্রচলিত *বারো চাঁদের ফজিলত* ও আমল-ওজিফা বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে এসবের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া পূর্ববর্তী অনেক বুজুর্গের আমল ও ফাজায়িল-বিষয়ক গ্রন্থে এগুলো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত আরেকটি বানোয়াট বর্ণনা বাজারি বক্তাদের মুখে শোনা যায়। তারা বলে, আনাস রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

> شهر رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار، وفضل شعبان على سائر الشهور، كفضل محمد على سائر الأنبياء، وفضل رمضان على سائر الشهور، كفضل الله على عباده.
>
> অন্য মাসের ওপর রজবের মর্যাদা হলো যেমন কুরআনের ওপর অন্য জিকিরের মর্যাদা। আর শাবানের মর্যাদা হলো যেভাবে রাসুলের মর্যাদা অন্য নবিদের ওপর; আর সব মাসের ওপর রমজানের মর্যাদা হলো, যেমন আল্লাহর মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টির ওপর।[৩২৮]

এ ধরনের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে; রাসুল ﷺ বলেছেন,

> আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় মাস রজব। এটি আল্লাহর মাস। যে রজব মাসকে সম্মান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে নায়িম দান করবেন। এ

---

[৩২৭] *তাজকিরাতুল মাওজুআত* : ৫১।

[৩২৮] *ফাজায়িলুল আওকাত* : ৪৩।

ছাড়া তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পরম সন্তুষ্টি।

আর শাবান আমার মাস। যে শাবানের সম্মান করল, সে আমার আনীত বিষয়াবলির সম্মান করল। যে আমার বিষয়ের সম্মান করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার অভিভাবক হব। আর রমজান হলো আমার উম্মতের মাস। যে রমজানের সম্মান করবে, তার পবিত্রতা রক্ষা করবে ও তা নষ্ট করবে না এবং দিনে রোজা রাখবে ও রাতে তারাবি পড়বে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিফাজত করবে; রমজান মাস যখন শেষ হবে, তখন তার কোনো গুনাহ থাকবে না।[৩২৯]

এ মর্মের কিছু বর্ণনা বিভিন্ন মসজিদের মিম্বারে শোনা যায়। এর সবগুলোই জাল। রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। বানোয়াট ও মানুষের বানানো। যদিও উভয়টি ইমাম বায়হাকি *ফাজায়িলুল আওকাতে* উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদিস উল্লেখ করার পর বলেন, 'বর্ণনাটি আপত্তিকর।'[৩৩০] কিন্তু হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি আপত্তিকর নয়; বরং জাল। জাল করেছে আবু ইসমা।'[৩৩১]

ইমাম সাখাবি রাহ. বলেন, 'আমাদের শায়খ (হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি) বলেছেন, বর্ণনাটি জাল।'[৩৩২] মোল্লা আলি কারি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. জাল বলেছেন।'[৩৩৩] আল্লামা ইসমাইল আজলুনি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি জাল; যেমন বলেছেন হাফিজ ইবনু হাজার।'[৩৩৪]

মোটকথা, রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো জাল। রাসুলের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো দুষ্ট লোক বানিয়ে রাসুলের নামে চালিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

আট. শবেমিরাজ : কিছু কথা

আমাদের দেশে রজবের ২৭ তারিখ রাতে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে শবেমিরাজ পালন করা হয়। সে রাত মুসলমানগণ বেশ ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করে।

---

[৩২৯] প্রাগুক্ত : ৪৪।

[৩৩০] প্রাগুক্ত : ৪৫

[৩৩১] *তাবয়িনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফি শাহরি রাজাব* : ৬।

[৩৩২] *আল-মাকাসিদুল হাসানা* : ৭৪০।

[৩৩৩] *আল-মাসনু ফি মারিফাতিল মাওজু* : ২০৬।

[৩৩৪] *কাশফুল খাফা* : ১৮২৪।

এখানে প্রথমে বলে রাখি, রাসুলের মিরাজের ঘটনা হিজরতের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। এর পর রাসুলের জীবদ্দশায় অনেকবার মিরাজের তারিখ গত হয়েছে; কিন্তু রাসুল ﷺ সে রাত বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করেছেন, এমনটা কোথাও পাওয়া যায় না। রাসুল ﷺ সাহাবিদের নির্দেশ দিয়েছেন বলেও কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না। কারণ, ইসরা ও মিরাজ রাসুলের জীবনে একবারই সংঘটিত হয়েছে। প্রতিবছর সে তারিখে সেটা হয়নি। এ জন্য এটা এক রাতেই শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং সে রাত আলাদা করে পালন অর্থহীন কাজ।

এ ছাড়া রজবের ২৭ তারিখ রাতে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে, এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না। কারণ, প্রথমত মিরাজ কোন মাসে, কোন বছর সংঘটিত হয়েছিল, সেটি নিয়ে যেমন মতবিরোধ রয়েছে, ঠিক তেমনি কোন তারিখে সংঘটিত হয়েছে, তা নিয়েও প্রচুর মতবিরোধ আছে। কোন মাসে হয়েছে, সে সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'মিরাজের সময় নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, "মিরাজ রাসুলের নবুওয়াত লাভের পূর্বে হয়েছিল।" এটা বিচ্যুত কথা। অধিকাংশ আলিমের কথা হলো, "মিরাজ নবুওয়াত লাভের পরে হয়েছিল।" কেউ বলেন, "হিজরতের এক বছর আগে হয়েছিল।" ইবনু সাআদ ও অন্যরা এমনটি বলেছেন। ইমাম নববি দৃঢ়তার সঙ্গে এ মত পোষণ করেছেন। ইবনু হাজম বলেন, "এ মতের ওপর সবার ঐকমত্য রয়েছে।" তবে ঐকমত্যের এই দাবি প্রত্যাখ্যাত। কেননা, মিরাজের সময় নিয়ে ১০টির অধিক মত রয়েছে।

ইবনুল জাওজি বলেন, "মিরাজ হিজরতের আট মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। আবু রাবি ইবনু সালিম থেকে হিজরতের ছয় মাস পূর্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।" ইবরাহিম হারাবি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, "হিজরতের এক বছর পূর্বে রবিউস সানিতে সংঘটিত হয়েছিল। ইবনু মুনির *শারহুস সিরাতে* এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।"

কেউ কেউ বলেন, "হিজরতের এক বছর দুই মাস পূর্বে হয়েছিল।" ইবনু আবদিল বার মালিকি এ মত নকল করেছেন। ইবনু ফারিস হিজরতের এক বছর তিন মাস পূর্বের কথা বর্ণনা করেছেন। সুদ্দি রাহ. ইমাম তাবারি ও বায়হাকির সূত্রে বর্ণনা করেন, "হিজরতের এক বছর পাঁচ মাস পূর্বে।" এ মত অনুযায়ী মিরাজ শাওয়াল অথবা রমজানে সংঘটিত হয়েছিল। ওয়াকিদি রাহ. রবিউল আউয়ালের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন। ইবনু সাআদ রাহ. আবু সাবরা থেকে বর্ণনা করেন, "মিরাজ নবুওয়াতের ১৮ মাস পূর্বে, রমজানে হয়েছিল।" ইবনু আবদিল বার বর্ণনা করেন, "মিরাজ রজবে হয়েছিল।" ইমাম নববি এ মতকে দৃঢ়তার সঙ্গে

গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, “হিজরতের তিন বছর পূর্বে হয়েছিল।” ইমাম জুহরি বলেন, “হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।”’[৩৩৫]

প্রখ্যাত মুফাসসির মাহমুদ আলুসি রাহ. বলেন, ‘মিরাজ কোন মাসের কোন রাতে সংঘটিত হয়েছে এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম নববি তাঁর ফাতওয়ায় লিখেছেন, মিরাজ রবিউল আউয়ালে সংঘটিত হয়। *শারহু মুসলিমে* তিনি কাজি ইয়াজ রাহ.-এর অনুসরণ করে বলেন, রবিউস সানিতে সংঘটিত হয়েছে। *আর রাওজাতে* দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, মিরাজ রজবে সংঘটিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, রমজানে সংঘটিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, শাওয়ালে।’

ওয়াকিদির সূত্রে ইবনুল মুলাক্কিন নকল করেন, ‘শাওয়ালের ২৭ তারিখ সংঘটিত হয়।’ কেউ কেউ বলেন, ‘রবিউল আউয়ালের ১৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়।’[৩৩৬]

আমরা দেখতে পেলাম, মিরাজ সংঘটিত হওয়ার তারিখ নিয়ে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। রজবে সংঘটিত হয়েছে, এমনটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা কঠিন। ২৭ তারিখের কথা পরে। অনেকেই অন্য মাসে হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এর থেকে এ কথাও প্রমাণিত হলো, সাহাবিগণ মিরাজের তারিখ ততটা গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করেননি। কারণ, সেটি ছিল রাসুলের সঙ্গে নির্দিষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে এটিও প্রমাণিত হলো, মিরাজের রাতে সাহাবিগণ বিশেষ কোনো আমল করেননি। যদি করতেন, তাহলে সেটি বর্ণিত হতো। তখন তারিখ নিয়ে আর কোনো মতভিন্নতা হতো না। এ জন্য প্রথমত মিরাজ কোন মাসে সংঘটিত হয়েছে, সেটি নির্ধারিত নয়। এর পর কোন রাতে সংঘটিত হয়েছে, সেটিও নির্ধারিত নয়। যে দিনই হোক, সেটি রাসুলের সঙ্গে নির্দিষ্ট। এ জন্য আমাদের দেশে রজবের ২৭ তারিখে যে আয়োজন করা হয়, শরিয়তে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই।

নয়. শবেমিরাজের বিশেষ সালাত

শবেমিরাজ উপলক্ষ্যে আমাদের সমাজে কিছু সালাত প্রসিদ্ধ রয়েছে। বিশেষত মিরাজের রাতে মসজিদের মিম্বারে মিম্বারে এ রাতের বিশেষ ফজিলত সম্পর্কে কিছু হাদিস শোনানো হয়। প্রথমে *বারো চান্দের ফজিলত* থেকে বর্ণনাগুলো শুনি, সেখানে বলা হয়েছে—

---

[৩৩৫] *ফাতহুল বারি*: ৭/২৩০-২৩১।

[৩৩৬] *রুহুল মাআনি*: ১৫/১২-১৩।

এক বর্ণনায় রয়েছে, 'শবেমিরাজের রাতে দুই রাকআতে সুরা ফাতিহার পরে তিনবার সুরা ইখলাস পাঠ করবে এবং দুই রাকআতের পর ২০০ বার দুরুদ শরিফ পাঠ করবে এবং হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করবে। এই নামাজি অসংখ্য সাওয়াব লাভ করবে, তার ইমান মজবুত হবে এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকবে।'

অন্য বর্ণনায় আছে, 'মিরাজের রাতে দুই রাকআতের নিয়তে মোট চার রাকআত সালাত আদায় করবে। এই সালাতের প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতিহার পরে যেকোনো সুরা মিলিয়ে পাঠ করবে। সালাত শেষ করে কালিমায়ে তামজিদ, দুরুদ শরিফ ও তাওবা-ইসতিগফার প্রত্যেকটি ১০০ বার করে পাঠ করবে। তারপর সিজদায় গিয়ে আল্লাহর দরবারে যেসব নেক আকাঙ্ক্ষা করবে, তিনি তা কবুল করবেন।'[৩৩৭]

তবে এ ধরনের কোনো সালাতের কথা রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। এগুলো মানুষের বানানো ও বানোয়াট। প্রথমত শবেমিরাজ কোন দিন, সেটি নির্ধারিত নয়; বিস্তর মতভেদ রয়েছে। শবেমিরাজের সালাত-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সম্পর্কে কিছু মুহাদ্দিসের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'রজবের মর্যাদা, সে মাসে রোজা রাখা ও বিশেষ কোনো রাতের সালাতের ফজিলত সম্পর্কে দলিলযোগ্য কোনো সহিহ হাদিস নেই। আমার পূর্বে দৃঢ়তার সঙ্গে এমনটি বলেছেন হাফিজ ইমাম আবু ইসমাইল আল হারাওয়ি। আমরা তাঁর থেকে সহিহ সনদে তা বর্ণনা করেছি। এভাবে অন্যদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে।'[৩৩৮]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি এখানে স্পষ্ট বলেছেন যে, রজবে কোনো রাতের বিশেষ সালাতের ফজিলত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। শবেমিরাজ যেহেতু আমাদের দেশে ২৭ তারিখে পালন করা হয়, সুতরাং এ রাতের বিশেষ সালাত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'রজবের বিশেষ কোনো সালাত সহিহভাবে প্রমাণিত নয়।'[৩৩৯]

---

[৩৩৭] *বারো চান্দের ফযিলত* : ২৩।

[৩৩৮] *তাবয়িনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফি শাহরি রাজাব* : ২।

[৩৩৯] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ১৬৪।

শবেমিরাজের বিশেষ সালাতের যে বর্ণনা পূর্বে *বারো চান্দের ফযিলতের* বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনাটি সম্পর্কে আল্লামা আবদুল হাই লখনবি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি ইমাম বায়হাকি মুহাম্মাদ ইবনু ফাজল ইবনু আতিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। মুহাম্মাদ ইবনু ফাজল বর্ণনা করেন আবান থেকে। তিনিও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. *তাবয়িনুল আজাবে* হাদিসটি জাল বলেছেন।'[৩৪০]

এ ধরনের আরেকটি বর্ণনা হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. উল্লেখ করে সেটিকেও জাল বলেছেন।[৩৪১]

মোট কথা, শবেমিরাজ উপলক্ষ্যে কোনো বিশেষ সালাত বা রোজা রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। এ ছাড়া রাসুল ﷺ সাহাবিগণকেও এ উপলক্ষ্যে বিশেষ কোনো আমলের নির্দেশ দেননি। এ জন্য শবেমিরাজ উপলক্ষ্যে ইবাদত করা বিদআত।

✧◇✧

[৩৪০] *তাবয়িনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফি শাহরি রাজাব* : ২১; *আল-আসারুল মারফুআ* : ৪৮।
[৩৪১] প্রাগুক্ত : ২২।

সপ্তম অধ্যায়

শাবান : করণীয় ও বর্জনীয়

আরবি বর্ষপঞ্জির অষ্টম মাস শাবান। সর্বোত্তম মাস রমজানের আগের মাস। শাবানের ১৪ তারিখ রাত একটি মহিমান্বিত রাত। সে রাতের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। উপমহাদেশে সে রাতকে 'শবেবরাত' দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। শাবানের আলোচনার শুরুতে 'শবেবরাত' নিয়ে আলোচনা করছি।

এক. শবেবরাত : একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ

শবেবরাত নিয়ে আমাদের সমাজে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি উভয়টি রয়েছে। শবেবরাত উপলক্ষ্যে আমাদের গ্রামাঞ্চলে বহু আমল প্রচলিত রয়েছে, যেগুলো শরিয়তসম্মত নয়। এ উপলক্ষ্যে শিরনি বিতরণসহ এ ধরনের কিছু রুসুম বা প্রথা রয়েছে।

বর্তমানে নতুন কিছু লোক বেরিয়েছে যাদের বক্তব্য হলো, শবেবরাত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। শাবানের ১৪ তারিখ রাতের কোনো ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে সহিহ হাদিস-সমর্থিত নয়। শবেবরাতের মর্যাদা-সংক্রান্ত এক-দুটো হাদিস রয়েছে, সেগুলো জাল ও ভিত্তিহীন। সুতরাং আমাদের দেশে শবেবরাতকে যেভাবে বরকতপূর্ণ মনে করা হয়, সেটা আদৌ বরকতপূর্ণ কোনো রাত নয়। কিছু লোক আরেকটু সতর্ক হয়ে বলেন, শাবানের ১৪ তারিখ রাতের মর্যাদা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু ওই রাতের কোনো আমল রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।

জনসাধারণ শবেবরাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অর্থাৎ, তারা শবেবরাত উপলক্ষ্যে এমনকিছু কাজ করে, যা প্রমাণিত নয়। যেমন : গ্রামে শবেবরাত উপলক্ষ্যে অধিকাংশ বাড়িতে শিরনির আয়োজন করে। মসজিদে, ঘরে, দোকানে রাতে আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখে। শবেবরাতের আমল মনে করে রাতে দলবদ্ধ হয়ে কবর জিয়ারত করে। শবেবরাতের বিশেষ ফজিলত মনে করে পরদিন রোজা রাখে। বিশেষত মহিলাগণ রোজা রাখার ক্ষেত্রে অগ্রগামী। সে রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে

সালাত আদায় করে। এগুলো নিয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রযুক্তির কল্যাণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউবে আমাদের কিছু দীনি ভাইয়ের আলোচনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে। তাদের অনেকেই খুব জোরেশোরে শবেবরাতের মর্যাদা অস্বীকার করেন। তারা বলেন, এ রাতকে উপমহাদেশের মুসলমানগণ বিশেষভাবে পালন করে থাকে; অথচ আরববাসী এই রাতকে বিশেষভাবে পালন করে না। কারণ, সে রাতের মর্যাদা রাসুল ﷺ থেকে সহিহ সনদে প্রমাণিত নয়। এ জন্য প্রথমে সে বিষয়ে আলোকপাত করছি যে, আসলেই শাবানের ১৪ তারিখ রাতের মর্যাদা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কি না।

দুই. সহিহ হাদিসের আলোকে শবেবরাত

শাবানের ১৪ তারিখ রাত—যাকে আমরা শবেবরাত বলে থাকি—সে রাতের ফজিলত অনেক সাহাবি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১. মুআজ ইবনু জাবাল রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يَطْلُعُ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

শাবানের ১৪ তারিখ রাতে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। মুশরিক ও উম্মতে বিভেদ সৃষ্টিকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[৩৪২]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি *আল-মুজামুল কাবির* ও *আল-মুজামুল আওসাতে* উল্লেখ করেছেন। উভয় গ্রন্থের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।'[৩৪৩]

ইমাম বায়হাকি রাহ. হাদিসটির ভিন্ন কিছু সনদ উল্লেখ করার পর বলেন, 'এর দ্বারা বোঝা যায়, মাকহুল থেকে হাদিসটি প্রমাণিত।'

বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস শায়খ শুআইব আরনাউত রাহ. *সহিহু ইবনি হিব্বানের* টীকায় বলেন, 'এ হাদিসের মর্ম অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে হাদিসটি সহিহ।'

---

[৩৪২] *সহিহু ইবনি হিব্বান*: ৫৬৬৫; *শুআবুল ইমান*: ৩৮৮৩, বায়হাকি।

[৩৪৩] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ*: ১২৮৬০।

মোটকথা, শবেবরাতের ফজিলত-সংক্রান্ত মুআজ রা.-এর বর্ণিত হাদিসটি সহিহ; আর কোনো বিষয়ের ফজিলত প্রমাণিত হতে একটি সহিহ হাদিসই যথেষ্ট।

২. আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ لأَخِيهِ.

শাবানের ১৪ তারিখ রাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। সে রাত তিনি মুশরিক ও অন্য ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[৩৪৪]

হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম বাজ্জার রাহ. বলেন, 'হাদিসটি আবু বকর রা. থেকে এ সনদ ছাড়া অন্য কোনো সনদে বর্ণিত হয়নি। তবে আবু বকর রা. ছাড়া অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসুল ﷺ থেকে বিষয়টি যত সাহাবি বর্ণনা করেছেন, তাঁদের সবার ওপরে হলেন আবু বকর রা.। যদিও হাদিসের সনদ নিয়ে কথা রয়েছে; কিন্তু আবু বকর রা.-এর ব্যক্তিত্বের কারণে তা হাসান। হাদিসের বর্ণনাকারী আবদুল মালিক ইবনু আবদিল মালিক প্রসিদ্ধ নন। তবে বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এ জন্য আমরাও বর্ণনা করেছি।'

ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি ইমাম বাজ্জার *মুসনাদে* উল্লেখ করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আবদুল মালিক ইবনু আবদিল মালিক। ইবনু আবি হাতিম *আল-জারহু ওয়াত তাদিলে* তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু দুর্বল বলেননি। এ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী সিকাহ।'[৩৪৫]

ইমাম মুনজিরি বলেন, 'ইমাম বাজ্জার ও বায়হাকি রাহ. আবু বকর রা. থেকে এ মর্মে হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসের সনদে কোনো সমস্যা নেই।'[৩৪৬]

মাওলানা আবদুর রাহমান মুবারকপুরি রাহ. বলেন, 'আবু বকর রা.-এর বর্ণিত হাদিস ইমাম বাজ্জার ও বায়হাকি উল্লেখ করেছেন। সনদে কোনো সমস্যা নেই। *আত-তারগিব ওয়াত তারহিবে* ইমাম মুনজিরি রাহ. এমনটি বলেছেন।'[৩৪৭]

৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

---

[৩৪৪] *মুসনাদু বাজ্জার* : ৮০।

[৩৪৫] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ১২৯৫৭।

[৩৪৬] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ৪১৯০, মুনজিরি।

[৩৪৭] *তুহফাতুল আহওয়াজি* : ৬/৪৬৬।

يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ.

শাবানের ১৪ তারিখ রাতে আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। সে রাতে বিদ্বেষপোষণকারী ও হত্যাকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[৩৪৮]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী ইবনু লাহিআ, তিনি মধ্যপন্থার বর্ণনাকারী। এ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী সিকাহ।'[৩৪৯]

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি সহিহ। সাহাবিদের থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হলেন, মুআজ ইবনু জাবাল, আবু সালাবা খুশানি, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবু মুসা আশআরি, আবু হুরায়রা, আবু বকর, আউফ ইবনু মালিক ও আয়েশা রা.।'[৩৫০] তিনি আরও বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আমরের হাদিস ইবনু লাহিআর সূত্রে ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন। হাদিসের একাধিক সনদ ও মর্ম অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে এর সনদ গ্রহণযোগ্য।' এরপর ইমাম হায়সামির মন্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ইবনু লাহিআ যদিও মধ্যমপর্যায়ের বর্ণনাকারী; কিন্তু তাঁর মুতাবাআত তথা তিনি যে শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন, ওই শায়খ থেকে রিশদিন ইবনু সাআদও বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু হাইওয়াহ তাঁর হাদিস উল্লেখ করেছেন। এ জন্য আবদুল্লাহ ইবনু আমরের হাদিস হাসান।'[৩৫১]

আমাদের যে-সকল দীনি ভাই বলেন, শবেবরাতের কোনো ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে সহিহ সনদে প্রমাণিত নয়, তারা আলবানির কথাকে খুব মূল্যায়ন করেন। আলবানি রাহ. কোনো হাদিসকে জয়িফ বললে তারা সেটাকে চোখ বন্ধ করে মেনে নেন; যদিও পূর্বের অনেক ইমাম সে হাদিসকে সহিহ বলেও থাকেন। এখানে শবেবরাতের ফজিলত-সংক্রান্ত এ হাদিসকে আলবানি রাহ. হাসান বলেছেন। তারপরও তারা কীভাবে বলেন, শবেবরাতের ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে সহিহ সনদে প্রমাণিত নয়?

---

[৩৪৮] *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৬৪২।

[৩৪৯] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ১২৮৬১।

[৩৫০] *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহিহা* : ১১৪২।

[৩৫১] *সিলসিলাতুস সাহিহা* : ১/৩৩৫।

৪. আবু সালাবা আল খুশানি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ لِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ.

শাবানের ১৪ তারিখ রাতে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। আল্লাহ মুমিনদের ক্ষমা করে দেন। কাফিরদের আরও ছাড় দেন; আর হিংসা-বিদ্বেষপোষণকারীকে সেগুলো দূর না করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না।[৩৫২]

ইমাম হায়সামি রাহ. হাদিসটির ব্যাপারে বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি রাহ. বর্ণনা করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আহওয়াস ইবনু হাকিম, তিনি জয়িফ।'[৩৫৩]

ইমাম বায়হাকি রাহ. *শুআবুল ইমানে* হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'মাকহুল আবু সালাবা থেকে, তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। এ সনদেও মাকহুল ও আবু সালাবার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তবে আবু সালাবার হাদিস মুরসাল হলেও উত্তম।'[৩৫৪]

এ হাদিসও হাসান। হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন শায়খ তাহমিদুল মাওলা তাঁর রচিত *আল-ইতিবার বিমা ওয়ারাদা ফি লাইলাতিন নিসফি মিন শাবান*[৩৫৫] গ্রন্থে। আগ্রহী পাঠক সে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

৫. আউফ ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يَطَّلِعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

শাবানের ১৪ তারিখ রাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। সে রাতে তিনি মুশরিক ও অন্য ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[৩৫৬]

হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি ইমাম বাজ্জার রাহ. উল্লেখ করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনু জিয়াদ আনউম। আহমাদ ইবনু সালিহ তাঁকে সিকাহ (বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য) বলেছেন। তবে জুমহুর

[৩৫২] *আস-সুনানুস সুগরা* : ১৪২৬, বায়হাকি; *আল-মুজামুল কাবির* : ৫৯০, তাবরানি।

[৩৫৩] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ১২৮৬২।

[৩৫৪] *শুআবুল ইমান* : ৩৮৩১।

[৩৫৫] মাকতাবাতুল ইসলাম, ঢাকা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা নং-৩৩-৩৬।

[৩৫৬] *মুসনাদু বাজ্জার* : ২৭৫৪।

ইমাম তাঁকে দুর্বল বলেছেন। আরেকজন বর্ণনাকারী ইবনু লাহিআ, তিনি মোটামুটি পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য রাবি। এ ছাড়া হাদিসের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ।'[৩৫৭]

এখানে লক্ষণীয়, আবদুর রাহমান ইবনু জিয়াদ ইবনু আনউম সামগ্রিকভাবে দুর্বল নন। আর এ কথাও সঠিক নয় যে, জুমহুর আলিম তাঁকে দুর্বল বলেছেন। কেননা, অনেক ইমাম ও তাঁর এলাকার অনেক লোক তাঁকে সিকাহ বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, 'আমি আহমাদ ইবনু সালিহ মিসরিকে জিজ্ঞেস করি, "আবদুর রাহমান ইবনু জিয়াদের সূত্রে বর্ণিত হাদিস দ্বারা কি দলিল দেওয়া যাবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"।'

ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন, 'আমি ইমাম বুখারিকে দেখেছি, তিনি তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদিসকে গ্রহণ করে বলেছেন, হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণযোগ্য।' ইমাম সুহনুন বলেন, 'তিনি সিকাহ।' আবু বকর ইবনু আবি দাউদ বলেন, 'তিনি পুণ্যবান মানুষ।' ইমাম আবু হাতিম বলেন, 'তাঁর বর্ণিত হাদিস লেখা যাবে। তবে এককভাবে তাঁর বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না।'[৩৫৮]

মোটকথা, আবদুর রাহমান ইবনু জিয়াদ সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল নন। অনেকেই তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এ ছাড়া তাঁর বর্ণিত হাদিসের বিষয়বস্তু অনেক সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ জন্য হাদিসশাস্ত্রের স্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী হাদিসটি হাসান।

৬. আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

শাবানের ১৪ তারিখ রাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। সে রাতে তিনি মুশরিক ও অন্য ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[৩৫৯]

হাদিসের সনদ যদিও দুর্বল; কিন্তু সমষ্টিগতভাবে হাদিসটি হাসান। শবেবরাতের ফজিলতকে যারা অস্বীকার করেন, তাদের বরণীয় ব্যক্তি শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানিও হাদিসটি হাসান বলেছেন। তিনি *সুনানু ইবনি মাজাহ*কে দুভাগে ভাগ করেছেন। *সহিহু সুনানি ইবনি মাজাহ* ও *জয়িফু সুনানি ইবনি মাজাহ* নামে। আবু

---

[৩৫৭] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ১২৯৫২।

[৩৫৮] *তাহজিবুল কামাল* : ১২/২১৩, আবুল হাজ্জাজ মিজ্জি।

[৩৫৯] *ইবনু মাজাহ* : ১৩৭০।

মুসা আশআরির সূত্রে বর্ণিত হাদিসকে তিনি *সহিহ সুনানি ইবনি মাজাহ*তে উল্লেখ করেছেন এবং হাসান বলেছেন। আলবানির বক্তব্য হলো, আবু মুসা আশআরির সূত্রে বর্ণিত হাদিস হাসান।[৩৬০]

এ ছাড়া *ইবনু মাজাহ*র মুহাক্কিক শায়খ ফুয়াদ আবদুল বাকিও একে হাসান বলেছেন।

৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن.

শাবানের ১৪ তারিখ রাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। সে রাতে তিনি মুশরিক ও অন্য ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[৩৬১]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি ইমাম বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হিশাম ইবনু আবদির রাহমান, আমি তাঁকে চিনি না। এ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী সিকাহ।'[৩৬২]

হিশাম ইবনু আবদির রাহমানের কথা ইমাম বুখারি *আত-তারিখুল কাবিরে* উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তাঁর ব্যাপারে কোনো জারহ বা তাদিল উল্লেখ করেননি।[৩৬৩]

৮. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন,

قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بِكِ؟ "، قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: "أَتَدْرِينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟"، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ.

রাসুল ﷺ একবার রাতে জেগে সালাত পড়েন। তিনি সিজদা এত করেন যে,

---

[৩৬০] প্রাগুক্ত : ১১৪০।

[৩৬১] *মুসনাদু বাজ্জার* : ৯২৬৮।

[৩৬২] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ১২৯৫৮।

[৩৬৩] *আল-ইতিবার বিমা ওয়ারাদা ফি লাইলাতিন নিসফি মিন শাবান* : ৫৮, তাহমিদুল মাওলা।

আমি ধারণা করি তিনি মারা গেছেন। এ অবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে তাঁর আঙুল নাড়া দিই। তিনি নড়লেন। আমি ফিরে আসি। রাসুল ﷺ সিজদা থেকে মাথা তুলে সালাত শেষ করে বলেন 'হে আয়েশা, তুমি কি ধারণা করেছ, নবি তোমার থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছেন।' আমি বলি, 'না, আপনার দীর্ঘসময়ের সিজদার কারণে আপনি মারা গেছেন বলে ধারণা করেছি!'

রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি কি জানো আজ কোন রাত?' আমি বলি, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।' তিনি বললেন, 'আজ শাবানের ১৪ তারিখ রাত। এ রাতে আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। ক্ষমাপ্রার্থীদের ক্ষমা করেন। অনুগ্রহপ্রার্থীদের ওপর অনুগ্রহ করেন। তবে হিংসুকদের তিনি ক্ষমা করেন না।'[৩৬৪]

হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম বায়হাকি রাহ. বলেন, 'মুরসাল হলেও হাদিসটি গ্রহণযোগ্য। আলা ইবনু হারিস সরাসরি আয়েশা রা. থেকে শুনেননি। তিনি সম্ভবত মাকহুল থেকে শুনেছেন।'

৯. বায়হাকির বর্ণনায় আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন আলা ইবনু হারিস। ভিন্ন সনদে উরওয়া রাহ. আয়েশা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি হচ্ছে,

فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ، فَقَالَ: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

একরাতে রাসুল ﷺ-কে আমি হারিয়ে ফেলি। খুঁজে খুঁজে জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে পাই। তিনি বললেন, 'তুমি কি ভয় করেছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমার ওপর অত্যাচার করেছেন?' আমি বলি, 'আল্লাহর রাসুল, আমি ধারণা করেছি, আপনি অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে এসেছেন।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ শাবানের ১৪ তারিখ রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বনু কালবের বকরির পশমের সংখ্যার চেয়ে বেশি মানুষকে ক্ষমা করেন।'[৩৬৫]

---

[৩৬৪] *শুআবুল ইমান* : ৩৮৩৫, বায়হাকি।

[৩৬৫] *সুনানুত তিরমিজি* : ৭৩৯; *ইবনু মাজাহ* : ১৩৮৯।

ইমাম তিরমিজি রাহ. হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'হাজ্জাজের সনদ ছাড়া অন্য কোনো সনদে আয়েশার হাদিস বর্ণিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পারিনি। ইমাম বুখারি হাদিসটি দুর্বল বলেছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির উরওয়া থেকে শুনেননি। এভাবে হাজ্জাজ ইবনু আরতাতও ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির থেকে শুনেননি।'

তিরমিজির হাদিসটি যদিও দুর্বল; কিন্তু এ হাদিস দ্বারা পূর্বোক্ত আলা ইবনু হারিসের হাদিসের প্রামাণিকতা শক্তিশালী হয়।

১০. আয়েশা রা. থেকে আনাস ইবনু মালিকও বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা হলো,

بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَنْزِلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي حَاجَةٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَسْرِعِي فَإِنِّي تَرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَتْ: يَا أُنَيْسُ اجْلِسْ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِحَدِيثِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَانَتْ لَيْلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ مَعِي فِي لِحَافِي، فَانْتَبَهْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَقُمْتُ فَطُفْتُ فِي حُجُرَاتِ نِسَائِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ فَخَرَجْتُ فَمَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ رِجْلِي عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ: «سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي، وَهَذِهِ يَدِي جَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي، فَيَا عَظِيمُ، هَلْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ، فَاغْفِرْ لِي» قَالَتْ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَبْ لِي قَلْبًا تَقِيًّا نَقِيًّا مِنَ الشَّرِّ، بَرِيًّا لَا كَافِرًا وَلَا شَقِيًّا» ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، وَهُوَ يَقُولُ: "أَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ أَخِي دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أُعَفِّرُ وَجْهِي فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِي وَحُقَّ لِوَجْهِ سَيِّدِي أَنْ تُعَفَّرَ الْوُجُوهُ لِوَجْهِهِ"، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ، قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؟ إِنَّ لِلهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ بِقَدْرِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا بَالُ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ؟ قَالَ: "لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرَبِ قَبِيلَةُ قَوْمٍ أَكْبَرَ غَنَمًا مِنْهُمْ، لَا أَقُولُ سِتَّةُ نَفَرٍ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مُصِرٌّ عَلَى زِنًا، وَلَا مُصَارِمٌ، وَلَا مُضْرِب، وَلَا قَتَّاتٌ.

রাসুল ﷺ আমাকে বিশেষ প্রয়োজনে আয়েশার ঘরে পাঠান। আমি আয়েশাকে

বলি, 'আপনি দ্রুত যান। আমি রাসুল ﷺ-কে রেখে এসেছি, তিনি শাবানের ১৪ তারিখ রাতের ফজিলত বর্ণনা করছেন।' তিনি বললেন, 'হে উনাইস, তুমি বসো, যাতে আমি শাবানের ১৪ তারিখ রাতের ফজিলত বর্ণনা করতে পারি। শাবানের ১৪ তারিখ রাতে রাসুল ﷺ আমার ঘরে ছিলেন। রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়; কিন্তু রাসুল ﷺ-কে দেখছিলাম না। তখন অন্য স্ত্রীদের ঘরে তাঁকে খুঁজেও পাইনি। ভাবলাম, সম্ভবত তিনি তাঁর বাঁদি মারিয়া কিবতিয়ার কাছে গেছেন। এরপর বেরিয়ে মসজিদে যাই। আমার পা তাঁকে স্পর্শ করে। তখন তিনি সিজদারত। তিনি তখন বলেন, "আপনাকে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সিজদা করেছে। আমার অন্তর আপনার ওপর ইমান এনেছে। আমার হাত দ্বারা নিজের ওপর অত্যাচার করেছি। আপনার মতো মহানুভব ছাড়া কে আমাকে ক্ষমা করবে? আপনি আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন।"'

আয়েশা রা. বলেন, 'এরপর রাসুল ﷺ সিজদা থেকে মাথা তুলে বলেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমাকে অনিষ্ট ও লৌকিকতামুক্ত পূতপবিত্র হৃদয় দান করুন। কাফির ও অভাগাদের হৃদয় থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।" রাসুল ﷺ তখন পুনরায় সিজদা করেন এবং এই দুআ পড়েন, "আমি আপনার কাছে ওইভাবে বলছি, যেভাবে বলেছেন আমার ভাই দাউদ আ.। আমি আমার মালিকের জন্য চেহারাকে ধুলোয় ধূসরিত করছি।"

এরপর রাসুল ﷺ মাথা তুলেন। আমি বলি, 'আল্লাহর শপথ, আপনি এক উপত্যকায়; আর আমি অন্য উপত্যকায়।' তিনি বললেন, 'হে হুমায়রা, তুমি কি জানো, আজকে শাবানের ১৪ তারিখ রাত? এই রাতে বনু কালবের বকরির পশম পরিমাণ জাহান্নামি লোককে আল্লাহ তাআলা মুক্তি দেন।' আমি বলি, 'আল্লাহর রাসুল, বনু কালবের বকরির পশমের হেতু কী?' তিনি বললেন, 'আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে বনু কালবের বকরির পশম সবচেয়ে বেশি। তবে ছয় প্রকারের লোকদের ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারছি না—অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কি না।) সর্বদা মদপানকারী, পিতামাতার অবাধ্য, বার বার জিনাকারী, সম্পর্ক ছিন্নকারী, ছবি অঙ্কনকারী ও চোগলখোর।'[৩৬৬]

হাদিসের সনদে ইবরাহিম ইবনু ইসহাক নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তিনি দুর্বল। এ ছাড়া সায়িদ ইবনু আবদিল কারিম আল ওয়াসিতি নামের আরেকজন

[৩৬৬] *ফাজায়িলুল আওকাত* : ২৭।

বর্ণনাকারী আছেন। ইমাম আজদি তাঁকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম জাহাবি *মিজানুল ইতিদালে* তাঁর জীবনীতে এ হাদিস উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম জাহাবির মূলনীতি হলো, যদি কোনো বর্ণনাকারীর কোনো মাতরুক বা বাতিল রিওয়ায়াত থাকে, তাহলে তিনি সেটি তাঁর জীবনীর সঙ্গে জুড়ে দেন। মোটকথা, আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসটিও দুর্বল।

আয়েশা রা. থেকে আবু সায়িদ খুদরিও এ মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি ইমাম বায়হাকি *শুআবুল ঈমানে* উল্লেখ করেছেন। ইমাম বায়হাকি হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'এর সনদ দুর্বল। তবে হাদিসটি অন্য সনদে বর্ণিত আছে।'[৩৬৭]

আয়েশা রা. থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদিস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, শাবানের ১৪ তারিখ রাতের ফজিলত রয়েছে। সে রাতে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ক্ষমা করেন। বিষয় দুটি মুআজ রা.-এর সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, আমাদের দেশে ইদানীং কিছু ভাই বলেন, 'রাসুল ﷺ থেকে শাবানের ১৪ তারিখ রাতের ফজিলত প্রমাণিত রয়েছে; কিন্তু তাঁর থেকে সে রাতে কোনো আমল প্রমাণিত নয়!' তাদের এ কথাও সঠিক নয়। কেননা, আয়েশার বর্ণনায় রাসুল ﷺ সে রাতের ইবাদত করা বর্ণিত আছে। প্রথম বর্ণনাকে ইমাম বায়হাকি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এ ছাড়া সহিহ হাদিস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, সে রাতে আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির দিকে রহমতের দিকে তাকান; আর স্বাভাবিক কথা হলো, যে রাতে আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দিয়ে বান্দার দিকে তাকান, সে রাতে বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে। সালাত পড়বে। তবে একাকী। এ জন্য ইবাদত প্রমাণিত নয় কথাটি একধরনের হাস্যকর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

তিন. শবেবরাত-সংক্রান্ত আসার

পূর্বে আমরা সহিহ হাদিসের আলোকে প্রমাণিত করেছি যে, শাবানের ১৪ তারিখ রাত—যাকে আমরা শবেবরাত বলি—সেটার বিশেষ ফজিলত রয়েছে। রাসুল ﷺ সে রাতে একাকী বিশেষ ইবাদত করেছেন। শবেবরাতের ফজিলত যেভাবে সহিহ হাদিস রয়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে অনেক আসার রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আসার উল্লেখ করছি :

---

[৩৬৭] *শুআবুল ঈমান* : ৩৮৩৭।

১. ইবনু উমর রা. বলেন,

خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ.

পাঁচটি রাত এমন, যে রাতের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। জুমুআর রাত, রজবের প্রথম রাত, শাবানের ১৪ তারিখ রাত, উভয় ইদের রাত।[৩৬৮]

২. খতিবে বাগদাদি রাহ. উমর ইবনু আবদিল আজিজ রাহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আদি ইবনু আরতাতের উদ্দেশে লেখেন, 'বছরের চারটি রাত তুমি অবশ্যই লক্ষ রাখবে। কেননা, সেসব রাতে রহমত বর্ষিত হয়। রজবের প্রথম রাত, শাবানের ১৪ তারিখ রাত, ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার রাত।'[৩৬৯]

৩. ইমাম শাফিয়ি রাহ. বলেন, 'আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, পাঁচ রাতে দুআ কবুল হয়—জুমুআর রাতে, ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার রাতে। রজবের প্রথম রাতে ও রজবের ১৪ তারিখ রাতে। এ রাতগুলো সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, আমি সেগুলো মুসতাহাব মনে করি; ফরজ মনে করি না।'[৩৭০]

শবেবরাত সম্পর্কে উপরে অনেক হাদিস ও আসার উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব দ্বারা শাবানের ১৪ তারিখ রাত তথা শবেবরাতের ফজিলত প্রমাণিত হয়।

এখন আমাদের সমাজের যে-সকল ভাই বলেন, শবেবরাতের কোনো ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়, তারা এ হাদিসগুলো সম্পর্কে কী বলবেন? এ ছাড়া কিছু হাদিস এমন রয়েছে, যেগুলো তাদের অনুসৃত ব্যক্তি শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ.-ও সহিহ বলেছেন।

চার. শবেবরাত সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য

শবেবরাতের ফজিলত যেভাবে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি উম্মতের বরেণ্য ইমামগণ এ রাতের মর্যাদা স্বীকার করেছেন। এখানে কয়েকজন ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করছি :

১. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'শাবানের ১৪ তারিখ রাতের ফজিলত রয়েছে। সালাফের অনেকেই এ রাতে সালাত পড়েছেন।

---

[৩৬৮] *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ৭৯২৭।

[৩৬৯] *আত-তালখিসুল হাবির* : ২/১৯১, ইবনু হাজার।

[৩৭০] *আল-ইতিবার* : ১৪৩।

তবে সম্মিলিতভাবে মসজিদে সে রাত জেগে থাকা বিদআত। এভাবে জামাআতে সালাত পড়াও বিদআত।’[৩৭১]

ইবনু তাইমিয়া আরও বলেন, ‘শাবানের ১৪ তারিখ রাতের ফজিলত সম্পর্কে রাসুল ﷺ থেকে হাদিস ও অনেক আসার বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো দ্বারা এ রাতের ফজিলত প্রমাণিত হয়। সালাফের অনেকেই এ রাতে বিশেষ করে সালাত পড়তেন। শাবানের রোজা সম্পর্কে অনেক সহিহ হাদিস এসেছে। সালাফ থেকে মদিনার অনেক আলিম ও পরবর্তী কেউ কেউ শবেবরাতের ফজিলত অস্বীকার করেছেন এবং এ-সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। বিশেষত বনু কালবের বকরির পশম পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়ার হাদিস।

কিন্তু অধিকাংশ আলিম এবং আমাদের অনুসৃতদের মত হলো, এ রাতের ফজিলত রয়েছে। ইমাম আহমাদ রাহ.-এর নস তথা ভাষ্য এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে। কেননা, এ রাতের ফজিলত বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্নভাবে এসেছে। সালাফ থেকে বর্ণিত আসার সেগুলোর সত্যায়ন করে। *মুসনাদ* ও *সুনানের* গ্রন্থাদিতে এ রাতের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যদিও এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে কিছু বর্ণনা জাল করা হয়েছে।’[৩৭২]

ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় : প্রথমত, শবেবরাতের ফজিলত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আমাদের যে-সকল ভাই বলেন, সহিহ হাদিস দ্বারা শবেবরাতের ফজিলত প্রমাণিত নয়, ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী তাদের কথা সঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, সালাফের অনেকেই সে মর্যাদাপূর্ণ রাতে একাকী সালাত পড়েছেন। তবে সম্মিলিতভাবে মসজিদে সালাত আদায় করা বিদআত। কারণ, রাসুল ﷺ ও সাহাবিগণ থেকে সম্মিলিতভাবে আমল প্রমাণিত নয়। এ জন্য আমাদের দেশে যারা ব্যাপকভাবে বলেন, এ রাতে বিশেষ কোনো আমল নেই, ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী তাদের কথাও সঠিক নয়। কেননা, সালাফগণ এ রাতে একাকী সালাত পড়েছেন।

২. ইমাম ইবনু আমির আলহাজ সানআনি মালিকি রাহ. বলেন, ‘শবেবরাতের মর্যাদা যদিও শবেকদরের মতো নয়; কিন্তু তারপরও সে রাতের অনেক মর্যাদা ও কল্যাণ রয়েছে। সালাফগণ এ রাতের গুরুত্ব দিতেন এবং এ

---

[৩৭১] *আল-ফাতাওয়াল কুবরা* : ১/১৩০১, ইবনু তাইমিয়া।

[৩৭২] *ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম* : ১/৩০২।

রাতের অপেক্ষা করতেন। এ রাত এলে তাঁরা পুরো রাত জেগে আল্লাহর ইবাদত করতেন; এ রাতের বিশেষ ফজিলতের কারণে। এরপর কিছু লোক এর বিপরীত এসে পূর্বের অবস্থা পালটে দিলেন।'[৩৭৩]

৩. হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেন, 'সাহাবি, তাবিয়ি, অনুসৃত ইমামগণসহ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল ইমামের কাল বেয়ে আমাদের সময় পর্যন্ত সহিহ ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, আল্লাহর জাত ও সিফাত সম্পর্কিত সব আয়াত, রাসুলের যাবতীয় সত্য-সংবাদ, তাঁর সিফাত-সংক্রান্ত সেসব বর্ণনা, যেগুলো শাস্ত্রবিদগণ সহিহ বলেছেন ও গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সেগুলোর ওপর ইমান আনা ওয়াজিব।'

এরপর কোন কোন বিষয়ের ওপর ইমান আনতে হবে, এ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ যা বলেছেন, সবগুলোর ওপর ইমান আনতে হবে।'

এরপরের তালিকায় বলেন, 'প্রত্যেক রাতে আসমানে আল্লাহ তাআলার অবতরণ, জুমুআর রাতের ফজিলত, দুই ইদের রাতের ফজিলত, শাবানের ১৪ তারিখ রাতের ফজিলত এবং শবেকদরের ফজিলতের ওপর ইমান আনতে হবে।'[৩৭৪]

ইবনুল কাইয়িম রাহ. হলেন ইবনু তাইমিয়ার হাতেগড়া শিষ্য। আমাদের যে-সকল ভাই বলেন, শবেবরাতের ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে সহিহভাবে প্রমাণিত নয়, তারা ইবনু তাইমিয়ার মতো ইবনুল কাইয়িম রাহ. দ্বারাও বেশ কিছু মাসআলায় দলিল পেশ করেন; অথচ আমরা দেখতে পেলাম, ইবনুল কাইয়িম রাহ. শবেবরাতের ফজিলতের ওপর প্রত্যেক মুসলামানের ইমান আনার কথা বলেছেন।

৪. আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'শাবানের ১৫ তারিখ রোজা রাখতে সমস্যা নেই। কেননা, ১৫ তারিখ হলো "আইয়ামে বিজ"-এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মাসের সে তারিখে রোজা রাখা সুন্নাত। এ ছাড়া বিশেষভাবে শাবানে রোজা রাখার ব্যাপারে রাসুল ﷺ থেকে দুর্বল সনদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।'

এরপর তিনি শবেবরাতে জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'কেউ কেউ সালাত, কেচ্ছাকাহিনি বর্ণনা ও দুআর জন্য মসজিদে জমায়েত

---

[৩৭৩] *আল-মাদখাল* : ১/২৯৯।

[৩৭৪] *ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়া* : ৭৫-৭৬, ইবনুল কাইয়িম।

হওয়াকে মাকরুহ বলেছেন। তবে সে রাতে একাকী সালাত পড়া মাকরুহ নয়। এমনটা হলো ইমাম আওজায়ি এবং শামের অন্যান্য ফকিহ ও আলিমের মত। আমার মতে, এ মত হলো বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী।'

এরপর এ রাতের ফজিলত-সংক্রান্ত হাদিসগুলো নিয়ে পর্যালোচনার পর লেখেন, 'মুমিনদের জন্য উচিত হলো, সে রাতে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা। নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চেয়ে, নিজের দোষত্রুটি গোপন রাখার জন্য, বিপদে রাস্তা দেখানোর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা। তবে এগুলোর আগে তাওবা করা। কেননা, এ রাতে তাওবাকারীর তাওবা আল্লাহ তাআলা কবুল করেন।'[৩৭৫]

৫. আল্লামা আবদুল হাই লখনবি রাহ. বলেন, 'শবেবরাতের ফজিলত-সংক্রান্ত আরও হাদিস রয়েছে, যেগুলো ইমাম বায়হাকিসহ অনেকে তাখরিজ করেছেন। ইবনু হাজার মাক্কি রাহ. *আল-ইজাহ ওয়াল বায়ানে* সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা দ্বারা বোঝা যায়, রাসুল ﷺ সে রাতে বেশি বেশি ইবাদত করতেন। দুআ করতেন। কবর জিয়ারত করতেন। মৃতের জন্য দুআ করতেন। এ সমস্ত হাদিস দ্বারা এ রাতে বেশি ইবাদত করা মুসতাহাব প্রমাণিত হয়।

ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ ইচ্ছাধীন—চাইলে সালাত পড়তে পারে আবার অন্য ইবাদতও করতে পারে। যদি সালাত পড়ে, তাহলে রাকআত-সংখ্যা ও পদ্ধতি তার নিজের ইচ্ছাধীন। তবে স্পষ্ট বা ইশারায় শরিয়তে নিষিদ্ধ কোনো বিষয় সালাতে যোগ করতে পারবে না, অন্যথায় সে সালাত জায়িজ হবে না।'[৩৭৬]

৬. ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ. বলেন, 'এই রাত বারাআতের। এ ছাড়া শবেবরাতের ফজিলত-সংক্রান্ত সহিহ হাদিস রয়েছে।'[৩৭৭]

৭. মাওলানা আবদুর রাহমান মুবারকপুরি রাহ. বলেন, 'শাবানের ১৪ তারিখ রাতের ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর সমষ্টি দ্বারা বোঝা যায়, এ রাতের ফজিলতের ভিত্তি রয়েছে।'[৩৭৮]

---

[৩৭৫] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ১৮৮-১৯০।

[৩৭৬] *আল-আসারুল মারফুআ* : ৬৭।

[৩৭৭] *আল-উরফুশ শাজ্জি* : *তিরমিজির সঙ্গে সংযুক্ত* : ১/১৫২।

[৩৭৮] *তুহফাতুল আহওয়াজি* : ৩/১৬১।

৮. শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. বলেন, ‘শাবানের ১৪ তারিখ রাতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকানো-সংক্রান্ত হাদিসটি সহিহ। সাহাবিগণের একটি জামাআত থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনাকে শক্তিশালী করে।’

এরপর সবগুলো হাদিস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, ‘সবগুলো সনদ হিসেবে হাদিসটি সন্দেহাতীত সহিহ। এর চেয়ে কম সংখ্যায় হাদিস বর্ণিত হলে সেটি সহিহ হয়; যতক্ষণ হাদিসটি বেশি দুর্বল না হয়। এ জন্য শায়খ কাসিমি রাহ. *ইসলাহুল মাসাজিদে* যে কথা বর্ণনা করেছেন, “শবেবরাতের ফজিলত সম্পর্কে কোনো সহিহ হাদিস নেই”, সে কথা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কেউ এমনটা বলে থাকেন, সেটা বলবেন তার কম মেহনত ও তাড়াহুড়োর কারণে।’[৩৭৯]

আমাদের দেশে যারা বলে বেড়াচ্ছেন, শবেবরাতের ফজিলত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়, মাওলানা আবদুর রাহমান মুবারকপুরি, শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি তাদের মাথার তাজ। তাঁরা দুজন স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে, শবেবরাতের ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আশা করি, তারা সঠিক বিষয়টি অনুধাবন করবেন।

এখানে বিভিন্ন মাজহাব ও মতাদর্শের আলিমদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো। তাঁরা সবাই শাবানের ১৪ তারিখ রাত—যাকে আমরা শবেবরাত বলে থাকি—এর ফজিলতের কথা স্বীকার করেছেন। সবাই বলেছেন, এ রাতে আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। এ জন্য মানুষ রাত জেগে নিভৃতে আল্লাহ ইবাদত করবে, তাওবা করবে। রাসুল ﷺ একাকী সে রাতে ইবাদত করেছেন, এটিও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ ছাড়া যুগ যুগ ধরে উম্মত সে রাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এ জন্য এ রাতের ফজিলত থাকা সর্বজনস্বীকৃত। এ রাতের ফজিলতকে অস্বীকার করার অর্থ, রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত অনেক সহিহ হাদিস অস্বীকার করা। যদিও শবেবরাত উপলক্ষ্যে অনেক প্রথা ও বানোয়াট আমল আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ, সেগুলো অস্বীকার করা যেতে পারে। সেগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা আবশ্যক। তবে সাধারণভাবে শবেবরাতের ফজিলত অস্বীকার করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। কারণ, এ সম্পর্কে রাসুল ﷺ থেকে অনেক সহিহ হাদিস বর্ণিত। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

---

[৩৭৯] *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহিহা* : ১১৪৪।

পাঁচ. শবেবরাতের বিশেষ সালাত

শবেবরাত উপলক্ষ্যে আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে বিশেষ পদ্ধতির সালাত আদায় করা হয়। শোনানো হয় সে সালাতের বিশেষ ফজিলত। শবেবরাতের বিশেষ সালাতের ফজিলত-সংক্রান্ত অনেক হাদিস শবেবরাত এলেই কিছু কিছু মানুষের মুখে শোনা যায়।

একটি কথা ভালো করে স্মরণ রাখা চাই, শবেবরাত উপলক্ষ্যে বিশেষ কোনো সালাতের ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে সহিহ সনদে প্রমাণিত হওয়া দূরের কথা, দুর্বল সনদেও প্রমাণিত নয়। এ-সংক্রান্ত যতগুলো বর্ণনা রয়েছে, কোনোটিই সহিহ নয়। হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ আল্লামা জাহিদ কাউসারি রাহ. বলেন, 'শবেবরাতের বিশেষ সালাত সম্পর্কে রাসুল ﷺ থেকে কোনোকিছু প্রমাণিত নয়। যদিও *কুতুল কুলুব, ইহইয়াউ উলুমিদ দীন* ও *গুনয়াহ*-এর লেখক এ সম্পর্কে হাদিস উল্লেখ করেছেন।'[৩৮০]

মুহাদ্দিসুল আসার আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ. বলেন, 'শবেবরাত-সংক্রান্ত লেখকগণ যেসব দুর্বল ও মুনকার তথা পরিত্যাজ্য বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। সে ধরনের বর্ণনা আবু তালিব মাক্কি *কুতুল কুলুবে* উল্লেখ করেছেন। ইমাম গাজালি রাহ. *ইহইয়াউ উলুমিদ দীনে* তাঁকে অনুসরণ করেছেন। এরপর আরও অনেকে গাজালির অনুসরণ করেছেন। যেমন, আবদুল কাদির জিলানি রাহ. *গুনয়াতুত তালিবিনে* উল্লেখ করেছেন।'[৩৮১]

মোটকথা, শবেবরাত উপলক্ষ্যে সে রাতে বিশেষ কোনো সালাত রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। ফজিলত-সংক্রান্ত সবগুলো বর্ণনা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। তবে একাকী সে রাতে ইবাদত রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত। যে যত রাকআত ইচ্ছা নফল সালাত পড়তে পারবে।

ছয়. শবেবরাতের সালাত-সংক্রান্ত কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

শবেবরাত উপলক্ষ্যে কয়েক পদ্ধতির সালাত আমাদের সমাজে প্রচলিত। শোনানো হয় প্রত্যেকটির আলাদা ফজিলত; কিন্তু সেগুলোর একটিও সহিহ নয়। আল্লামা আবদুল হাই লখনবি রাহ. *আল-আসারুল মারফুআ* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি বর্ণনা নিয়ে নিম্নে আলোচনা করছি :

[৩৮০] *মাকালাতুল কাওসারি* : ৫০।
[৩৮১] *মাআরিফুস সুনান* : ৫/৪১৯।

১. ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ في مائة ركعة لم يخرج من الدنيا حتى يبعث الله إليه في منامه ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من النار وثلاثون يعصمونه من أن يخطئ وعشر يكيدون من عاداه.

যে শবেবরাতে ১০০ রাকআতে ১ হাজারবার সুরা ইখলাস পড়বে, মৃত্যুর আগে ৩০ জন ফেরেশতা স্বপ্নে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন। ৩০ জন ফেরেশতা জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ দেবেন। ৩০ জন ভুল থেকে তাকে নিরাপদ রাখবেন। ১০ জন ফেরেশতা তার শত্রুদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবেন।

বর্ণনাটি সম্পর্কে ইমাম ইবনুল জাওজি রাহ. বলেন, 'সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনাটি জাল। বর্ণনার তিনটি সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারী মাজহুল তথা অজ্ঞাত।'[৩৮২] আল্লামা ইবনু আররাক আল কাত্তানি রাহ. এ বর্ণনার দুটি সনদ উল্লেখ করে বলেন, 'উভয়ের সনদে মাজহুল ও অভিযুক্ত বর্ণনাকারী রয়েছে।'[৩৮৩] হাফিজ জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি জাল। বর্ণনার তিনটি সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারী মাজহুল তথা অজ্ঞাত। এ ছাড়া আরও দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে এবং এটি হাদিস হওয়া সম্ভব নয়।'[৩৮৪] আল্লামা আবদুল হাই লখনবি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি জাল। এর সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারী মাজহুল। এ ছাড়া দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী রয়েছে। যেমনটি বলেছেন ইবনুল জাওজি, সুয়ুতি, ইবনু আররাক ও অন্যরা।'[৩৮৫]

অর্থাৎ, ১০০ রাকআতে ১ হাজারবার সুরা ইখলাস পড়ার ফজিলত সম্পর্কিত যে বর্ণনা কিছু মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়, সেটা মুহাক্কিক ইমামদের মতানুসারে জাল। সুতরাং এমন আমল রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

২. শবেবরাতের সালাত-সংক্রান্ত আরেকটি জাল বর্ণনা হচ্ছে; আলি রা. বর্ণনা করেন,

আমি রাসুল ﷺ-কে শবেবরাতে সালাত পড়তে দেখি। তিনি ১৪ রাকআত সালাত পড়েন। তিনি যখন বৈঠক করেন, সুরা ফাতিহা ১৪ বার পড়েন, সুরা ইখলাস ১৪ বার, সুরা ফালাক ও নাস ১৪ বার পড়েন। এরপর আয়াতুল

---

৩৮২ *কিতাবুল মাওজুআত* : ২/১২৯, ইবনুল জাওজি।

৩৮৩ *তানজিহুশ শারিয়াতিল মারফুআ* : ২/১০৭, ইবনু আররাক।

৩৮৪ *আল-লাআলিল মাসনুআ* : ৩/৭৭।

৩৮৫ *আল-আসারুল মারফুআ* : ৬৯, লখনবি।

কুরসি ও 'লাকাদ জা-আকুম' আয়াত একবার পড়েন।

রাসুল ﷺ যখন সালাত শেষ করেন, তখন তাঁকে সে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, 'যে এমন সালাত পড়বে, সে ২০টি কবুল হজ, ২০ বছর কবুল রোজার সাওয়াব পাবে। সে দিন যে রোজা রাখবে, সে ৬০ বছর রোজা রাখার সাওয়াব পাবে।'

আগের বর্ণনার মতো এটিও সহিহ নয়; জাল। কয়েকজন মুহাদ্দিসের বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি :

ইমাম বায়হাকি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি জাল ও আপত্তিকর। এর বর্ণনাকারী অনেকেই মাজহুল।'[৩৮৬] ইমাম জাহাবি রাহ. বলেন, 'বর্ণনার সনদ আপত্তিকর। বর্ণনাকারীদের মধ্যে মিথ্যুক রয়েছে।'[৩৮৭] ইমাম ইবনুল জাওজি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি জাল। সনদ আপত্তিকর। যে এ বর্ণনা জাল করেছে, সে এমন মানুষের নাম সনদে উল্লেখ করেছে, যাদের থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। আরও এমন বর্ণনাকারী রয়েছে, যাদের চেনা যায় না। সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাজির নামের একজন রয়েছে। তার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, সে হাদিস জাল করত।'[৩৮৮] ইমাম ইরাকি বলেন, 'শবেবরাতের সালাত-সংক্রান্ত এ বর্ণনা বাতিল।'[৩৮৯]

মোটকথা, শবেবরাতে বিশেষ পদ্ধতির ১০০ রাকআত সালাত রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কিত হাদিস জাল ও বানোয়াট।

৩. শবেবরাতে বিশেষ পদ্ধতির ৫০ রাকআত সালাতও আমাদের দেশে কিছু কিছু মানুষ আদায় করেন। সে সম্পর্কে আনাস রা.-এর সূত্রে একটি বর্ণনা; রাসুল ﷺ বলেন,

যে শবেবরাতে ৫০ রাকআত সালাত পড়বে, ওই রাতে সে আল্লাহর কাছে যে প্রয়োজন চাইবে, আল্লাহ পূর্ণ করবেন। যদিও লাওহে মাহফুজে তাকে হতভাগা লেখা হয়। তারপরও আল্লাহ সেটা মুছে দিয়ে তাকে ভাগ্যবান করে দেবেন। আল্লাহ তার কাছে ৭ হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন, যারা তার নেকি লিখবেন। আরও ৭ হাজার ফেরেশতা তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ

---

[৩৮৬] প্রাগুক্ত : ৬৪।

[৩৮৭] *তালখিসুল মাওজুআত* : ১/১৮৬।

[৩৮৮] *কিতাবুল মাওজুআত* : ১/১৩০।

[৩৮৯] *আল-আসারুল মারফুআ* : ৬৮।

করেন। কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াতের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ৭০ জন হুর দান করবেন।

এ ধরনের বহু ফজিলতের কথা রয়েছে দীর্ঘ এই বর্ণনায়। এই বর্ণনার শব্দ দেখলেই যে-কেউ সহজে বলতে পারবে, এটা নিশ্চিত জাল। মানুষের বানানো। রাসুল ﷺ কখনো এমন উদ্ভট কথা বলতে পারেন না। তারপরও অন্তরের প্রশান্তির জন্য দুজন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরছি :

ইমাম জাহাবি রাহ. বলেন, 'যে বর্ণনাটি জাল করেছে, আল্লাহ তার মন্দ করুন। সে মিথ্যার এমন দাস্তান রচনা করেছে, যা বর্ণনাতীত।'[৩৯০] হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানিও ইমাম জাহাবির বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।[৩৯১]

৪. শবেবরাতে বিশেষ পদ্ধতির ১২ রাকআত সালাত। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

من صلى ليلة النصف من شعبان اثنتى عشر ركعة يقرأ في كل ركعة ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ ثلاثين مرة لم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة ويشفع في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار.

যে শাবানের ১৪ তারিখ রাতে ১২ রাকআত সালাত পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ৩০ বার পড়বে, সে সালাতে জান্নাতে তার স্থান দেখতে পারবে এবং তার পরিবারের এমন ১০ জন লোককে সুপারিশ করতে পারবে, যাদের ওপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে।

এ বর্ণনাটিও জাল। ইমাম ইবনুল জাওজি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি জাল। বর্ণনাকারীদের বড় একটি দল মাজহুল।'[৩৯২] জালালুদ্দিন সুয়ুতি ও ইবনু আররাক কাত্তানি ইমাম ইবনুল জাওজির বক্তব্য সমর্থন করেছেন।[৩৯৩]

শবেবরাতের বিশেষ পদ্ধতির সালাত সম্পর্কে আরও অনেক উদ্ভট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা রয়েছে। *মকসুদুল মুমিনীন, বারো চান্দের ফজিলত*সহ এ ধরনের অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এসব বিবরণ রয়েছে। সেগুলোর একটিও সহিহ নয়। এ ক্ষেত্রে মূলকথা হলো, যা আল্লামা জাহিদ কাউসারি ও আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ. উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এ রাতের বিশেষ কোনো সালাত সম্পর্কে একটি

---

[৩৯০] *মিজানুল ইতিদাল* : ২/৩৮১।

[৩৯১] *লিসানুল মিজান* : ৫/১৩৭।

[৩৯২] *কিতাবুল মাওজুআত* : ২/১২৯।

[৩৯৩] *আল-লাআলিল মাসনুআ* : ২/৪৯; *তানজিহুশ শারিয়াতিল মারফুআ* : ২/৯২।

বর্ণনাও রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। সবগুলো জাল ও বানোয়াট। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

সাত. শবেবরাতের রোজা

শবেবরাত উপলক্ষ্যে পর দিন ১৫ তারিখ অনেকেই রোজা রাখেন। এমনিতে কেউ চাইলে মাসের ১৫ তারিখ রোজা রাখতে পারে। কেননা, ১৫ তারিখ আইয়ামে বিজের অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে কেউ যদি ১৫ তারিখ রোজা রাখে, তাহলে সমস্যা নেই। আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'শাবানের ১৫ তারিখ রোজা রাখতে নিষেধ নেই। কেননা, ১৫ তারিখ হলো "আইয়ামে বিজ"-এর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেক মাসের এ তারিখে তো রোজা রাখা মুসতাহাব। এ ছাড়া রাসুল ﷺ বিশেষভাবে শাবানে রোজা রাখতে বলেছেন।'[৩৯৪]

কিন্তু আমাদের দেশে বেশিভাগ মানুষ ১৫ তারিখ রোজা রাখেন শবেবরাতের রোজা মনে করে। এ-সংক্রান্ত *ইবনু মাজাহর* একটি বর্ণনা দলিলস্বরূপ পেশ করা হয়। আলি রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

- إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

  শাবানের ১৪ তারিখ রাত তোমরা সালাত পড়ো, দিনে রোজা রাখো। কেননা, আল্লাহ তাআলা সে রাতের সূর্যাস্তের সময় দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন ও বলেন, আছ কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তোমাকে ক্ষমা করব। আছ কি কোনো রিজিক অন্বেষণকারী? আমি তোমাকে রিজিক প্রদান করব। আছ কি কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি তোমাকে উদ্ধার করব। এভাবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ডাকতে থাকেন।[৩৯৫]

শবেবরাতের সময় বেশিভাগ মসজিদের মিম্বারে হাদিসটি উচ্চারিত হয়। আলি রা.-এর সূত্রে বর্ণিত এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে অনেকেই শবেবরাত উপলক্ষ্যে

---

[৩৯৪] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ১৮৯।
[৩৯৫] *ইবনু মাজাহ* : ১৩৮৮।

রোজা রাখেন। এ জন্য হাদিসটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরছি।

প্রথম কথা হলো, হাদিসটি সহিহ নয়; দুর্বল। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হলো আবু বকর ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবি সাবরা আল মাদানি। ইমাম জাহাবি রাহ. তার ব্যাপারে বলেন, 'ইমাম বুখারি রাহ. ও অন্যান্য ইমাম তাকে দুর্বল বলেছেন।' আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ও সালিহ ইবনু আহমাদ তাঁদের পিতা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'সে হাদিস জাল করত।' ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন রাহ. বলেন, 'তার বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।'[৩৯৬]

ইমাম জাহাবি রাহ. তার থেকে বর্ণিত মুনকার বর্ণনাসমূহের মধ্যে এ হাদিস উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনু হিব্বান তার ব্যাপারে বলেন, 'সে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে জাল হাদিস বর্ণনা করত। তার সূত্রে বর্ণিত হাদিস লেখা জায়িজ নেই এবং কোনো অবস্থাতেই তার বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল দেওয়া যাবে না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাকে মিথ্যুক বলেছেন।'[৩৯৭]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. তার সম্পর্কে বলেন, 'তাকে হাদিস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। মুসআব বলেছেন, তিনি আলিম ছিলেন।'[৩৯৮] আলি ইবনুল মাদিনি রাহ. বলেন, 'হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সে জয়িফ তথা দুর্বল।' তিনি অন্যত্র বলেন, 'সে আপত্তিকর বর্ণনাকারী। আমার কাছে সে ইবনু আবি ইয়াহইয়ার মতো।'

ইমাম নাসায়ি বলেন, 'সে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।' ইমাম ইবনু আদি রাহ. বলেন, 'তার অধিকাংশ বর্ণনা মাহফুজ নয়। সে হাদিস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' ইমাম সাজি বলেন, 'সে আপত্তিকর বর্ণনাকারী।' হাকিম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরি বলেন, 'সে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে জাল হাদিস বর্ণনা করে। হিশাম ইবনু উরওয়া ও অন্যদের মতো।'[৩৯৯]

ইমাম ইবনু সাআদ রাহ. বলেন, 'হাদিস শোনা ও বর্ণনার জন্য তিনি অনেক সফর করেছেন। তিনি মদিনায় ফাতওয়া দিতেন।' ইমাম জাহাবি রাহ. বলেন, 'তিনি উঁচু মাপের ফকিহ ছিলেন। ইরাকের বিচারক ছিলেন। তবে স্মৃতিশক্তির কারণে তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল।'[৪০০]

---

[৩৯৬] *মিজানুল ইতিদাল* : ৪/৪১৪, জাহাবি।

[৩৯৭] *কিতাবুল মাজরুহিন* : ১/৩২৬।

[৩৯৮] *তাকরিবুত তাহজিব* : জীবনী নং-৭৩১২।

[৩৯৯] প্রাগুক্ত : ১২/৩২।

[৪০০] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/৩৭৪।

মোটকথা, অধিকাংশ ইমামের মতে ইবনু আবি সাবরা দুর্বল। কেউ কেউ তাকে হাদিস জালকারীও বলেছেন। এ জন্য তার বর্ণিত এ হাদিস হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বল। আল্লামা ইবনুল জাওজি রাহ. *আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহে* বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন, 'বর্ণনাটি সহিহ নয়।'[৪০১]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আলি রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসের প্রথম অংশের ভাবার্থ অনেক সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ, শাবানের ১৪ তারিখ রাতের ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু রোজার বিষয়টি শুধু আলি রা.-এর বর্ণনায় রয়েছে। এ ছাড়া হাদিসটি দুর্বল।

১৫ তারিখ যেহেতু আইয়ামে বিজের অন্তর্ভুক্ত, এ জন্য কেউ চাইলে সে দিন রোজা রাখতে পারে। আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলিও এমনটি বলেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আট. শবেবরাতে রিজিক ভাগ ও মৃত্যু-পরোয়ানা

আমাদের সমাজে শবেবরাত সম্পর্কে আরেকটি কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, শবেবরাতে প্রত্যেক মানুষের রিজিক ভাগ করা হয়। এ বছর কে কে মারা যাবে, সে সম্পর্কে শবেবরাতে পরোয়ানা জারি করা হয়। এর পক্ষে কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করা হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ○ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

> আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি সম্মানিত রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। [সুরা দুখান : ৩-৪]

কয়েকজন মুফাসসির এ আয়াতে উল্লিখিত সম্মানিত রাত দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন শবেবরাত। সে হিসেবে তারা বলেছেন, সে রাতে মানুষের রিজিক বণ্টন করা হয়। তাঁদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কেননা, কুরআনের অন্য আয়াতে স্পষ্টভাবে রমজানের কথা বলা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাফিজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির রাহ. বলেন, 'কেউ কেউ বলেন, সম্মানিত রাত দ্বারা উদ্দেশ্য শবেবরাত; যেমনটা বর্ণিত হয়েছে ইকরিমা থেকে। তবে এ মত বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। কেননা, কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সে রাত রমজানে। এ বিষয়ে মুগিরা ইবনু আখনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

---

[৪০১] *আল-ইলালুল মুতানাহিয়া* : ৩/৫৬১।

রাসুল ﷺ বলেন, "এক শাবান থেকে আরেক শাবান পর্যন্ত মানুষের আয়ু লেখা হয়।" বর্ণনাটি মুরসাল। এ ধরনের হাদিস কুরআনের নসের বিপরীতে আসার প্রশ্নই আসে না।'[৪০২]

হানাফি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ আল্লামা জাহিদ কাউসারি রাহ. বলেন, 'সালাবি রাহ. তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেছেন, সম্মানিত রাত দ্বারা উদ্দেশ্য শাবানের ১৪ তারিখ রাত। এটা তার কলমের স্খলন। কেননা, এমন ব্যাখ্যা কুরআনের নসের বিপরীত। কুরআনে বলা হয়েছে, সে সম্মানিত রাত রমজান মাসে। যদিও পরবর্তী কোনো কোনো মুফাসসির সালাবির মতো বলেছেন; কিন্তু সে বক্তব্য সঠিক নয়।'[৪০৩]

ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ. বলেন, 'আয়াতে উল্লিখিত বরকতপূর্ণ রাত দ্বারা কোন রাত উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন শবেবরাত উদ্দেশ্য। কেউ বলেন লাইলাতুল কদর। তাঁরা দলিল পেশ করেন, কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে বরকতপূর্ণ সে রাত রমজানে; আর লাইলাতুল বারাত তো রমজানে নয়।'[৪০৪]

মোটকথা, সুরা দুখানের এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, শবেবরাতে মানুষের রিজিক বণ্টন হয় এবং এ বছর কারা মারা যাবে, সেটা লেখা হয়।

এ সম্পর্কে আয়েশা সিদ্দিকার একটি হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করা হয়। শবেবরাত সম্পর্কে তাঁর হাদিস নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমি দেখিয়েছি, আয়েশা রা. থেকে বিভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণিত। উরওয়ার সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এ অংশটি রয়েছে। উরওয়ার পূর্ণ বর্ণনাটি হলো,

> هَل تدرين مَا هَذِه اللَّيْلة؟ يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ: مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ.
>
> রাসুল ﷺ আয়েশাকে বলেন, 'তুমি কি জানো, আজকে কোন রাত?' আয়েশা বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি জানি না।' রাসুল ﷺ তখন বলেন, 'এ রাতে আদমসন্তানের কে পৃথিবীতে আগমন করবে, সেটা

---

[৪০২] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৭/২৪৬।

[৪০৩] *মাকালাতুল কাওসারি* : ৫০।

[৪০৪] *আল-আরফুশ শাজ্জি* : *তিরমিজির* হিন্দুস্থানি নুসখার টীকা : ১/১৫৯।

লেখা হয়। কারা এ বছর মারা যাবে, সেটাও লেখা হয়। এ রাতে মানুষের আমল উপরে তোলা হয় এবং রিজিক বণ্টন করা হয়।'[৪০৫]

এর সনদ যে দুর্বল, এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে শুধু হাফিজ আহমাদ আল গুমারি রাহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। একটি অপরটির চেয়ে বেশি দুর্বল।'[৪০৬]

মোটকথা, শবেবরাতে মানুষের রিজিক বণ্টন হয়, এ বছর কারা মারা যাবে, কারা জন্ম লাভ করবে, এগুলো সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং এ ধরনের বিশ্বাস অবশ্যই পরিহার করা চাই। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

নয়. শবেবরাতে কবর জিয়ারত ও বাতি জ্বালানো

শবেবরাতে আমাদের সমাজের কিছু লোক সম্মিলিতভাবে কবর জিয়ারত করেন। অথচ শবেবরাতের ফজিলত-সংক্রান্ত যতগুলো বর্ণনা রয়েছে, কোথাও শবেবরাত উপলক্ষ্যে কবর জিয়ারতের কথা নেই। এমনিতে মৃতের কবর জিয়ারত ও দুআ যেকোনো সময় করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, জিয়ারত বিদআতমুক্ত এবং শরিয়তসম্মত পন্থায় হতে হবে। এ রাতে যদি কেউ কবর জিয়ারত করে, তাহলে অন্যান্য দিনের মতো করবে। তবে এ রাতে বিশেষ জিয়ারত করতে হবে, এ বিশ্বাস রাখা যাবে না।

আয়েশা রা.-এর বর্ণনায় আছে, তিনি রাসুল ﷺ-কে জান্নাতুল বাকিতে পেয়েছিলেন; কিন্তু রাসুল ﷺ জান্নাতুল বাকিতে একাকী গিয়েছিলেন। তিনি কাউকে যাওয়ার কথাও বলেননি। এ জন্য আয়েশার হাদিস দ্বারা সম্মিলিত কবর জিয়ারত প্রমাণিত করা যাবে না। আর বাতি জ্বালানো সম্পূর্ণ বানোয়াট। আমাদের গ্রাম-দেশের কুসংস্কার। কুরআন-হাদিসের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। শবেবরাত উপলক্ষ্যে বাতি জ্বালানো পরিষ্কার বিদআত। এমন আমল থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

দশ. শাবানে বেশি বেশি নফল রোজা রাখা

রাসুল ﷺ অন্য মাসের তুলনায় শাবানে বেশি রোজা রাখতেন। এ সম্পর্কে কিছু হাদিস রয়েছে।

---

[৪০৫] *মিশকাত* : ১৩০৫।

[৪০৬] *হুসনুল বায়ান* : ২১।

১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

আমি রাসুল ﷺ-কে রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পুরো মাস রোজা রাখতে দেখিনি। রাসুল ﷺ-কে শাবানের তুলনায় অন্য কোনো মাসে এত অধিক রোজা রাখতে দেখিনি।[৪০৭]

২. *সহিহ মুসলিমের* বর্ণনায় রয়েছে,

كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

রাসুল ﷺ শাবানের খুব কম দিন ব্যতীত বাকি সব দিন রোজা রাখতেন।[৪০৮]

৩. *সুনানু নাসায়ির* বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা রা. বলেন,

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.

রাসুল ﷺ শাবানের মতো অধিক রোজা বছরের অন্য কোনো মাসে রাখেননি। তিনি পুরো শাবান রোজা রাখতেন।[৪০৯]

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারকসহ আলিমগণের একটি দলের মতে, রাসুল ﷺ পুরো শাবান রোজা রাখেননি; বরং শাবানের অধিকাংশ দিন রোজা রেখেছেন। *মুসলিমে* বর্ণিত আয়েশার হাদিস দ্বারা এমনটি বোঝা যায়। এ ছাড়া অনেক রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসুল ﷺ রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে লাগাতার পুরো মাস রোজা রাখেননি।

৪. ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ.

রাসুল ﷺ শাবানে রমজান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে পুরো মাস কখনো রোজা রাখেননি।[৪১০]

মোটকথা, রাসুল ﷺ বেশি বেশি নফল রোজা রাখতেন। আমরাও চাইলে রাখতে পারি।

---

[৪০৭] *সহিহ বুখারি* : ১৯৬৯

[৪০৮] *সহিহ মুসলিম* : ১১৬৫।

[৪০৯] *সুনানু নাসায়ি* : ২১৮০।

[৪১০] *সহিহ বুখারি* : ১৯৭১।

অষ্টম অধ্যায়

রমজান : ১২ মাসের শ্রেষ্ঠ মাস

আরবি বর্ষপঞ্জিকার নবম মাস রমজান। ১২ মাসের শ্রেষ্ঠ মাস। এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ মাসের মৌলিক আমল দিনে রোজা ও রাতে তারাবি। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা খোদাভীরু হতে পারো। [সুরা বাকারা : ১৮৩]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

রমজান মাস, যে মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য স্পষ্ট দলিল হিসেবে। সুতরাং তোমাদের যে এ মাস পাবে, সে যেন রোজা রাখে। [সুরা বাকারা : ১৮৫]

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর ওপর। এর একটি রোজা। ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর ওপর—আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসুলের

রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া। সালাত কায়িম করা। জাকাত আদায় করা। হজ করা ও রমজানে সাওম পালন রাখা।[৪১১]

সাওম শব্দের অর্থ, বিরত থাকা। পরিভাষায় সাওম হলো, রোজা রাখার নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

রোজার নিয়ত-সংক্রান্ত কিছু মাসআলা রয়েছে, যেগুলো ফিকহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ জন্য এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করছি না। ফিকহের গ্রন্থাদিতে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। কেউ সেগুলো পড়লে জানতে পারবেন; অথবা বিশ্বস্ত কোনো আলিমের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

এক. রমজানে খুলে যায় জান্নাতের দরজা, বন্ধ করা হয় জাহান্নামের দ্বার

জান্নাত। শব্দটি রিমঝিম ধ্বনি তুলে মুসলমানের কানে। প্রত্যেক মুসলমানের ঈপ্সিত লক্ষ্য জান্নাত। শত খুনে যার হাত রাঙানো, সে-ও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন সে-ও হৃদয়ের গহীনে লালন করে। জাহান্নামের শাস্তির কথা শুনলে আঁতকে ওঠে। মাহফিলে গিয়ে বক্তার মুখে আল্লাহর রহমতের কথা শুনে তার অন্তরও আশান্বিত হয়ে ওঠে। পথ খোঁজার চেষ্টা করে, কীভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা যায়; শাস্তি ভোগ করা ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করা যায়!

মুসলমানের পরম আকাঙ্ক্ষিত জান্নাতের সবগুলো দরজা রমজানে খুলে দেওয়া হয় এবং বন্ধ করে দেওয়া হয় জাহান্নামের সব দরজা। বান্দার জন্য জান্নাতের দরজা দিয়ে নিজের প্রবেশ নিশ্চিত করার অনন্য সুযোগ এটা।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

যখন রমজান আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়; আর বন্ধ করে দেওয়া হয় জাহান্নামের দরজা। বেঁধে ফেলা হয় শয়তানদের।[৪১২]

---

[৪১১] *সহিহ বুখারি* : ৮; *সহিহ মুসলিম* : ১৬।

[৪১২] *সহিহ বুখারি* : ১৮৯৯।

২. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

রমজানের প্রথম তারিখে শয়তান ও দুষ্ট জিনদের বেঁধে রাখা হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয়, একটি দরজাও খোলা হয় না। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকে, 'কল্যাণের দিকে অগ্রসরমান ব্যক্তি, তুমি অগ্রসর হও। খারাপের দিকে ধাবমান ব্যক্তি, তুমি থামো। আল্লাহ তাআলা রমজানের প্রতিদিন অনেক জাহান্নামিকে মুক্তি দেন।'[৪১৩]

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

সম্মানিত মাস রমজান এসেছে। আল্লাহ তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করেছেন। এ মাসে খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজা। বন্ধ করে দেওয়া হয় জাহান্নামের দরজা। বেঁধে রাখা হয় দুষ্ট শয়তানদের। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যে রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এ রাত থেকে বঞ্চিত হলো, সে সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো।[৪১৪]

৪. আবু সায়িদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا تُغْلَقُ إِلَى آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ.

রমজানের প্রথম রাতেই আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। পুরো মাসে আর বন্ধ করা হয় না।[৪১৫]

৫. আনাস রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُغَلُّ فِيهِ

[৪১৩] *সুনানুত তিরমিজি* : ৬৮২; *সহিহু ইবনি খুজাইমা* : ১৮৮৩।

[৪১৪] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৮৯৫৯; *সুনানু নাসায়ি* : ২১০৬।

[৪১৫] *আল-মুজামুস সাগির* : ৩২৩, তাবরানি।

الشَّيَاطِينُ، بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، إِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ فَمَتَى.

এটি রমজান মাস। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানদের বেঁধে রাখা হয়। হতভাগা সেই লোক, যে রমজান পেল; কিন্তু নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না। যদি রমজানে না পারে, তাহলে আর কখন?[৪১৬]

৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ، وَسُلْسِلَتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ فِطْرٍ يَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ.

যখন রমজান আসে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। একটি দরজাও মাসের শেষ পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটি দরজাও মাসের শেষ পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয় না। এ মাসে দুষ্ট শয়তানদের বেঁধে রাখা হয়। আল্লাহ প্রত্যেক ইফতারের সময় অনেক জাহান্নামিকে মুক্তি দেন।[৪১৭]

রমজানে মানুষের চিরশত্রু শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়। খোলা থাকে জান্নাতের দরজা। বন্ধ থাকে জাহান্নামের দরজা। এ মাস মুমিনের জন্য সর্বোত্তম। কাফির ও মুনাফিকদের সবচেয়ে কষ্টের।

৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ، وَمَا يُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُونَ مِنْ غَفَلَاتِ النَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ، هُوَ غَنْمٌ الْمُؤْمِنُ يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ.

মুমিনের জন্য রমজানের মতো ভালো কোনো মাস আসতে পারে না। মুনাফিকদের জন্য রমজানের মতো কষ্টকর কোনো মাস আসতে পারে না। কেননা, এ মাসে মুসলমান ইবাদতের শক্তি অর্জন করে, মুনাফিক উদাসীন থাকে।[৪১৮]

---

[৪১৬] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৭৬২৭, তাবরানি।

[৪১৭] প্রাগুক্ত : ৮১৩৯।

[৪১৮] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৩৬৮।

দুই. শাবানের শেষে রাসুলের খুতবা

সাহাবিগণ এমনিতেই ছিলেন আমলের প্রতি যত্নবান। তারপরও রাসুল ﷺ তাঁদের রমজানের গুরুত্ব বোঝাতে শাবানের শেষ তারিখে একটি ভাষণ দেন।

সালমান রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ শাবানের শেষ তারিখে আমাদের উদ্দেশ করে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، قَالُوا: لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، فَقَالَ: يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ.

লোকসকল, তোমাদের কাছে সম্মানিত ও বরকতময় একটি মাস এসে উপস্থিত হয়েছে। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যে রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ এ মাসে রোজা ফরজ করেছেন এবং তারাবিকে সুন্নাত করেছেন। কেউ এ মাসে একটি নফল ইবাদত করলে আল্লাহ তাকে একটি ফরজ ইবাদতের সাওয়াব প্রদান করবেন। এ মাসে কেউ একটি ফরজ আদায় করলে আল্লাহ অন্য মাসে ৭০টি ফরজ আদায়ের সাওয়াব দান করবেন। এ মাস ধৈর্যের। আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এ মাস ভ্রাতৃত্বের। এ মাসে বৃদ্ধি করা হয় মুমিনের রিজিক। এ মাসে যে একজন রোজাদারকে ইফতার করাবে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। এ ছাড়া আল্লাহ তাকে রোজাদারের মতো সাওয়াব দান করবেন। এর দ্বারা রোজাদারের সাওয়াব কোনোভাবে কমবে না।

সাহাবিগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমাদের প্রত্যেকের তো এ পরিমাণ সামর্থ্য নেই যে, রোজাদারদের ইফতার করাব?' রাসুল ﷺ বলেন, 'কেউ যদি পানি অথবা খেজুরের একটা টুকরো দ্বারা রোজাদারকে ইফতার করায়, আল্লাহ তাকে এ প্রতিদান দেবেন। আর যে কোনো রোজাদারকে তৃপ্তিসহকারে ইফতার করাবে, আল্লাহ তাকে হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন; জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার আর পিপাসা লাগবে না। এ মাসের প্রথম দশক রহমতের, দ্বিতীয় দশক বরকতের; আর শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির।'[৪১৯]

তিন. রোজার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই

আল্লাহ বান্দাদের কিছু কাজের আদেশ দিয়েছেন, আবার কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাঁর আদেশকৃত কাজের জন্য বিভিন্ন প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন; কিন্তু রোজার জন্য আল্লাহ কোনো প্রতিদান ঘোষণা করেননি। আল্লাহ বলেন, আমি রোজার প্রতিদানদাতা।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

মানুষের প্রত্যেকটি আমলের প্রতিদান আমি প্রদান করে দিই রোজা ব্যতীত। মানুষ আমার জন্য রোজা রাখে এবং আমিই সেটার প্রতিদান দান করব। তোমাদের কেউ রোজা রাখলে সে যেন গালিগালাজ এবং হট্টগোল না করে। কেউ তাকে গালি দিলে কিংবা হত্যা করতে উদ্যত হলে সে যেন বলে, আমি হলাম রোজাদার।[৪২০]

এ হাদিস থেকে বুঝতে পারি, যেকোনো ভালোকাজের সাওয়াব আল্লাহ ১০ গুণ থেকে বৃদ্ধি করে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন; কিন্তু রোজার প্রতিদানদাতা আল্লাহ নিজে। তিনি নিজেই বান্দাকে রোজার প্রতিদান দেবেন। সুবহানাল্লাহ।

২. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ حَسَنَةَ ابْنِ آدَمَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا

[৪১৯] *সহিহু ইবনি খুজাইমা* : ১৮৮৭।

[৪২০] *মুসনাদু আহমদ* : ২৩৫৬।

الصَّوْمَ، وَالصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ، وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

বান্দার ভালোকাজের প্রতিদান আল্লাহ ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন, তবে রোজা ভিন্ন। কেননা, তা একান্তভাবে আমার জন্য। অতএব, আমিই (যেভাবে ইচ্ছা) এর প্রতিফল দেবো। রোজা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষবিধানের জন্য ইচ্ছা-বাসনা ও পানাহার পরিত্যাগ করেছে।

রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ। একটি ইফতারের সময়, আরেকটি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। রোজাদারের (ক্ষুধার কারণে সৃষ্ট) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধ।[৪২১]

৩. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন; আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

রোজা ছাড়া প্রত্যেক আমলের প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয়। কেননা, রোজা আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেবো।[৪২২]

৪. আবু সায়িদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ فَيْحِ الْمِسْكِ، قَالَ: صَامَ هَذَا مِنْ أَجْلِي، وَتَرَكَ شَهْوَتَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنْ أَجْلِي، فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়ে উত্তম। আল্লাহ বলেন, বান্দা রোজা রেখেছে আমার জন্য। আমার কারণে সে তার জৈবিক চাহিদা ও খাবার ছেড়েছে। রোজা আমার জন্য, আমিই সেটির প্রতিদান দেবো।[৪২৩]

৫. জাবির রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

রোজা ঢালস্বরূপ। এর দ্বারা বান্দা জাহান্নাম থেকে বাঁচবে। আল্লাহ বলেন, রোজা আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেবো।[৪২৪]

---

[৪২১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৪২৫৬।

[৪২২] প্রাগুক্ত : ১০০২৫।

[৪২৩] প্রাগুক্ত : ১১৩৫৯।

[৪২৪] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫০৭৭।

৬. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

الصيام لي وأنا أجزي به. وبمحلوف رسول الله ﷺ : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك فأيما امرئ منكم أصبح صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن إنسان قاتله فليقل: إني صائم فإن لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصوام.

আল্লাহ বলেছেন, বান্দা রোজা রাখে আমার জন্য। আমিই এর প্রতিদান দেবো। রোজাদারদের (ক্ষুধার কারণে সৃষ্ট) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধ। তোমাদের কেউ যদি রোজা রাখে, তাহলে সে যেন অশ্লীল কাজ ও ঝগড়া না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা ঝগড়া সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে, আমি রোজাদার। কেননা, কিয়ামতের দিন সে পান করবে হাউজে কাওসার থেকে।[৪২৫]

চার. যে রমজান পেয়েও গুনাহ মাফ করাতে পারল না, সে হতভাগা

পূর্বের আলোচনা থেকে পাঠক অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, রমজান মাস কল্যাণ ও বরকতের বসন্তকাল। এ জন্য এ মাসে আমল দ্বারা মুমিনগণ জান্নাতে তাদের আবাসস্থল বানিয়ে নেবে। এ ছাড়া তাওবা করে নিজের অতীতের গুনাহ আল্লাহর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেবে। কারণ, রমজানেই এর সুবর্ণ সুযোগ। রমজান পেয়েও যদি কেউ সে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারে, নিজের গুনাহ মাফ করাতে না পারে, সে প্রকৃত হতভাগা।

১. কাব ইবনু উজরা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

احْضَرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِينَ ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: آمِينَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يغْفَرْ لَهُ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْت عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ: آمِينَ.

তোমরা মিম্বারের কাছে এসো। আমরা এলাম। তিনি যখন একটি সিঁড়িতে

---

[৪২৫] *মুসনাদু বাজ্জার* : ৮১১৫।

উঠলেন, তখন বললেন, 'আমিন'। দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠার সময়ও বললেন, 'আমিন'। তৃতীয় সিঁড়িতে উঠার সময়ও বললেন, 'আমিন'।

রাসুল ﷺ মিম্বার থেকে নামলে আমরা বলি, 'আল্লাহর রাসুল, আজকে আপনার থেকে এমনকিছু শুনেছি, যা আগে শুনিনি।' তিনি বললেন, 'জিবরিল আ. আমার কাছে এসে বলেছেন, "যে রমজান মাস পেয়েও তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না, সে হতভাগা।" তখন আমি বলি "আমিন"। দ্বিতীয় সিঁড়িতে জিবরিল বলেছেন, "যার সামনে আমার নাম পাঠ হলো; কিন্তু সে আমার ওপর দুরুদ পড়ল না, সে হতভাগা।" আমি বলি, "আমিন"। তৃতীয় সিঁড়িতে জিবরিল বললেন, "যে তার পিতা-মাতাকে অথবা উভয়ের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; কিন্তু জান্নাত অর্জন করতে পারল না, সে হতভাগা।" আমি বলি, "আমিন"।'[৪২৬]

২. মালিক ইবনু হুয়াইরিস পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন,

صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخْرَى فقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فقَالَ آمِينَ ثُمَّ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ فقَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمين.

একবার রাসুল ﷺ একটি সিঁড়িতে উঠে বলেন, 'আমিন'। দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠার সময়ও বললেন, 'আমিন'। তৃতীয় সিঁড়িতে উঠার সময়ও বললেন, 'আমিন'।

রাসুল ﷺ মিম্বার থেকে নামলে আমরা বলি, 'আল্লাহর রাসুল, আজকে আমরা আপনার থেকে এমনকিছু শুনেছি, যা আগে শুনিনি।' তিনি বললেন, 'জিবরিল আ. আমার কাছে এসে বললেন, "যে রমজান মাস পেল; কিন্তু তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না, সে হতভাগা।" আমি বলি, "আমিন"। দ্বিতীয় সিঁড়িতে জিবরিল বলেছেন, "যার সামনে আমার নাম পড়া হলো; কিন্তু সে আমার ওপর দুরুদ পড়ল না, সে হতভাগা।" আমি বলি, "আমিন"। তৃতীয় সিঁড়িতে জিবরিল বললেন, "যে তার পিতা-মাতাকে অথবা উভয়ের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; কিন্তু জান্নাত অর্জন করতে পারল না, সে

[৪২৬] *আল-মুসতাদরাক*: ৭২৫৬।

হতভাগা।" আমি বলি, "আমিন"।'[৪২৭]

৩. জাবির ইবনু সামুরা রা. বর্ণনা করেন,

صعد النبي ﷺ المنبر فقال: آمين آمين آمين فلما نزل سئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له قل: آمين قلت: آمين ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين ورغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له أو لا يدخلانه الجنة آمين قلت آمين.

একবার রাসুল ﷺ একটি মিম্বারে উঠার সময় তিনবার 'আমিন' বললেন। তিনি যখন মিম্বার থেকে নামলেন, তখন তাঁকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'আমার কাছে জিবরিল আ. এসে বললেন, "ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক, যে রমজান পেল; কিন্তু নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না।" তিনি আমাকে বললেন, "আপনি বলুন আমিন।" তখন আমি বলি, "আমিন"। এরপর জিবরিল আ. ওই ব্যক্তির জন্য বদদুআ করেছেন, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো; কিন্তু সে দুরুদ পড়ল না। (সে ধ্বংস হোক) তিনি আমাকে বললেন, "আপনি বলুন, আমিন।" আমি বলি, "আমিন"। ওই ব্যক্তির নাকও ধুলোয় ধূসরিত হোক, যে তার মা-বাবা অথবা দুজনের একজনকে পেল; কিন্তু সে জান্নাত অর্জন করতে পারল না। জিবরিল আমাকে "আমিন" বলতে বলেন। আমি "আমিন" বলে তাঁর দুআ সমর্থন করেছি।'[৪২৮]

৪. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. থেকে একটু ভিন্ন শব্দে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন; রাসুল ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُمْهُ فَقَدْ شَقِيَ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُ فَقَدْ شَقِيَ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ.

যে রমজান পেল; কিন্তু রোজা রাখল না, সে দুর্ভাগা। যে তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা একজনকে পেল; কিন্তু তাদের সেবা করল না, সে দুর্ভাগা। যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো; কিন্তু দুরুদ পড়ল না, সে দুর্ভাগা।[৪২৯]

উল্লিখিত হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট হলো, রমজান মুসলমানদের গুনাহ মাফ করানোর মাস। এ মাসে যদি কেউ নিজের গুনাহ মাফ করাতে না পারে, তাহলে

[৪২৭] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪০৯।

[৪২৮] *মুসনাদু বাজ্জার* : ৪১৭৭।

[৪২৯] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৩৮৭১, তাবরানি।

জিবরিল আ. তার ব্যাপারে বদদুআ করেছেন। রাসুল ﷺ তখন 'আমিন' বলে তাঁর দুআ সমর্থন করেছেন। এ জন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে, রমজানের অফুরন্ত এই সুযোগ ভালোভাবে কাজে লাগানো।

পাঁচ. রমজানের বিশেষ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ، لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ: خلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، وَيُزَيِّنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَئُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ.

আমার উম্মতকে রমজানে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোনো উম্মতকে দেওয়া হয়নি—রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়েও উত্তম। ইফতার পর্যন্ত রোজাদারের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রমজানের প্রত্যেক দিন আল্লাহ জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন এবং বলেন, 'আমার পুণ্যবান বান্দাগণ তাদের কষ্টের বিনিময় পাবে।' এ মাসে দুষ্ট শয়তানদের বেঁধে রাখা হয়। অন্য মাসের মতো এ মাসে তারা মানুষদের বিভ্রান্ত করতে পারে না। এ মাসের শেষ রাতে আল্লাহ বান্দাদের ক্ষমা করে দেন।

রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'শেষ রাত দ্বারা কি লাইলাতুল কদর উদ্দেশ্য?' তিনি বললেন, 'না, শ্রমিককে কাজের প্রতিদান দেওয়া হয়, যখন তার কাজ শেষ হয়।'[৪৩০]

২. জাবির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: أَمَّا وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ

[৪৩০] *মুসনাদু আহমাদ*: ৭৯১৭।

رِيحِ الْمِسْكِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا: اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: لَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُفُّوا أُجُورَهُمْ.

আমার উম্মতকে রমজানে পাঁচটি এমন বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোনো উম্মতকে দেওয়া হয়নি—প্রথম বৈশিষ্ট্য, রমজানের প্রথম রাতে আল্লাহ সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান; আর আল্লাহ যার দিকে তাকান, তাকে কখনো শাস্তি দেন না। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়ে উত্তম। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, রোজাদারের জন্য প্রত্যেক দিন ও রাতে ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ জান্নাতকে বলেন, 'তুমি আমার বান্দাদের জন্য সুসজ্জিত হও; তারা যেন দুনিয়ার ক্লেশ পেছনে ফেলে তোমার কাছে এসে বিশ্রাম নেয়।' পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, রমজানের শেষ রাতে আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

তখন একব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, 'আল্লাহর রাসুল, শেষ রাত দ্বারা কি লাইলাতুল কদর উদ্দেশ্য?' তিনি বললেন, 'না, শ্রমিককে কাজের প্রতিদান দেওয়া হয়, যখন তার কাজ শেষ হয়।'[৪৩১]

ছয়. রমজান : মুক্তহস্তে দান করার মাস

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রমজানে যদি কেউ একটি নফল ইবাদত করে, তাহলে আল্লাহ তাকে একটি ফরজ আদায়ের সাওয়াব দেন। যদি কেউ একটি ফরজ আদায় করে, আল্লাহ তাকে ৭০টি ফরজ আদায়ের সাওয়াব দেন। আর অভাবগ্রস্ত মানুষদের অভাব দূর করা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভালোকাজের অন্যতম।

১. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেছেন;

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[৪৩১] *ফাজায়িলুল আওকাত* : ৩৬, বায়হাকি।

মুসলমান মুসলমানের ভাই। যে কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। যে কোনো মুসলমানের একটি প্রয়োজন পূর্ণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার একটি প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়মতের দিন তার দোষ গোপন রাখেন।[৪৩২]

২. মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছিল রাসুলের স্বভাবজাত অভ্যাস। তিনি ছিলেন সবার সুখ-দুঃখের সাথি। রাসুল ﷺ তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী সবাইকে সাহায্য করতেন। এ জন্য জিবরিল আ. রাসুলের কাছে প্রথমে ওহি নিয়ে আসার পর রাসুল ﷺ যখন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন, তখন বাড়িতে এসে খাদিজা রা.-কে বলেছিলেন, 'আমি আমার প্রাণনাশের ভয় করছি।' খাদিজা রা. তাঁকে আস্বস্ত করে বলেছিলেন,

كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। অনাথ-নিঃস্বদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। ইয়াতিমদের সাহায্য করেন। মেহমানের মেহমানদারি করেন। মাজলুমকে সাহায্য করেন।[৪৩৩]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসুল ﷺ নবুওয়াতলাভের পূর্ব থেকে এসব গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। তবে রমজানে তিনি অন্য মাসের চেয়ে বেশি দান করতেন।

৩. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَد مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

রাসুল ﷺ মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। রমজানে যখন জিবরিল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, রাসুল ﷺ আরও বেশি দান করতেন। জিবরিল আ. তাঁর সঙ্গে রমজানের প্রতিরাতে দেখা করতেন এবং একে অপরের সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। দানশীলতার ক্ষেত্রে রাসুল

[৪৩২] *সহিহ বুখারি* : ২৪৪২।

[৪৩৩] প্রাগুক্ত : ৩।

ﷺ প্রবহমান বাতাসের চেয়ে বেশি অগ্রগামী।[৪৩৪]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রাহ. বলেন, 'এ হাদিসে কিছু শিক্ষা রয়েছে। একটি হলো, সবসময় দানের প্রতি উৎসাহ প্রদান। আরেকটি হলো, অন্য সময়ের তুলনায় রমজানে বেশি বেশি দান করা। আরও একটি হলো, এ মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা।'[৪৩৫]

রাসুলের দানশীলতা সবার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। জাবির রা. বর্ণনা করেন, রাসুলের কাছে কোনোকিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো না করেননি।

৪. জাবির রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ আমাকে বলেছেন,

لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ

যদি বাহরাইনের সমুদয় সম্পদ আমার কাছে আসে, তাহলে আমি এভাবে এভাবে দান করব।[৪৩৬]

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিত সামর্থ্য অনুযায়ী রমজানে দান করা।

সাত. রমজান : গুনাহ মাফের অফুরন্ত সুযোগ

রমজানে আল্লাহ অগণিত গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমা করেন। অসংখ্য জাহান্নামিকে মুক্তি দেন। এ-সংক্রান্ত অনেক হাদিস রয়েছে। কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করছি :

১. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে রমজানে ইমান ও সাওয়াবের আশায় রোজা রাখবে, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। যে রমজানে ইমান ও সাওয়াবের আশায় তারাবি পড়বে, আল্লাহ তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। যে ইমান ও সাওয়াবের আশায় শবেকদরে ইবাদত করবে, আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেবেন।[৪৩৭]

---

[৪৩৪] *সহিহ বুখারি* : ৫।

[৪৩৫] *ফাতহুল বারি* : ১/৪০।

[৪৩৬] *সহিহ বুখারি* : ২২৯৬।

[৪৩৭] *সহিহ বুখারি* : ৩৮; *সহিহ মুসলিম* : ১৮১৭।

এ ছাড়া রোজার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ফজিলত হচ্ছে, জান্নাতে রোজাদারদের জন্য আলাদা একটি দ্বার থাকবে, যে দ্বার দিয়ে শুধু রোজাদারগণ প্রবেশ করবে।

২. সাহল ইবনু সাআদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُون

বেহেশতে আটটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়ান', যে দরজা দিয়ে কেবল রোজাদারগণ প্রবেশ করবে।[৪৩৮]

আট. রোজা মানুষের জন্য সুপারিশ করবে

১. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَيُشَفَّعَانِ.

রোজা ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, 'হে প্রভু, আমি তাকে খাবার ও জৈবিক চাহিদা থেকে দিনের সময় বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।' কুরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।' তখন উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[৪৩৯]

২. আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ لِلهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

আল্লাহ রমজানের প্রত্যেক দিন ও রাতে অনেককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। রমজানের প্রত্যেক দিনে এমন সময় রয়েছে, যখন দুআ কবুল হয়।[৪৪০]

নয়. শবেকদর : হাজার মাসের শ্রেষ্ঠ রাত

পবিত্র কুরআন আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন শবেকদরে। শবেকদর এমন একটি রাত, যে রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ বলেন,

---

৪৩৮ *সহিহ বুখারি* : ৩২৫৭।

৪৩৯ *শুআবুল ঈমান* : ১৯৯৪; *আল-মুসতাদরাক* : ২০৩৬।

৪৪০ *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৪৫০।

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি শবেকদরে। শবেকদর সম্পর্কে আপনি কী জানেন? শবেকদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাতে জিবরিল ও অন্যান্য ফেরেশতা প্রত্যেক কাজের জন্য অবতীর্ণ হন তাঁদের পালনকর্তার নির্দেশে। শান্তিই শান্তি, সে রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত। [সুরা কাদর]

এই সুরার শানে নুজুল প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মুফাসসির মুজাহিদ রাহ. বলেন, 'রাসুল ﷺ বনি ইসরাইলের একব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে ১ হাজার মাস আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। সাহাবিগণ সেটি শুনে বেশ অবাক হন। আল্লাহ তখন এ সুরা অবতীর্ণ করেন।'[৪৪১]

১. আলি ইবনু উরওয়া রা. বর্ণনা করেন,

ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا أَرْبَعَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عَبَدُوا اللهَ ثَمَانِينَ عَامًا، لَمْ يَعْصوه طَرْفَةَ عَيْنٍ: فَذَكَرَ أَيُّوبَ، وَزَكَرِيَّا، وحزْقيل بْنَ الْعَجُوزِ، وَيُوشَعَ بْنَ نُونٍ. قَالَ: فَعَجِبَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَجِبَتْ أُمَّتُكَ مِنْ عِبَادَةِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ ثَمَانِينَ سَنَةً، لَمْ يَعْصُوه طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ فَقَدَ أَنْزَلَ اللهُ خَيْرًا مِنْ ذلِكَ. فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ هَذَا أَفْضَلُ مِمَّا عَجِبْتَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ. قَالَ: فَسُرَّ بِذلِكَ رَسُول اللهِ ﷺ وَالنَّاس مَعَهُ.

রাসুল ﷺ একদিন বনি ইসরাইলের চারজন লোকের কথা উল্লেখ করেন, যারা ৮০ বছর একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করেছে। এরপর তিনি আইয়ুব আ., জাকারিয়া আ., হিজকিল আ. ও ইউশা ইবনু নুন আ.-এর কথা উল্লেখ করেন।

সাহাবিগণ তাঁদের ইবাদতের কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হন। তখন জিবরিল আ. এসে বলেন, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি কি ওই লোকদের ৮০ বছরের ইবাদতের

[৪৪১] *তাফসিরু ইবনি জারির তাবারি*: ৩০/২৮৪।

জন্য অবাক হচ্ছেন? আল্লাহ আপনাদের এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করেছেন। এরপর তিনি 'কাদর' তিলাওয়াত করে বলেন, শবেকদরের ইবাদত ৮০ বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।' রাসুল ﷺ তখন খুবই আনন্দিত হলেন।[৪৪২]

শবেকদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ জন্য শবেকদর যে কাজে লাগাতে পারল না, তাকে রাসুল ﷺ হতভাগা বলেছেন।

২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত,

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ.

একবার রমজানের শুরুতে রাসুল ﷺ বললেন, 'মহিমান্বিত এক মাস এসেছে তোমাদের কাছে। এ মাসে এমন এক রাত আছে, যে রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এ রাত থেকে বঞ্চিত হলো, সে সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো; আর হতভাগা ছাড়া কেউ এ রাত থেকে বঞ্চিত হয় না।'[৪৪৩]

১. শবেকদর : রমজানের শেষ দশকে

পুরো রমজানে রাসুল ﷺ আল্লাহর ইবাদত অনেক বেশি করতেন; কিন্তু শেষ দশকে তিনি প্রথম দুই দশকের চেয়ে বেশি ইবাদত করতেন। রাত জাগতেন।

১. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

রমজানের শেষ দশকে রাসুল ﷺ পরিবারকে সতর্ক করতেন। রাত জাগতেন এবং পরিবারকে জাগিয়ে রাখতেন।[৪৪৪]

২. *সহিহ মুসলিমের* বর্ণনায় রয়েছে; আয়েশা রা. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

রাসুল ﷺ রমজানের শেষ দশকে অধিক ইবাদত করতেন, যা তিনি অন্য সময় করেন না।[৪৪৫]

---

৪৪২ *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৪/৪৪৩।

৪৪৩ *ইবনু মাজাহ* : ১৬৪৪।

৪৪৪ *সহিহ বুখারি* : ২০২৪

৪৪৫ *সহিহ মুসলিম* : ১১৭৫

রাসুল ﷺ রমজানের শেষ দশকে ইবাদত বেশি করতেন। কারণ, শেষ দশকের বেজোড় কোনো এক রাত শবেকদর, যে রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ ছাড়া রাসুল ﷺ রমজানের শেষ দশকে শবেকদর অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

তোমরা রমজানের শেষ দশকে শবেকদর অনুসন্ধান করো।[৪৪৬]

৪. আয়েশার অপর বর্ণনায় রয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

তোমার রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে শবেকদর অনুসন্ধান করো।[৪৪৭]

শবেকদর যে রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতের যেকোনো এক রাতে, এ সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে।

৫. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى.

তোমরা শবেকদর অনুসন্ধান করো রমজানের শেষ দশকে—নবম, সপ্তম ও পঞ্চম তারিখে।[৪৪৮]

৬. আবু বাকরা রা.-এর কাছে শবেকদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

مَا أَنَا مُلْتَمِسُهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: التَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي ثَلاَثِ أَوَاخِرِ لَيْلَةٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلاَتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ اجْتَهَدَ.

আমি রমজানের শেষ দশকে শবেকদর অনুসন্ধান করতে রাসুল ﷺ থেকে শুনেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা শবেকদর অনুসন্ধান করো ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে।'

---

[৪৪৬] *সহিহ বুখারি* : ২০২০

[৪৪৭] প্রাগুক্ত : ২০১৭

[৪৪৮] প্রাগুক্ত : ২০২১।

বর্ণনাকারী বলেন, 'আবু বাকরা রা. রমজানের প্রথম ২০ দিন সারা বছরের মতো সালাত পড়তেন; কিন্তু যখন শেষ দশক আসত, তখন বেশি সালাত পড়তেন।'[৪৪৯]

৭. আবু সায়িদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ وَسَبْعٍ يَبْقَيْنَ وَخَمْسٍ يَبْقَيْنَ وَثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ.

তোমরা শবেকদর অনুসন্ধান করো রমজানের শেষ দশকের ২১, ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখে।[৪৫০]

২. ২৭ রমজান কি শবেকদর

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, রমজানের ২৬ তারিখ রাত শবেকদর। এ জন্য ওই রাতে অনেক মসজিদে বেশ ঘটা করে বয়ান করা হয়। কেউ কেউ শুধু ওই তারিখের পুরো রাত জেগে মনে করেন, হাজার বছর থেকে শ্রেষ্ঠ রাত পেয়ে গেছেন; অথচ নিশ্চিতভাবে ২৬ তারিখ রাতকে শবেকদর মনে করা ভুল। তবে রাসুল ﷺ যেহেতু রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে শবেকদর অনুসন্ধান করতে বলেছেন, এ জন্য ২৭ তারিখের রাতেও শবেকদর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উমর রা.-সহ অনেকে বলেছেন, ২৭ তারিখ শবেকদর হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। কিনান ইবনু আবদিল্লাহ আন নাহমি বলেন, 'আমি জির ইবনু হুবায়শকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উমর, হুজায়ফা রা.-সহ রাসুলের অনেক সাহাবি সন্দেহাতীতভাবে বলেছেন, শবেকদর ২৬ তারিখ রাত।'[৪৫১]

এ ছাড়া উবাই ইবনু কাআব রা. বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, শবেকদর ২৬ তারিখ রাত। তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, এ রাতের ব্যাপারে আমার জানা সবচেয়ে বেশি। রাসুল ﷺ আমাদের ২৬ তারিখ রাতে সালাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'[৪৫২]

এ ছাড়া ২৭ তারিখ শবেকদর হওয়ার পক্ষে আরও অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, 'কেউ কেউ ২৭ তারিখ শবেকদর

---

[৪৪৯] *সুনানুত তিরমিজি* : ৭৯৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ২০৪০২।

[৪৫০] *মুসনাদু আহমাদ* : ১১৬০৭।

[৪৫১] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৯৬০৭।

[৪৫২] *সহিহ মুসলিম* : ৭৬২।

হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরি কুফাবাসীদের থেকে এমন মত উল্লেখ করেছেন।' এরপর জির ইবনু হুবায়শের হাদিস উল্লেখ করে বলেন, 'ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইসহাক এমন মত প্রকাশ করেছেন।'

কত তারিখে শবেকদর? এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. কয়েকটি মতের কথা লিখেছেন। এ জন্য ২৭ তারিখ শবেকদর, এটা দৃঢ়ভাবে বলার সুযোগ নেই। তবে হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। বান্দার জন্য উচিত, শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকা। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

দশ. তারাবি : রমজানের অন্যতম আমল

রমজানের বিশেষ আমলের মধ্যে অন্যতম হলো তারাবির সালাত।

১. রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে রমজানে ইমান ও সাওয়াবের আশায় রোজা রাখবে, আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। যে রমজানে ইমান ও সাওয়াবের আশায় তারাবি পড়বে, আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেবেন। যে ইমান ও সাওয়াবের আশায় শবেকদরে ইবাদত করবে, আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেবেন।[৪৫৩]

রাসুল ﷺ প্রথমে কয়েকদিন জামাআতের সঙ্গে তারাবি পড়েছিলেন; কিন্তু জামাআতে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকলে এবং তারাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে রাসুল ﷺ তখন উম্মতের সহজতার জন্য তারাবির সালাত মসজিদে জামাআতের সঙ্গে পড়েননি; বরং একাকী ঘরে পড়েছেন।

২. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন;

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

[৪৫৩] *সহিহ বুখারি* : ৩৮; *সহিহ মুসলিম* : ১৮১৭।

فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَ.

রাসুল ﷺ এক রাতের মধ্যভাগে বের হন। এরপর মসজিদে সালাত পড়েন। কিছু সাহাবিও তাঁর সঙ্গে সালাত পড়েন। সকালে সাহাবিগণ পরস্পর এ সালাত নিয়ে কথা বলেন। পরদিন আরও বেশি মানুষ সমবেত হন। রাসুলের সঙ্গে তারা সালাত পড়েন। তৃতীয় দিন আগের দিনের চেয়ে বেশি মানুষ রাসুলের সঙ্গে সালাত পড়েন। চতুর্থ দিন মসজিদ ভরে গেল। রাসুল ﷺ একেবারে ফজরের সালাতের জন্য বের হন। নামাজান্তে তিনি বলেন, 'আমি জায়গা সংকুলান নিয়ে ভয় করছি না; বরং ভয় করছি, তোমাদের ওপর এ সালাত ফরজ করে দেওয়া হয় কি না।'[৪৭৪]

আবু বকর ও উমর রা.-এর খিলাফতের শুরুতে লোকজন এভাবে যে যার মতো বিক্ষিপ্তভাবে তারাবির সালাত আদায় করতেন; কিন্তু এখন যেহেতু ফরজ হওয়ার ভয় নেই, তাই উমর রা. বিক্ষিপ্ত জামাআতগুলো উবাই ইবনু কাআব রা.-এর ইমামতিতে একত্র করে দেন।[৪৫৫]

৩. আবদুর রাহমান ইবনু আবদিল কারি রা. বর্ণনা করেন,

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ.

আমি উমরের সঙ্গে রমজানের একরাতে মসজিদের দিকে বের হই। তখন লোকেরা কেউ কেউ একাকী সালাত পড়ছিল, আবার কেউ কেউ ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সালাত পড়ছিল। উমর রা. বললেন, 'আমি যদি সবাইকে এক ইমামের পেছনে একত্র করে দিই, কতই-না ভালো হয়।' এর পর তিনি সবাইকে উবাই ইবনু কাআব রা.-এর ইমামতিতে একত্রিত করে দেন।

---

[৪৫৪] *সহিহ বুখারি* : ৯২৪।

[৪৫৫] প্রাগুক্ত : ২০১০।

বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমি আরেক রাতে উমরের সঙ্গে বের হই। লোকেরা তখন এক ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছিল। উমর রা. তখন বলেন, 'কতই-না উত্তম কাজ এটি'।[৪৫৬]

এগারো. তারাবির রাকআত

তারাবির সালাত ২০ রাকআত, এটিই গ্রহণযোগ্য। সাহাবি, তাবিয়িনের স্বর্ণযুগ থেকে গোটা মুসলিম দুনিয়ায় তারাবির সালাত ২০ রাকআত পড়া হচ্ছে।

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের নাপাক কদম পড়ার আগ পর্যন্ত তারাবির রাকআত নিয়ে এত ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। ছিল না পরস্পর লিফলেটবাজি। বর্তমানে কিছু ভাই জোরগলায় প্রচার করছেন, ২০ রাকআত তারাবি রাসুল ﷺ পড়েননি! এ ছাড়া ২০ রাকআত তারাবি-সংক্রান্ত যতগুলো বর্ণনা রয়েছে, সব জাল! সহিহ হাদিসের আলোকে তারাবির সালাত মাত্র ৮ রাকআত!

এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই, তাই সংক্ষিপ্তভাবে শুধু ২০ রাকআতের দলিল নিয়ে আলোচনা করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে মুহাদ্দিসুল কাবির আল্লামা হাবিবুর রাহমান আজমির লিখিত ও অধমের অনূদিত *তারাবির সালাত: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা* গ্রন্থটি পড়তে পারেন। ১৩৭৭ হিজরিতে এটি প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি সাহাবি যুগ থেকে শুরু করে লা-মাজহাবিদের এমন অসার মত প্রকাশের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে ১২০০ বছরের আমলে মুতাওয়ারাস—উম্মাহর সম্মিলিত অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা—এক এক শতাব্দী করে দেখিয়েছেন যে, তারাবির সালাত ৮ রাকআতে সীমাবদ্ধ রাখা ও ২০ রাকআতের ওপর আপত্তি পেছনের শতাব্দীতে কেউ করেনি। হাবিবুর রাহমান আজমি রাহ.-এর গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার বহু বছর হয়ে গেছে; কিন্তু আজও ২০ রাকআত অস্বীকারকারী কেউ এর খণ্ডন করতে পারেনি।

১. রাসুল ﷺ ২০ রাকআত পড়েছেন

পূর্বে আলোচনা করেছি, রাসুল ﷺ মাত্র তিন দিন তারাবির সালাত জামাআতের সঙ্গে মসজিদে পড়েছেন। উম্মতের ওপর যাতে এ সালাত ফরজ না হয়ে যায়, এ জন্য বাকি সময় তিনি ঘরে একাকী পড়েছেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাই, রাসুল ﷺ তারাবির সালাত ২০ রাকআতই পড়তেন।

---

[৪৫৬] প্রাগুক্ত : ২০১০।

ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ.

রাসুল ﷺ রমজানে ২০ রাকআত তারাবি এবং বিতর পড়তেন।[৪৫৭]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসের একজন বর্ণনাকারী ইবরাহিম আবু শায়বা, তিনি দুর্বল।'[৪৫৮]

ইবরাহিম আবু শায়বাকে অনেকেই জয়িফ বলেছেন। কয়েকজন ইমাম তাঁকে বিশ্বস্তও বলেছেন। ইমাম ইবনু আদি বলেন, 'তাঁর হাদিস গ্রহণযোগ্য। তিনি ইবরাহিম ইবনু আতিয়া থেকে উত্তম।' ইয়াজিদ ইবনু হারুন বলেন, 'তিনি তাঁর যুগের ইনসাফকারী বিচারক।'[৪৫৯]

ধরে নিলাম ইবরাহিম জয়িফ, তারপরও হাদিসটি গ্রহণযোগ্য। কারণ, খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে ২০ রাকআতের আমল চলে আসছে। তা ছাড়া কোনো জয়িফ হাদিসের পক্ষে যদি আমলে মুতাওয়ারাস তথা উম্মাহর সম্মিলিত অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা পাওয়া যায়, তাহলে সে জয়িফ হাদিস সহিহ এমনকি মুতাওয়াতিরের পর্যায়েও চলে যায়। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরছি :

ইমাম জারকাশি রাহ. বলেন, 'জয়িফ হাদিসকে যখন উম্মত গ্রহণ করে নেবে, তখন সে হাদিসের ওপর আমল করা হবে সহিহ হাদিসের মতো। এমনকি সেটা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে চলে যায়। এর দ্বারা অকাট্য কোনো বিধানও রহিত হয়ে যায়।'[৪৬০]

ইবনুল কাইয়িম রাহ. একটি হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'যদিও এ হাদিস প্রমাণিত নয়; কিন্তু সমস্ত শহরে কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়া এ বিষয়ে আমল চলে আসা এ হাদিসের ওপর আমল করার জন্য যথেষ্ট।'[৪৬১]

হাফিজ জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি সহিহ বলা হবে, যখন ওই হাদিসকে উম্মত কবুল করে নেবে। যদিও সে হাদিসের সহিহ কোনো সনদ না থাকে।'[৪৬২]

ইমাম সাখাবি রাহ. বলেন, 'অনুরূপ উম্মত যখন কোনো জয়িফ হাদিস গ্রহণ করে

---

[৪৫৭] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৭৭৭৪।

[৪৫৮] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫০১৮।

[৪৫৯] তাঁর বিস্তারিত জীবনী দেখুন, *আল-কামিল* : ১/৩৮৯-৩৯২; *তাহজিবুত তাহজিব* : ১/১৪৪; *ইলাউস সুনান* : ৭/৮২।

[৪৬০] *আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ* : ১/৩৯০, জারকাশি।

[৪৬১] *কিতাবুর রুহ* : ১৯।

[৪৬২] *তাদরিবুর রাবি* : ১/৪২।

নেয়, তখন সঠিক কথা হলো, সেই হাদিস অনুযায়ী আমল করা যায়। এমনকি হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং তা দ্বারা অকাট্য বিষয়ও রহিত হয়ে যায়।'[৪৬৩]

হাদিসশাস্ত্রের এ-সকল ইমামের বক্তব্য থেকে আশা করি পাঠক বুঝতে পেরেছেন যে, রাসুলের ২০ রাকআত তারাবি পড়া-সংক্রান্ত ইবনু আব্বাসের বর্ণনা সনদের দিক থেকে যদিও জয়িফ; কিন্তু আমলে মুতাওয়ারাসের কারণে সেটি সহিহ।

জয়িফ হাদিস সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা তুলে ধরা হলো। এ সম্পর্কে কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে আল্লামা আবদুল হাই লখনবি লিখিত ও শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. তাহকিককৃত *আল-আজওয়িবাতুল ফাজিলাহ*র ৪৩-৫০ নম্বর পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করতে পারেন। সেখানে এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, চার মাজহাবের অনেক মাসআলার ভিত্তি হলো জয়িফ হাদিসের ওপর।

২. খুলাফায়ে রাশিদিনের আমল

আবু বকর রা.-এর যুগে লোকেরা একাকী সালাত পড়ত। উমরের যুগে যখন এক জামাআতে সবাই তারাবি পড়া শুরু করল, তখন কত রাকআত তারাবি পড়া হতো, হাদিসের গ্রন্থ খুললে এ সম্পর্কিত বর্ণনার বিশাল ভান্ডার পাওয়া যাবে; যেগুলোতে বলা হয়েছে, উমরের যুগে মসজিদে নববিতে তারাবির সালাত ২০ রাকআত পড়া হতো।

১. ইয়াজিদ ইবনু খুসাইফা রাহ. বলেন, সায়িব ইবনু ইয়াজিদ রা. বলেছেন, 'তারা উমরের যুগে রমজানে তারাবি ২০ রাকআত পড়তেন। সালাতে শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সুরাসমূহ পড়তেন। উসমান রা.-এর যুগে অধিক সময়ে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তারা লাঠিতে ভর করে দাঁড়াতেন।'[৪৬৪]

ইয়াজিদ ইবনু খুসাইফার হাদিস সহিহ। হাদিসশাস্ত্রের একাধিক ইমাম এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। নিচে কয়েকজনের বক্তব্য উল্লেখ করছি :

ইমাম নববি রাহ. হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'ইমাম বায়হাকি হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।'[৪৬৫] ইমাম ইরাকি রাহ. বলেন, 'ইমাম বায়হাকি রাহ. সহিহ সনদে

---

[৪৬৩] *ফাতহুল মুগিস* : ১/২৮৯, জারকাশি।

[৪৬৪] *আস-সুনানুল কুবরা* : ২/৪৯৬, বায়হাকি।

[৪৬৫] *খুলাসাতুল আহকাম* : ১/৫৭৬।

সায়িব ইবনু ইয়াজিদের হাদিস বর্ণনা করেছেন।'[৪৬৬] হাফিজ বদরুদ্দিন আইনি রাহ. বলেন, 'ইমাম বায়হাকি রাহ. সহিহ সনদে সায়িব ইবনু ইয়াজিদের হাদিস বর্ণনা করেছেন।'[৪৬৭] হাফিজ ইবনুল মুলাক্কিন রাহ. বলেন, 'ইমাম বায়হাকি সহিহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।'[৪৬৮] ইমাম জায়লায়ি রাহ. বলেন, 'তিনি ইমাম নববির কথা নকল করেছেন। তিনি বলেন, হাদিসের সনদ সহিহ।'[৪৬৯] ইয়াজিদ ইবনু খুসায়ফা থেকে অন্য বর্ণনা হলো, 'আমরা উমরের যুগে ২০ রাকআত ও বিতর পড়তাম।'[৪৭০]

বাংলাদেশের লা-মাজহাবিদের প্রসিদ্ধ এক শায়খ জোর দিয়ে লিখেছেন যে, উমরের যুগে ২০ রাকআত তারাবি-সংক্রান্ত সায়িব ইবনু ইয়াজিদের বর্ণনাটি জাল! তিনটি কারণ দেখিয়ে হাদিসটিকে জাল বলেছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, তিনি জাল প্রমাণিত করতে গিয়ে কথায় কথায় জঘন্য মিথ্যাচার ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। আমার লিখিত *আপনি কীভাবে সালাত পড়বেন* গ্রন্থের ৩১৬-৩২৬ নং পৃষ্ঠায় সে জালিয়াতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠক বিষয়টি সেখান থেকে পড়ে নিতে পারেন।

২. হাসান রাহ. থেকে বর্ণিত: 'উমর রা. লোকদের উবাই ইবনু কাআবের ইমামতিতে একত্রিত করলেন। তিনি ২০ রাকআত তারাবি পড়াতেন।'[৪৭১]

৩. আবদুল আজিজ ইবনু রুফাই রাহ. বলেন, 'উবাই ইবনু কাআব রা. রমজানে মদিনায় লোকদের ২০ রাকআত তারাবি ও তিন রাকআত বিতর পড়াতেন।'[৪৭২]

৪. ইয়াজিদ ইবনু রুমান রা. বলেন, 'উমরের যুগে লোকেরা ২৩ রাকআত পড়ত। তারাবি ২০ রাকআত ও বিতর তিন রাকআত।'[৪৭৩]

৫. সায়িব ইবনু ইয়াজিদ রাহ. বলেন, 'আমরা উমরের যুগে যখন তারাবি শেষ করতাম, তখন ফজরের সময় নিকটবর্তী হয়ে যেত। উমরের যুগে ২৩ রাকআত পড়া হতো।'[৪৭৪]

---

৪৬৬ *তারাহুত তাসরিব*: ৩/৮৮।

৪৬৭ *উমদাতুল কারি*: ৮/৪৮৫।

৪৬৮ *আল-বাদরুল মুনির*: ৪/৩৫০।

৪৬৯ *নাসবুর রায়াহ*: ২/১৫৪।

৪৭০ *আস-সুনানুল কুবরা*: ১/২৬৭; *মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার*: ২/৩০৫।

৪৭১ *সুনানু আবি দাউদ*: ১৪২৯।

৪৭২ *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা*: ৭৭৮৭।

৪৭৩ *মুআত্তা মালিক*: ৩৮০।

৪৭৪ *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক*: ৭৭৩৩।

৬. তাবিয়ি ইয়াহইয়া ইবনু সায়িদ আনসারি রাহ. বর্ণনা করেন, 'উমর রা. একব্যক্তিকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে ২০ রাকআত পড়েন।'[৪৭৫]

৭. উমর রা.-এর যুগে তারাবি ২০ রাকআত পড়া হতো, এটি সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের দেশে যারা ৮ রাকআত তারাবির কথা প্রচার করেন, শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। ২০ রাকআত তারাবি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বিষয়টি প্রমাণিত যে, উবাই ইবনু কাআব রা. তারাবিতে মুসল্লিদের নিয়ে ২০ রাকআত এবং তিন রাকআত বিতর পড়তেন। এ জন্য অনেক আলিম ২০ রাকআতকে সুন্নাত বলেছেন। কেননা, উমরের যুগে আনসার ও মুহাজির সাহাবিগণ ছিলেন। তাঁদের কেউ তখন আপত্তি করেননি।'

৮. ২০ রাকআত তারাবির ব্যাপারে তিনি আরও বলেন, '২০ রাকআত তারাবি খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত এবং মুসলমানদের সম্মিলিত কাজ দ্বারা প্রমাণিত।'[৪৭৬]

৯. মালিকি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. বলেন, '২০ রাকআত তারাবির কথা আলি রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। শুতাইর ইবনু শাকল, ইবনু আবি মুলাইকা, হারিস হামাদানি ও আবুল বুখতারি থেকে ২০ রাকাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর তারাবির সালাত ২০ রাকআত হওয়া জুমহুর আলিমের মত। আর ২০ রাকআত হওয়া কুফাবাসী, ইমাম শাফিয়ি রাহ. ও অধিকাংশ ফকিহের মত। উবাই ইবনু কাআব রা. থেকে সহিহভাবে ২০ রাকআত প্রমাণিত।'[৪৭৭]

১০. হাম্বলি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনু কুদামা মাকদিসি রাহ. বলেন, 'উমর রা. যা করেছেন এবং যে ব্যাপারে সকল সাহাবি একমত হয়েছেন, সেটির অনুসরণ অধিক উত্তম।'[৪৭৮]

২০ রাকআত তারাবির ব্যাপারে এখানে যে তিন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরেছি, তাঁদের কেউ-ই হানাফি নন। এরপরও তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, ২০ রাকআত

---

[৪৭৫] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৭৭৬৪।

[৪৭৬] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ২৩/ ১১২, ১১৩।

[৪৭৭] *আল-ইসতিজকার* : ২/৭০।

[৪৭৮] *আল-মুগনি* : ২/৬০৪।

তারাবি খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত। ২০ রাকআতের ব্যাপারে সাহাবিগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে।

৩. একটি সংশয় ও এর নিরসন

আমাদের দেশে যারা ৮ রাকআতের কথা বলে থাকেন, তারা যখন কোনোভাবে উমরের যুগের ২০ রাকআত তারাবি হওয়াকে জাল প্রমাণিত করতে পারেন না, তখন একটি চমকপ্রদ কথা বলে থাকেন যে, রাসুল ﷺ তারাবি ৮ রাকআত পড়েছেন। উমর রা. ২০ রাকআত পড়িয়েছেন। সুতরাং আমরা উমর রা.-কে বাদ দিয়ে রাসুল ﷺ-কে অনুসরণ করব!

এখানে একটি কথা বলে রাখি, রাসুল ﷺ থেকে ৮ রাকআত প্রমাণিত, এমন কথা বলা স্পষ্ট ভুল। ৮ রাকআতের পক্ষে তারা যে হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, সে হাদিসের ওপর তারা নিজেরাই আমল করেন না! সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আল্লামা হাবিবুর রহমান আজমি লিখিত ও আমার অনূদিত *তারাবির সালাত* গ্রন্থে দেখে নিতে পারেন।

প্রথমত, উমর রা. তারাবির রাকআতসংখ্যা বাড়িয়েছেন, এমনটি বলা পরিষ্কার ভুল। পূর্বে *সহিহ বুখারি*র হাদিস দ্বারা আমরা প্রমাণিত করেছি, তিনি শুধু বিক্ষিপ্ত জামাআতসমূহকে একত্রিত করেছেন। মানুষ তারাবির সালাত আগে যত রাকআত পড়ত, উমর রা. এক ইমামের পেছনে একত্রিত করে দেওয়ার পরও তত রাকআতই পড়ত।

তাবিয়ি আবুল আলিয়া উবাই ইবনু কাআব রা. থেকে বর্ণনা করেন,

> أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلي بالليل في رمضان فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل فقال: لم يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال: قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم عشرين ركعة.
>
> উমর রা. উবাই ইবনু কাআব রা.-কে রমজানে লোকদের নিয়ে সালাত পড়ার আদেশ করতে গিয়ে বলেন, 'লোকেরা দিনে রোজা রাখে; কিন্তু রাতে উত্তমরূপে কুরআন পড়তে পারে না। আপনি যদি রাতে তাদের সামনে কুরআন পড়তেন।' উবাই ইবনু কাআব রা. জবাবে বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, এ বিষয়টি তো আগে ছিল না।'

উত্তরে তিনি বললেন, 'তা আমি জানি; কিন্তু এটা ভালো।' এর পর উবাই রা. তাঁদের নিয়ে ২০ রাকআত পড়েন।[৪৭৯]

এখানে লক্ষণীয় হলো, উমর রা. যখন বিক্ষিপ্ত জামাআতগুলো একত্রিত করতে চেয়েছিলেন, তখন উবাই রা. নিজের খটকা প্রকাশ করে বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনি এমন একটা কাজ করছেন, যা রাসুল ﷺ ও আবু বকর রা. করেননি!' এখন যদি লোকেরা বাস্তবে আগে ৮ রাকআত পড়ত, উমর রা. বাড়িয়ে ২০ রাকআত বানিয়ে ফেলতেন, তাহলে একজন সাহাবি নিজের মনের খটকা প্রকাশ করলেন না! এ জন্য এটিই চিরসত্য যে, লোকেরা রাসুল ﷺ ও আবু বকরের যুগেও তারাবি ২০ রাকআত পড়ত।

যদি ধরেও নিই, উমর রা. ২০ রাকআত বাড়িয়েছেন, তারপরও মানতে আপত্তি নেই। কেননা, তখন মসজিদে নববিতে ২০ রাকআত তারাবি পড়া হতো। সেখানে বড় বড় সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ তো আপত্তি করেননি। সুতরাং ২০ রাকআতের ওপর সাহাবিদের ইজমা তথা ঐকমত্য সংঘটিত হয়ে গেছে। এ ছাড়া রাসুল ﷺ-তো খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

মনে রেখো, আমার পরে তোমাদের যারা জীবিত থাকবে, তারা বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত ও আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাত আঁকড়ে রাখবে। একে অবলম্বন করবে ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখবে।[৪৮০]

সুতরাং যদি ধরে নেওয়াও হয় যে, ২০ রাকআত তারাবি উমর রা. বাড়িয়েছেন, তাহলে আমল করতে সমস্যা কোথায়? নাকি আপনারাও উমর রা.-কে ভয় পান?

৪. উসমান ও আলির যুগে তারাবি ২০ রাকআত ছিল

উমরের যুগে তারাবির সালাত জামাআতে পড়া শুরু হয়। এর পর প্রত্যেক যুগে মসজিদে নববিতে ২০ রাকআত তারাবি পড়া হতো। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু দলিল উল্লেখ করছি :

[৪৭৯] *কানজুল উম্মাল* : ২৩৪৭১।
[৪৮০] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৬৯২।

১. সায়িব ইবনু ইয়াজিদ রাহ. বলেন, 'উমরের খিলাফতকালে সাহাবিগণ রমজানে ২০ রাকআত পড়তেন এবং শতাধিক আয়াতের সুরাগুলো পড়তেন। তাঁর খিলাফতকালে এত দীর্ঘ কিরাআত পড়া হতো যে, অধিক সময় দাঁড়ানোর কারণে মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াত।'[৪৮১]

২. আলি রা. রমজানে কারিদের ডেকে একজনকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন লোকদের ২০ রাকআত তারাবি পড়ান। আলি রা. নিজে বিতর পড়াতেন।[৪৮২]

৩. আবুল হান্না থেকে বর্ণিত; আলি রা. জনৈক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, লোকদের ২০ রাকআত তারাবি পড়াতে।'[৪৮৩]

৪. আলি রা.-এর অন্যতম সঙ্গী শুতাইর ইবনু শাকল। তিনি রমজানে লোকদের ২০ রাকআত তারাবি ও তিন রাকআত বিতর পড়াতেন।[৪৮৪]

৫. ইমাম আমাশ রাহ. বলেন, 'ইবনু মাসউদ রা. ২০ রাকআত তারাবি ও তিন রাকআত বিতর পড়াতেন।'[৪৮৫]

৬. ইমাম ইবনু কুদামা হাম্বলি রাহ. উমর ও আলি রা.-এর তারাবি ২০ রাকআতের ওপর আমল করার কথা ইমাম মালিকের সূত্রে উল্লেখ করার পর বলেন, 'এমন আমল ইজমার মতো।'[৪৮৬]

৫. তাবিয়ি, তাবয়ে তাবিয়ি ও ইমামগণের যুগে তারাবি

১. প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আতা রাহ. বলেন, 'আমি লোকদের ২৩ রাকআত (বিতরসহ) পড়তে দেখেছি।'[৪৮৭]

২. ওয়াকি রাহ. থেকে বর্ণিত; 'সায়িদ ইবনু জুবায়ের রমজানে আমাদের

---

[৪৮১] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৪৩৯৩, বায়হাকি। আল্লামা নিমাবি বলেন, হাদিসের সনদ সহিহ, ইমাম নববি *আল-খুলাসাতে* ও সুয়ুতি *মাসাবিহে* হাদিসকে সহিহ বলেছেন। *আত-তালিকুল হাসান* : ৩৯৪।

[৪৮২] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৪৩৯৬।

[৪৮৩] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৭৭৬৩। আল্লামা নিমাবি বলেন, হাদিসের সনদ জয়িফ। কারণ, আবু সাআদ বাক্কাল হলেন বিতর্কিত বর্ণনাকারী। এটি হলো বায়হাকির বর্ণনা। ইবনু আবি শায়বার বর্ণনায় তাঁর জায়গায় হলেন আমর ইবনু কায়েস। আমার ধারণামতে, এখানে আমর ইবনু কায়েস আল মালায়ি উদ্দেশ্য। ইমাম আহমদ, ইবনু মায়িন, আবু হাতিম ও আবু জুরআ রাহ. তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন। *আত-তালিকুল হাসান* : ৩৯৯।

[৪৮৪] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৪৩৯৫। ইমাম বায়হাকি বলেন, বর্ণনাটি শক্তিশালী।

[৪৮৫] *মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল* : ১৫৭।

[৪৮৬] *আল-মুগনি* : ১/৮৩৩।

[৪৮৭] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৭৭৭০।

ইমামতি করতেন এবং দুই পদ্ধতিতে কিরাআত পড়তেন। রাতে ইবনু মাসউদের কিরাআত অনুসারে পাঁচ তারাবি (২০ রাকআত) পড়তেন।'[৪৮৮]

৩. নাফি রাহ. থেকে বর্ণিত; 'ইবনু মুলাইকা রা. রমজানে আমাদের ২০ রাকআত তারাবি পড়াতেন।'[৪৮৯]

৪. আবুল খুসাইব রা. বলেন, 'সুয়াইদ ইবনু গাফালা রা. রমজানে আমাদের ২০ রাকআত তারাবি পড়াতেন।'[৪৯০]

৫. ইবরাহিম নাখয়ি রাহ. থেকে বর্ণিত; 'লোকেরা রমজানে পাঁচ তারাবি তথা ২০ রাকআত পড়ত।'[৪৯১]

৬. সায়িদ ইবনু আবি উবাইদ রা. থেকে বর্ণিত; 'আলি ইবনু রাবিআ—যিনি আলি ও সালমান ফারসি রা.-এর শিষ্য—রমজানে মানুষদের ২০ রাকআত তারাবি ও তিন রাকআত বিতর পড়াতেন।'[৪৯২]

৭. আবু ইসহাক রাহ. থেকে বর্ণিত; 'হারিস আওয়ার—আলি রা.-এর ছাত্র—রমজানের রাতে লোকদের ২০ রাকআত তারাবি ও তিন রাকআত বিতর পড়াতেন। আর রুকুর পূর্বে দুআয়ে কুনুত পড়তেন।'[৪৯৩]

৮. ইমাম তিরমিজি বলেন, 'অধিকাংশ আহলে ইলম ২০ রাকআত তারাবির প্রবক্তা। যেমনটি উমর, আলি রা. ও রাসুলের অন্য সাহাবি থেকে বর্ণিত। এমনটি সুফিয়ান সাওরি ও ইবনুল মুবারকের কথা। ইমাম শাফিয়ি রাহ. বলেন, আমি মক্কায় দেখেছি, সেখানে ২০ রাকআত পড়া হয়।'[৪৯৪]

৯. উমরের যুগ থেকে শুরু করে আপনার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সকল মুসলমান অন্তত ২০ রাকআতের প্রবক্তা ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে সব জায়গায় তারাবি ২০ রাকআত পড়া হতো। ইসলামের মূল কেন্দ্র মদিনায় খুলাফায়ে রাশিদিন উমর, উসমান ও আলি রা.-এর খিলাফতকালে তারাবি ২০ রাকআত পড়া হতো। খিলাফতের পরে কমপক্ষে ২০ রাকআত পড়া

---

[৪৮৮] প্রাগুক্ত : ৭৭৭৩।

[৪৮৯] প্রাগুক্ত : ৭৭৬৫।

[৪৯০] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৪৩৯৫, বায়হাকি।

[৪৯১] *কিতাবুল আসার* : ৪১, আবু ইউসুফ।

[৪৯২] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৭৭৭২।

[৪৯৩] প্রাগুক্ত : ৭৭৬৮।

[৪৯৪] *সুনানুত তিরমিজি* : ৮০২।

হতো। বেশিও পড়া হতো; কিন্তু কম পড়া হতো না। আজও মদিনায় তারাবি ২০ রাকআত পড়া হয়।

১০. মক্কা মুকাররামায় আতা ইবনু আবি রাবাহের যুগ পর্যন্ত ২০ রাকআত পড়া হতো। তাঁর আসারে যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ১১৪ হিজরিতে আতা আর ইবনু মুলাইকা ১১৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সেখানে ২০ রাকআত তারাবি পড়াতেন; যেভাবে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম শাফিয়ির মৃত্যু হয়েছে ২০৪ হিজরিতে। তিনি তাঁর শহর মক্কায় লোকদের ২০ রাকআত পড়তে দেখেছেন। ইমাম শাফিয়ি নিজেই ২০ রাকআতের প্রবক্তা ছিলেন। এ জন্য তাঁর অনুসারীগণ প্রত্যেক জায়গায় ২০ রাকআতের ওপর আমল করতেন। আজও মক্কায় ২০ রাকআতের ওপর আমল হয়। কুফা ও বসরায় আলি রা.-এর নির্দেশে ২০ রাকআত পড়া হতো। খোদ ইবনু মাসউদও ২০ রাকআত তারাবি পড়তেন; পূর্বে যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে। কুফায় হারিস আওয়ারের মৃত্যু ৫৫ হিজরিতে হয়—যিনি আলি রা.-এর ছাত্র—তিনিও ২০ রাকআত পড়াতেন। আলি ইবনু রাবিআ—যিনি আলি রা. ও সালমান ফারসি রা.-এর ছাত্র—তিনিও ২০ রাকআত তারাবি ও তিন রাকআত বিতর পড়াতেন। সুফিয়ান সাওরি ও ইমাম আবু হানিফা ২০ রাকআতের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁদের পরে তাঁদের অনুসারীদের আমল ২০ রাকআতের ওপর ছিল।

১১. মোটকথা, হাদিস ও ফিকহের সকল ইমাম এবং প্রত্যেক যুগের বড় বড় ইমাম ২০ রাকআতেরই প্রবক্তা। বাগদাদে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আবদুল কাদির জিলানি, ইমাম গাজালি, ইবনু তাইমিয়া, ইবনু নুজাইম, আলাউদ্দিন হাসকাফি, হিন্দুস্থানের শাহ আবদুল হক, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি ও ইবনু আবিদিন শামি রা. সবাই ২০ রাকআতের প্রবক্তা ছিলেন।

বারো. তারাবির টাকা : একটি পর্যালোচনা

রমজান হলো রহমত, বরকত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস; অথচ এ মাসকে আমরা বানিয়ে ফেলেছি ঝগড়ার মাস। বিশেষত তারাবির রাকআত-সংখ্যা নিয়ে নানান বিতর্ক চলে।

রমজানের বিশেষ আমল তারাবি। পুরো তারাবিতে একবার কুরআন খতম

করা সুন্নাত। সে হিসেবে প্রত্যেক মসজিদে রমজানে হাফিজ নিয়োগ দেওয়া হয়। কুরআন খতম শেষ হওয়ার পর এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে হাফিজ সাহেবকে মোটা অঙ্কের টাকা প্রদান করা হয়। তারাবির সালাতের বিনিময় নেওয়া যাবে কি না, এ মাসআলা নিয়েও রমজানে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা হয়। প্রয়োজন মনে করে এখানে এ মাসআলা সম্পর্কে কিছু কথা বলব।

তারাবির সালাত জামাআতের সঙ্গে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। কেননা, উমরের খিলাফতকাল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে এর ওপর আমল চলে আসছে। আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফি রাহ. বলেন, 'তারাবির সালাত পুরুষ ও মহিলার জন্য ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুন্নাতে মুআক্কাদা; খুলাফায়ে রাশিদিনের ধারাবাহিক আমলের কারণে।'[৪৯৫]

এখানে খুলাফায়ে রাশিদিন দ্বারা উদ্দেশ্য উমর, উসমান ও আলি রা.। কেননা, নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারাবির জামাআত শুরু হয় উমরের খিলাফতকালে।

১. কুরআন শরিফ খতম করার হুকুম

তারাবির সালাতে অন্তত একবার কুরআন খতম করা সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে ফকিহগণ একমত।[৪৯৬]

২. তারাবির সালাত পড়িয়ে হাদিয়া অথবা বিনিময় নেওয়া

হাদিসশাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শায়বা রাহ.। তিনি ইমাম বুখারি ও মুসলিমের উসতাজ। তিনি *আল-মুসান্নাফ* নামে হাদিসশাস্ত্রে সর্বযুগে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থের ৬৯০ নম্বর পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে, في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى অর্থাৎ, 'ওই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে রমজানে মানুষদের তারাবির সালাত পড়ায়, এরপর তাকে কিছু দেওয়া হয়।'

এখানে লক্ষণীয়, অনেকেই বলে থাকেন যে, তারাবির সালাতের হাফিজ সাহেবদের যে টাকা প্রদান করা হয়, সেটি কুরআনের বিনিময় নয়; বরং হাদিয়াস্বরূপ। এ জন্য এটা হারাম হবে না। কিন্তু ইবনু আবি শায়বা রাহ. এখানে হাদিয়া বা বিনিময়

---

[৪৯৫] *আদ-দুররুল মুখতার* : ২/৫৯৬।

[৪৯৬] *ফাতাওয়া কাজিখান* : ১/১৪৭; *ফাতহুল কাদির* : ১/৪৮৭; *ফাতাওয়া আলমগিরি* : ১/১৭৭; *আদ-দুররুল মুখতার* : ২/৬০১।

কোনোটি নির্দিষ্ট করেননি; বরং ব্যাপক রেখেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, তারাবির সালাতের পর হাফিজ সাহেবদের যা কিছু দেওয়া হয়—চাই সেটি হাদিয়া হোক অথবা বিনিময়, তার হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। সেই পরিচ্ছেদের হাদিসগুলো নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাকাল রা. থেকে বর্ণিত;

أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ بَعَثَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِحُلَّةٍ وَبِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَرَدَّهَا، وَقَالَ: إِنَّا لَا نَأْخُذُ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا.

এক রমজানে তিনি লোকদের নিয়ে তারাবি পড়েন। এরপর ইদের দিন উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদ রাহ. তাঁর কাছে একজোড়া কাপড় ও ৫০০ দিরহাম পাঠান। তখন তিনি কাপড় ও দিরহামগুলো এই বলে ফেরত দেন যে, 'আমরা কুরআনের বিনিময় গ্রহণ করি না।'[৪৯৭]

২. আবু ইয়াস মুআবিয়া ইবনু কুররা বলেন,

كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَمْرِو بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَمِيرَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: إِنَّا لَمْ نَدَعْ قَارِئًا شَرِيفًا إِلَّا قَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَّا مَعْرُوفٌ، فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةِ شَهْرِكَ هَذَا، فَقَالَ عَمْرٌو: "اقْرَأْ عَلَى الْأَمِيرِ السَّلَامَ، وَقُلْ: وَاللهِ مَا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا" وَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

আমি আমর ইবনু নুমান ইবনু মুকাররিনের কাছে অবস্থান করছিলাম। যখন রমজান এল, মুসআব ইবনু জুবায়েরের পক্ষ থেকে এক লোক তাঁর কাছে ২ হাজার দিরহাম নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলে, 'আমির আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক কারির কাছে আমাদের পক্ষ থেকে কিছু হাদিয়া পৌঁছে যাবে। আপনি এই ২ হাজার দিরহাম দ্বারা রমজানের খরচ চালান।' আমর তখন বলেন, 'আমির সাহেবকে আমার সালাম দিয়ে বলবেন, 'আমরা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করি না।' তিনি তখন সেই ২ হাজার দিরহাম ফিরিয়ে দেন।[৪৯৮]

---

[৪৯৭] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৭৮২১।

[৪৯৮] প্রাগুক্ত : ৭৮২০।

আবদুল্লাহ ইবনু মাকালের প্রথম বর্ণনাটি দেখুন, উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদ তাঁর কাছে দিরহাম ও একজোড়া কাপড় পাঠান ইদুল ফিতরের দিনে। লোকচক্ষুর অন্তরালে। তারপরেও তিনি গ্রহণ করেননি।

দ্বিতীয় হাদিসটি লক্ষ করুন, আবু ইয়াসের কাছে ২ হাজার দিরহাম পাঠানো হয়েছিল রমজান চলাকালে। তারাবির সালাত তখনো শেষ হয়নি। এরপরও তিনি গ্রহণ করেননি।

৩. আবদুল্লাহ ইবনু শিবল থেকে বর্ণিত;

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقَرؤُوا الْقُرْآنَ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِه.

রাসুল ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরআন পড়ো, এর বিনিময়ে কিছু খেয়ো না।[৪৯৯]

হাদিসের মান সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে শক্তিশালী।'

হাদিসে যদিও সরাসরি তারাবির কথা উল্লেখ নেই; কিন্তু ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শায়বা রাহ. হাদিসটি 'তারাবির সালাত পড়িয়ে কোনোকিছু নেওয়া' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ হাদিস দ্বারা কোনোকিছু গ্রহণ করা নাজায়িজ প্রমাণিত করেছেন।

৪. জাজান রাহ. বলেন,

سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَأْكُلُ بِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ

আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে কুরআন পড়ল, এর মাধ্যমে কিছু খেলো, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তার চেহারায় শুধু হাড্ডি থাকবে। গোশত থাকবে না।'[৫০০]

৫. আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ رَفَعَهُ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللهَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ وَرَجُلٌ يَقْرَؤُهُ لِلَّهِ.

---

[৪৯৯] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৫৩৫; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৭৮২৫।

[৫০০] *ফাতহুল বারি* : ৯/১১৫।

তোমরা কুরআন শিক্ষা করো ও এর বিনিময় আল্লাহর কাছে চাও—এমন সম্প্রদায়ের আগে, যারা কুরআন শিক্ষা করবে এবং এর বিনিময় দুনিয়ায় চাইবে। কেননা, কুরআন শিক্ষা করে তিন শ্রেণির মানুষ। এক শ্রেণি এর দ্বারা অন্যকে অপবাদ দেয়, এক শ্রেণি এর দ্বারা খাবার খায় এবং আরেক শ্রেণি আল্লাহর জন্য পড়ে।[৫০১]

ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শায়বা রাহ. পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়ে মোট সাতটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ছয়টি হাদিস এমন, যা তারাবির সালাত পড়িয়ে কোনোকিছু গ্রহণ করা নাজায়িজ প্রমাণিত করে। শুধু সায়িদ ইবনু জুবায়ের রাহ.-এর একটি আসার পেশ করেছেন, যা তারাবির সালাত পড়িয়ে কোনোকিছু গ্রহণ করা জায়িজ প্রমাণিত হয়।

৬. আসারটি হলো,

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَجُلٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَامَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ بِبُرْنُسٍ فَقَبِلَهُ.

জারির জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, সায়িদ ইবনু জুবায়ের রমজানে তারাবির সালাত পড়িয়েছিলেন। এ জন্য হাজ্জাজ তার কাছে 'বুরনুস' নামীয় এক ধরনের টুপি পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি সেটি গ্রহণ করেন।[৫০২]

এখানে জারির থেকে বর্ণনাকারী মাজহুল তথা অজ্ঞাত। তাঁর পরিচয় জানা যায় না। অজ্ঞাত রাবি থেকে বর্ণিত হাদিস জুমহুর মুহাদ্দিসের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[৫০৩] সুতরাং যতক্ষণ তার পরিচয় জানা না যাবে, ততক্ষণ তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না। এ জন্য ইবনু জুবায়েরের 'আসার' দ্বারা জায়িজের পক্ষে দলিল দেওয়া আদৌ ঠিক হবে না।

৩. ইমামগণের মতামত

ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, কোনো ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ নেই। হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ্যগ্রন্থ *হিদায়াতে* আছে, 'আজান, হজ, ইমামতি ও কুরআন শিক্ষার বিনিময় নেওয়া জায়িজ নেই। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, এমন ইবাদত, যা মুসলমান পরিচায়ক, (অর্থাৎ, দীনের এমন বিষয়, যা

---

[৫০১] প্রাগুক্ত : ৯/১১৫।

[৫০২] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৭৮৩২।

[৫০৩] *মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ* : ১১১, শায়খ নুরুদ্দিন ইত্‌র তাহকিককৃত।

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হয়, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা বৈধ নয়) এর বিনিময় নেওয়া বৈধ নয়।’[৫০৪]

আল্লামা আকমাল উদ্দিন বাবারতি রাহ. বলেন, ‘ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার জন্য বিনিময় নেওয়া জায়িজ নয়।’[৫০৫]

আল্লামা ইবনু কুদামা হাম্বলি রা. বলেন, ‘যেসব জিনিসের বিনিময় নেওয়া জায়িজ নেই, এর চতুর্থটি হলো এমন ইবাদত, যা শুদ্ধ হতে মুসলমান হওয়া শর্ত। যেমন : ইমামতি, আজান, হজ ও কুরআন শিক্ষা। ইমাম আহমাদ, আতা, জাহহাক ইবনু কায়েস, আবু হানিফা ও জুহরি রাহ. থেকে বর্ণিত।’[৫০৬]

সুতরাং মুতাকাদ্দিমিন তথা পূর্ববর্তীদের কাছে কোনো ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ নয়। ইবাদত দ্বারা এমন ইবাদত উদ্দেশ্য, যা মুসলমানদের সঙ্গে নির্দিষ্ট। তবে ইবাদত যদি এমন হয়, যা মুসলমানদের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়, তাহলে বিনিময় নেওয়া জায়িজ। ইমাম রাফিয়ি রাহ. বলেন, ‘ইবাদত যদি এমন হয়, যা মুসলমানদের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়, তাহলে বিনিময় নেওয়া জায়িজ আছে। যেমন, তাওরাত শিক্ষাদান।’[৫০৭]

এই মূলনীতির ভিত্তিতে তারাবি মুসলমানদের সঙ্গে নির্দিষ্ট আমল এবং তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পড়া হয়। এ জন্য মুতাকাদ্দিমিনের কাছে এর বিনিময় গ্রহণ জায়িজ নয়।

পরবর্তী যুগের ইমামগণ উপরিউল্লিখিত মূলনীতি থেকে কিছু ইবাদত পৃথক করেছেন এবং বিনিময় গ্রহণ জায়িজ হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। *হিদায়া* গ্রন্থে আছে, ‘কোনো কোনো ইমাম কুরআন শেখানোর বিনিময় গ্রহণ জায়িজ হওয়ার ফাতওয়া দেন। কেননা, বর্তমানে দীনের বিষয়ে মানুষের মধ্যে অলসতা প্রকাশ পায়। এ জন্য বিনিময় গ্রহণ নাজায়িজ হলে কুরআন হিফজের বিষয়টি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে এটির ওপর ফাতওয়া।’[৫০৮]

আল-বাহরুর রায়িকে আছে, ‘আজান, হজ, ইমামতি, কুরআন শিক্ষা ও ফিকহের বিনিময় গ্রহণ করা জায়িজ নয়; কিন্তু বর্তমানে কুরআন শিক্ষার বিনিময় জায়িজের

---

৫০৪ *ফাতহুল কাদির* : ৯/৯৮।

৫০৫ *আল-ইনায়া* : ফাতহুল কাদিরের সাথে মুদ্রিত : ৯/৯৭।

৫০৬ *আল-মুগনি* : ৭/৪৩৬।

৫০৭ *তাকরিরাতে রাফিয়ি* : ফাতাওয়া শামির টীকা : ৯/৯৩।

৫০৮ *ফাতহুল কাদির* : ৯/৯৮।

ফাতওয়া দেওয়া হবে। কেননা, পূর্বে হাফিজ ও শিক্ষকদের জন্য বায়তুলমাল থেকে ভাতা দেওয়া হতো। ছাত্রদের একটি পরিমিত জামাআত ইলম শিক্ষায় লিপ্ত থাকত। বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে গেছে এবং হাফিজগণ তাদের নিজস্ব কাজে ব্যস্ত। এখন যদি বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার দরজা খোলা না হয়, তাহলে কুরআন মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য বিনিময় জায়িজ ফাতওয়া দেওয়া হবে। কেননা, জামানার পরিবর্তনে হুকুমও পরিবর্তন হয়।'[৫০৯]

আল্লামা হাসকাফি রাহ. কুরআন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ফিকহ, ইমামতি ও আজান দেওয়ার বিনিময় নেওয়া বৈধ বলেছেন। তিনি বলেন, 'বর্তমানে কুরআন শিক্ষা, ফিকহ, ইমামতি ও আজানের বিনিময় নেওয়া সহিহ হওয়ার ফাতওয়া দেওয়া হবে।'[৫১০]

এখন প্রশ্ন হলো, এগুলোর ওপর কিয়াস করে তারাবির সালাতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ ফাতওয়া দেওয়া হবে কি?

আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রাহ. এ ব্যাপারে তত্ত্ববহুল আলাচনা করে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, জায়িজ হওয়ার হুকুমটি শধু উপরিউল্লিখিত ইবাদতের সঙ্গে নির্দিষ্ট। এগুলোর ওপর কিয়াস করে অন্য ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ হওয়ার ফাতওয়া দেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, 'গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত মত হলো, প্রত্যেক ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ নয়; বরং পূর্বোল্লিখিত ইবাদতগুলোতে শুধু জায়িজ হবে। যেগুলোর মধ্যে স্পষ্ট প্রয়োজন রয়েছে, যা নিষেধের সীমানা থেকে বের হওয়া জায়িজ করে।'[৫১১]

আমরা জানি, তারাবিতে কুরআন খতম জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি একটি সুন্নাত আমল। সুতরাং কুরআন শিক্ষা, ফিকহ, ইমামতি ও আজান দেওয়ার ওপর কিয়াস করে তারাবির বিনিময় জায়িজ হওয়ার ফাতওয়া দেওয়া আদৌ ঠিক নয়।

৪. বিনিময় না দিয়ে হাদিয়া দেওয়া

আমাদের দেশে অনেকে বলেন, আমরা হাফিজ সাহেবকে তারাবির বিনিময় নয়; বরং হাদিয়া দিই। আর হাদিয়া দিতে তো কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে কথা হলো, আমাদের দেশে প্রচলিত রেওয়াজ বা প্রথাকে শরিয়তের দৃষ্টিতে হাদিয়া বলা যাবে কি না, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে হাদিয়া বলা হয়,

[৫০৯] *আল-বাহরুর রায়িক* : ৯/৩৩-৩৪।

[৫১০] *আদ-দুররুল মুখতার* : ৯/৯৪।

[৫১১] *রাদ্দুল মুহতার* : ৯/৯৪।

"تمليك عين بلاعوض" অর্থাৎ, 'কোনো বিনিময় ছাড়া কাউকে কিছুর মালিক বানিয়ে দেওয়া।'

এ সংজ্ঞার আলোকে আমাদের দেশে প্রচলিত রেওয়াজকে কোনোভাবেই হাদিয়া বলা যাবে না। কেননা, এখানে মূলত টাকা দেওয়া হয় তারাবি পড়ানোর কারণে। যদি হাফিজ সাহেব তারাবি না পড়াতেন, তাহলে তাকে এই টাকা দেওয়া হতো না। এ জন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে তারাবির পর হাফিজ সাহেবকে প্রদেয় টাকা হাদিয়া বলা পরিষ্কার ভুল।

অধিকাংশ মসজিদে এমন হয় যে, প্রত্যেক মুসল্লির ওপর একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট একটি সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে নির্ধারিত টাকা মুতাওয়াল্লির কাছে জমা দিতে হয়। দেরি হলে কমিটির পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়, না দিলে মসজিদ-কমিটির কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অনেক মসজিদে কালেকশনও করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিকে কি 'হাদিয়া' বলা হবে? এ ছাড়া হাফিজ সাহেব যদি এ মসজিদে তারাবি না পড়তেন, তাহলে কি তাকে এভাবে আয়োজন করে হাদিয়া দেওয়া হতো? কখনোই না। তাই এই টাকাকে হাদিয়া বলা ভুল। প্রকৃত অর্থে এটা তারাবির বিনিময়। আর এমন পদ্ধতিতে হাদিয়া দেওয়া জায়িজ নয়। এ জন্য শায়খুল ইসলাম তাকি উসমানি বলেছেন, 'বর্তমানের প্রচলিত হাদিয়া আসলে উজরত তথা বিনিময় হয়ে যায়। তবে বাস্তবে যদি কেউ হাফিজ সাহেবকে হাদিয়া দিতে চায়, তাহলে একাকী দিয়ে দেবে। এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।'[৫১২]

৫. তারাবি পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া জায়িজ হওয়া প্রসঙ্গে

আমাদের দেশে কিছু কিছু আলিম তারাবির সালাত পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ জায়িজ বলে ফাতওয়া দেন। কেউ তো এর পক্ষে বই-পুস্তকও রচনা করেছেন। জায়িজ হওয়ার পক্ষে তাদের মূল দলিল দুটি।

সহিহ বুখারিতে আছে; রাসুল ﷺ বলেছেন, 'বিনিময় গ্রহণের সবচেয়ে উপযুক্ত জিনিস হলো আল্লাহর কিতাব।'[৫১৩]

এই হাদিসে কিতাবুল্লাহর বিনিময় গ্রহণ জায়িজ বলা হয়েছে। সুতরাং তারাবির সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা হয়।

---

[৫১২] *ফাতাওয়া উসমানি* : ১/৪৬০।

[৫১৩] *সহিহ বুখারি* : ৪৭৩৭।

প্রথম যুগে সব ধরনের ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ নাজায়িজ ছিল। পরবর্তী সময়ে আজান, ইমামত, কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ প্রয়োজনের কারণে জায়িজ বলে ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে। তারাবির সালাতও একটি প্রয়োজন। এ জন্য এর বিনিময় গ্রহণও জায়িজ হবে। দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, আজান-ইমামত ও কুরআন শিক্ষার ওপর কিয়াস করে অন্য ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ ফাতওয়া দেওয়া যাবে না।

এখন আমরা হাদিসটি নিয়ে আলোকপাত করব। ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

> أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.
>
> সাহাবিগণের একটি জামাআত সফরে যান। তখন সেই এলাকার একজনকে বিচ্ছু দংশন করে। জনৈক ব্যক্তি সাহাবিগণের কাছে এসে বলে, তোমাদের মধ্যে কোনো ঝাড়ফুঁককারী আছ কি? একজন সাহাবি তার সঙ্গে গিয়ে সুরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দেন। আল্লাহর রহমতে সে ভালো হয়ে যায়। তখন ওই লোক কয়েকটি ছাগল নিয়ে তাদের কাছে আসে। সাহাবিদের কেউ কেউ অপছন্দ করে বলেন, তুমি আল্লাহর কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করেছ? এরপর যখন সাহাবিগণ মদিনায় ফিরে এসে রাসুলের কাছে বলেন—সে আল্লাহর কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করেছে। শুনে রাসুল ﷺ বলেন, বিনিময় গ্রহণের সবচেয়ে উপযুক্ত জিনিস হলো আল্লাহর কিতাব।[৫১৪]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সাহাবিগণ যে ছাগলটি গ্রহণ করেন, তা গ্রহণ করেন ঝাড়ফুঁকের কারণে। আমরাও বলি, কেউ যদি কুরআন দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে, তাহলে তার জন্য বিনিময় গ্রহণ জায়িজ আছে।

আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রাহ. বলেন, 'ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ

---

[৫১৪] *সহিহ বুখারি* : ৪৭৩৭।

হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে *বুখারির* দংশনের হাদিস দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। এটা ভুল। কেননা, পূর্ববর্তী যুগের যাঁরা ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ নাজায়িজ বলেছেন, তাঁরা সবাই ঝাড়ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ বলেছেন। যদিও সেটা কুরআন দ্বারা হোক, যেমনটা উল্লেখ করেছেন ইমাম তাহাবি। কেননা, এটা স্রেফ ইবাদত নয়; বরং চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত।'[৫১৫]

ইবনু কুদামা মাকদিসি রাহ. এই হাদিস দ্বারা ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ হওয়ার দলিল দেওয়া ঠিক নয় বলেছেন।[৫১৬]

হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানি রাহ. বলেন, 'যারা কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ জায়িজ বলেন, তারা "أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ" এই বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করেন; অথচ এটা তাদের পক্ষে দলিল নয়; বরং তাদের বিপক্ষে দলিল। কেননা, সাহাবিগণ আল্লাহর কালাম পড়ে বিনিময় নেওয়া হারাম মনে করতেন। আর এতে তাঁরা সঠিকও ছিলেন। তবে উল্লিখিত বাক্যের ব্যাপকতার কারণে তাঁরা তাবিজের বিষয়ে ভুল করেছেন। তারপর রাসুল ﷺ তাঁদের ভুল শুধরে দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর কালাম পড়ে বিনিময় গ্রহণ করার মতো নয়; বরং অন্যকিছু দিয়ে তাবিজ লিখে বিনিময় গ্রহণ করার চেয়ে আল্লাহর কালাম দিয়ে তাবিজ লিখে বিনিময় গ্রহণ করা অধিক হক রাখে। অতএব, "أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ" এই বাক্য শুধু তাবিজের সঙ্গে নির্দিষ্ট। কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও কুরআন পড়া ইত্যাদিকে শামিল করে না।'[৫১৭]

দেখুন, পরবর্তী ইমামদের কাছে কুরআন শিক্ষা, আজান ও ইকামাতের বিনিময় নেওয়া জায়িজ, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারপরও তারা এর পক্ষে এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেননি। কারণ সবাই জানেন, এ হাদিসের সম্পর্ক কুরআনের বিনিময় নেওয়ার সঙ্গে নয়; বরং ঝাড়ফুঁকের সঙ্গে। তা ছাড়া কুরআন পড়ে ঝাড়ফুঁক করে বিনিময় নেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়িজ। এ জন্য এই হাদিস দ্বারা তারাবির বিনিময় গ্রহণ জায়িজ হওয়ার ফাতওয়া দেওয়া ভুল।

আমরা পূর্বে দেখেছি, ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শায়বা রাহ. তারাবির সালাত পড়িয়ে কোনোকিছু দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর গ্রন্থে স্বতন্ত্র অধ্যায় এনেছেন। সেখানে তিনি এই হাদিস উল্লেখ করেননি। এর দ্বারা বোঝা গেল, তাঁর কাছে এই

---

[৫১৫] *রাদ্দুল মুহতার* : ৯/৯৬।

[৫১৬] *আল-মুগনি* : ৭/৪৩৮।

[৫১৭] *ইলাউস সুনান* : ১১/১৭৮।

হাদিসটি তারাবির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অন্যথায় তিনি সে অধ্যায়ে এটি অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

৬. আকাবিরে দেওবন্দের ফাতওয়া

ক. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রাহ.

হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলি থানবি রাহ. তারাবির সালাত পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া হারাম হওয়া সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। শেষে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, কুরআন শিক্ষার ওপর তারাবির বিনিময়কে কিয়াস করা জায়িজ নয়। কেননা, কুরআন খতম দীনের আবশ্যক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, ফকিহগণ পরিষ্কার লিখেছেন, তাবাবির সালাতে কুরআন খতম সুন্নাত। এমনটাও বলে দিয়েছেন যে, যদি কোনো সম্প্রদায়ের ওপর খতম কষ্টকর হয়ে যায়, তাহলে তাদের জন্য খতম ছেড়ে দেওয়া উত্তম। এরপর তিনি এ সংশ্লিষ্ট *ফাতাওয়ায়ে শামির* পূর্বোল্লিখিত বাক্য উল্লেখ করে বলেন, '*ফাতাওয়া শামির* এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, তারাবির সালাতে কুরআন খতম দীনের অত্যাবশ্যক বিষয় নয়। এ জন্য দীনের যেসব বিষয়ের বিনিময় গ্রহণ জরুরতের কারণে জায়িজ হয়েছে, সেগুলো দ্বারা এটার বৈধতা কীভাবে প্রমাণিত হয়?'

আমাদের সমাজে তারাবি-সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু বিষয় সম্পর্কে তাঁর কাছে ফাতওয়া চাওয়া হয়েছিল। প্রথমে প্রশ্নগুলো দেখুন :

১. তারাবির হাফিজ সাহেবকে কিছু দেওয়া জায়িজ আছে? নাকি দেওয়া-নেওয়া উভয়টাই নাজায়িজ?

২. যদি বিনিময়বিহীন কোনো হাফিজ সাহেব পাওয়া না যায়, তাহলে বিনিময়ের মাধ্যমে হাফিজ সাহেব নির্ধারণ করবে? নাকি সুরা তারাবি পড়বে?

৩. যখন ইমামতির বিনিময় জায়িজ, তাহলে তারাবির সালাতে কুরআন খতম তো সুন্নাতে মুআক্কাদা। এর জন্য বিনিময় গ্রহণ জায়িজ নয় কেন?

উত্তরে থানবি রাহ. লেখেন,

১. আমি তো দেওয়া-নেওয়া উভয়টা নাজায়িজ মনে করি।

২. আমি তো সুরা তারাবি পড়ার কথা বলব।

৩. ফকিহগণ কুরআন খতম সুন্নাত বলেছেন। এর দ্বারা উদ্দশ্যে হলো সুন্নাতে মুআক্কাদা; কিন্তু তাঁরা এ কথাও লিখেছেন যে, যেখানে লোকদের জন্য

খতম তারাবি কষ্টকর হবে, সেখানে সুরা ফিল ও অন্যান্য সুরা দ্বারা তারাবি পড়া হবে। সুতরাং যখন জামাআতে অল্প লোক হবে—এই ভয়ে সুন্নাতকে ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। আর যেসব ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ, সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা এর চেয়ে অনেক বেশি। এ জন্য বিনিময়বিহীন হাফিজ পাওয়া না গেলে সুরা তারাবির নির্দেশ দেওয়া হবে, যেভাবে পূর্বের উত্তরে বলা হয়েছে।

আমাদের দেশে অনেকে একটি বাহানা গ্রহণ করেন। ইমামতির যেহেতু বিনিময় নেওয়া জায়িজ, এ জন্য হাফিজ সাহেবকে রমজানের পুরো মাসের ইমাম বানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাকে মোটা অঙ্কের বিনিময় দেওয়া হয়। এ বিষয়ে থানবি রাহ.-এর কাছে ফাতওয়া জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে তিনি বলেন, 'এই সুরতে জায়িজ হওয়ার ফাতওয়া তখন দেওয়া হবে, যখন ইমামতি উদ্দেশ্য হবে। অথচ এখানে উদ্দেশ্য হলো খতম তারাবি; সালাতের ইমামতি শুধু একটি বাহানা। এখানে বিষয়টি যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয়ে, এ জন্য এখানে হিলা বা বাহানা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ জন্য এই সুরতেও জায়িজ নয়।'[৫১৮]

খ. আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানি রাহ.

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লায় তিন জন হাফিজ সাহেব রয়েছেন, যারা মসজিদে সালাত পড়ান। একজন বয়সের দুর্বলতার কারণে তারাবির সালাত পড়াতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। আরেকজনের কণ্ঠ খারাপ হওয়ার কারণে অনীহা প্রকাশ করেছেন। অন্যজন এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হননি। তবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী। অর্থাৎ, তার বয়স ১২ বা ১৩ বছর হবে। সে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর সে ছাড়া শহরে অন্য কোনো হাফিজও নেই। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, এই সুরতে আমরা উজরত তথা বিনিময়ে অন্য শহর থেকে হাফিজ আনব, নাকি নাবালিগের পেছনে সালাত পড়ব?

উত্তর : এই সুরতে হয়তো যার সুর সুন্দর নয়, তার পেছনে সবাই ঐকমত্যের ভিত্তিতে তারাবির সালাত পড়বে; অথবা বয়সের ভারে দুর্বল হাফিজ সাহেবের পেছনে সুরা তারাবি পড়বে। বিনিময় দিয়ে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পেছনে তারাবি পড়া যাবে না।[৫১৯]

---

[৫১৮] *ইমদাদুল ফাতাওয়া* : ১/৪৭৫-৪৮৫।

[৫১৯] *ইমদাদুল আহকাম* : ২/২৬৯।

গ. আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রাহ.

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম সাহেব যদি হাফিজ না হন, আর মুসল্লিগণ কুরআন শোনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়, তখন কোনো হাফিজ সাহেবকে চাঁদা তুলে অথবা মসজিদের আমদানি থেকে টাকা দিয়ে তারাবি পড়ানো, এ ধরনের আদান-প্রদান জায়িজ কি না? অথবা ইমাম সাহেব কুরআনে হাফিজ; কিন্তু কোনো ওজরের কারণে তারাবির সালাত পড়াতে আগ্রহী নন, এমতাবস্থায় তাকে তথা বিনিময় দিয়ে কুরআন শোনার হুকুম কী? শ্রোতা ও কারির হুকুম অভিন্ন, নাকি আলাদা?

উত্তর : বিনিময় দিয়ে কুরআন শোনা শরিয়তে জায়িজ নয়। আদান-প্রদানকারী উভয়ে গুনাহগার হবে। যদি বিনিময় নির্দিষ্ট করা না হয় এবং কুরআন খতমের পর খুশি মনে কিছু দেওয়াও হয়, তা-ও বিশুদ্ধমতে জায়িজ নয়।[৫২০]

ঘ. মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.

প্রশ্ন : রমজানে হাফিজ সাহেবগণ টাকা নির্ধারণ করে ফেলল—যেমন, আপনারা যদি আমাকে ৬০ বা ৭০ রুপি দেন, তাহলে সালাত পড়াব, অন্যথায় নয়—এভাবে নির্দিষ্ট করা ঠিক কি না?

উত্তর : তারাবির সালাতে কুরআন খতমের বিনিময় নির্দিষ্ট করা—চাই সেটা প্রকাশ্যে হোক, যেভাবে কিছু লোক করে থাকে; অথবা সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হোক, যেমনটা আজকাল প্রচলিত—উভয় পদ্ধতি নাজায়িজ। এ ব্যাপারে মূলকথা হলো, কোনো ধরনের ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ জায়িজ নয়। কিন্তু পরবর্তী যুগের আলিমগণ প্রয়োজনের তাগিদে এ মূলনীতি থেকে কিছু বিষয় পৃথক করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ভিন্ন হুকুম এসব বিষয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট। অন্য ইবাদত তার মূল হুকুমের ওপর বাকি থাকবে। অর্থাৎ, এগুলোর বিনিময় গ্রহণ জায়িজ নয়। প্রয়োজনের তাগিদে যেসব ইবাদতকে পৃথক করা হয়েছে, তারাবির সালাত ও খতম তারাবিকে কেউ সেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি। এ জন্য তারাবির বিনিময় গ্রহণ জায়িজ নয়।[৫২১]

মুফতি শফি রাহ. এরপর *ফাতাওয়া শামির* পূর্বোক্ত ইবারাত উল্লেখ করে এ হুকুমের ব্যাপারে দালিলিক আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ সেটা দেখে নিতে পারেন।

---

[৫২০] *ফাতাওয়া খালিলিয়া* : ১২২।

[৫২১] *ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ* : ২/৩১৩।

ঙ. মুফতি মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহি রাহ.

প্রশ্ন : তারাবির হাফিজ সাহেবের জন্য গ্রাম থেকে যে চাঁদা তোলা হয়, এই চাঁদা হাফিজ সাহেবকে দেওয়া এবং হাফিজ সাহেবের জন্য গ্রহণ করা জায়িজ কি না? আর এমন হাফিজের পেছনে তারাবি পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : এই চাঁদা দেওয়া ও গ্রহণ জায়িজ নয়। এমন হাফিজ সাহেবের পেছনে তারাবি পড়া উচিত, যে তারাবির বিনিময় কোনোকিছু গ্রহণ করে না।[৫২২]

চ. মুফতি সাইয়িদ আবদুর রাহিম লাজপুরি রাহ.

প্রশ্ন : হাফিজ সাহেব আল্লাহর জন্য বিনিময় ব্যতীত তারাবি পড়ান, এখন মুসল্লিরা যদি খুশি হয়ে কিছু দেয়, তাহলে এর হুকুম কী? আর যদি বিনিময় পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে, তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : হাফিজ সাহেব যদি আল্লাহর জন্য তারাবির সালাত পড়ান, এরপর মুসল্লিরা খুশি হয়ে তাকে কিছু হাদিয়া দেয়, তাহলে তা জায়িজ আছে। কিন্তু বর্তমানে আদান-প্রদান প্রচলিত হয়ে গেছে। এ জন্য হাফিজ সাহেবদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং মুসল্লিরাও কিছু দেওয়ার চিন্তাফিকির করতে থাকে, এ জন্য খুশি হয়ে কিছু দেওয়াও বিনিময়ের পর্যায়ে হয়ে যায়। এ কারণে এমনটা করা মাকরুহ, গুনাহের কারণ হবে। হাফিজ সাহেবগণ কেন বড় বিনিময় থেকে নিজেদের মাহরুম করবেন![৫২৩]

ছ. শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

প্রশ্ন : রমজানে লোকজন হাফিজ সাহেবের জন্য চাঁদা তোলে। তাকে কাপড়সহ বিভিন্ন জিনিস দেয়; অথবা প্রথম থেকে টাকা নির্ধারণ করে হাফিজ সাহেবকে নিয়ে আসে, এগুলো জায়িজ কি না?

উত্তর : বিনিময় নির্ধারণ করে তারাবির সালাত পড়া সম্পূর্ণ হারাম। যদি বিনিময় ছাড়া হাফিজ পাওয়া না যায়, তাহলে সুরা তারাবি পড়বে। হ্যাঁ, যদি কোনো হাফিজ সাহেব বিনিময় ছাড়া তারাবি পড়ান এবং কোনো মুসল্লি সন্তুষ্টচিত্তে হাদিয়াস্বরূপ তাকে কিছু দেয়, তাহলে জায়িজ। কিন্তু আজকাল এমনভাবে দেওয়া হয় যে, এটাও একপ্রকার বিনিময় হয়ে যায়। এ জন্য এমনটা করা থেকেও বিরত থাকা

---

[৫২২] *ফাতাওয়া মাহমুদিয়া* : ২/৩৬০।

[৫২৩] *ফাতাওয়া রাহিমিয়া* : ৬/২৪৫।

চাই। এ ছাড়া এ উদ্দেশ্যে চাঁদা তোলার মধ্যে অনেক খারাপ দিক রয়েছে। এ জন্য এটা পরিহার করা চাই।[৫২৪]

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারাবির বিনিময় নিয়ে মাসআলাটি দীর্ঘ হয়ে গেল, আশা করি সচেতন পাঠকের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সত্য জেনে তার ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তেরো. সাদাকাতুল ফিতরের বিধান

রমজানের শেষদিকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতর। মূলত ইদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের পর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়; কিন্তু বেশিভাগ মানুষ রমজানের শেষ দিকেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করেন। রাসুল ﷺ সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। এ কারণে নবিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানগণ অন্যান্য ইবাদতের মতো এ ইবাদতও গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করে আসছেন। একটি দুর্বল বর্ণনায় এর দুটি হিকমাত উল্লেখ করা হয়েছে :

১. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ সাদাকাতুল ফিতরকে অপরিহার্য করেছেন—অর্থহীন, অশালীন কথা ও কাজে রোজার যে ক্ষতি, তা পূরণের জন্য এবং নিঃস্ব লোকের আহার জোগানোর জন্য।[৫২৫]

২. ইসলামি বিধান অনুযায়ী সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে এক সা' পরিমাণ যব, খেজুর, পনির কিংবা কিশমিশ অথবা এর সমপরিমাণ টাকা আদায় করতে হবে। সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা না হলে বড় গুনাহগার হবে।

এই সাদাকার পরিমাণ সম্পর্কে হাদিস ও সুন্নাহে দুটি মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে, সা' ও নিসফে সা'। যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ দ্বারা আদায় করলে এক সা' এবং গম দ্বারা আদায় করলে নিসফে সা' প্রযোজ্য হবে।

১. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

রাসুল ﷺ একজন ঘোষককে বলেন, সে যেন মক্কার পথে পথে ঘোষণা

---

[৫২৪] *ফাতাওয়া উসমানি* : ১/৪৬০।

[৫২৫] *সুনানু আবি দাউদ* : ১/২২৭।

করে—জেনে রেখো, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, গোলাম-স্বাধীন, ছোট-বড় সবার ওপর সাদাকাতুল ফিতর অপরিহার্য। দুই মুদ (আধা সা') গম কিংবা এক সা' অন্য খাদ্যদ্রব্য।[৫২৬]

২. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

রাসুল ﷺ সাদাকাতুল ফিতর অপরিহার্য করেছেন এক সা' খেজুর বা যব কিংবা আধা সা' গম—গোলাম-স্বাধীন, নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় প্রত্যেকের ওপর।[৫২৭]

৩. আবদুল্লাহ ইবনু সালাবা রা. বর্ণনা করেন,

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

রাসুল ﷺ ইদুল ফিতরের একদিন বা দুদিন আগে সাহাবিদের উদ্দেশে খুতবা দেন। সে খুতবায় তিনি বলেন, 'তোমরা প্রতি দুজনের পক্ষ থেকে এক সা' গম অথবা ছোট-বড় প্রত্যেকের মাথাপিছু এক সা' খেজুর বা এক সা' যব প্রদান করো।[৫২৮]

এ-সংক্রান্ত আরেকটি হাদিস উল্লেখ করে ইমাম তাহাবি রাহ. বলেন, 'অর্থাৎ, আসমা রা. জানিয়েছেন, নবিযুগে সাহাবিগণ সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে আধা সা' গম দিতেন। এটা অসম্ভব যে, রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ ছাড়া তাঁরা এই কাজ করতেন। কারণ, দীনের বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য কী, তা জানার একমাত্র সূত্র রাসুল ﷺ-এর শিক্ষা ও নির্দেশনা।[৫২৯]

এখানে একটি বিষয় আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। আমাদের দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বা বিভিন্ন দারুল ইফতা থেকে সাদাকাতুল ফিতরের যে মূল্যতালিকা প্রকাশিত হয়, সেটি মূলত সবচেয়ে কমদামি বস্তুর মূল্য হিসেবে। তবে যাদের সামর্থ্য আছে, তাদের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী পাঁচটির মধ্যে দামি বস্তু নির্ধারণ করে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম।

---

[৫২৬] *সুনানুত তিরমিজি* : ৬৭৪।

[৫২৭] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৬২২।

[৫২৮] *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ৫৭৮৫।

[৫২৯] *তাহাবি* : ৩১১৪।

১. টাকা দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে

ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর ফিকহ অনুযায়ী বাংলাদেশের বেশিভাগ মানুষ টাকা দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করেন। আমাদের দেশে কিছু ভাই বলাবলি করেন, টাকা দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করলে তা আদায় হবে না। কারণ, টাকা দ্বারা আদায় করার কথা হাদিসে পাওয়া যায় না। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে কয়েকটি নস তথা ভাষ্য পেশ করছি। এর মাধ্যমে আপনারা বাস্তবতা বুঝতে পারবেন :

১. ইমাম বুখারি রাহ. তাঁর *সহিহ বুখারিতে* মুআজ রা.-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি ইয়ামেনবাসীকে বলেন, 'তোমরা সাদাকার মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে কাপড় নিয়ে এসো। কেননা, সেটি তোমাদের জন্য অধিকতর সহজ এবং মদিনার সাহাবিগণের জন্যও অধিক উপযোগী।'[৫৩০]

ইমাম আবু হানিফা রাহ. এটিই বলেছেন। ইয়ামেনবাসীর জন্য কাপড় ছিল অধিকতর সহজ ও উপযোগী, এ জন্য তিনি সেটির নির্দেশ দেন। বর্তমানে টাকা অধিকতর সহজ ও উপযোগী, এ জন্য ফিকহে হানাফি অনুযায়ী টাকা দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করা উত্তম।

২. আতা রাহ. বর্ণনা করেন; 'উমর রা. সাদাকার ক্ষেত্রে টাকা ইত্যাদি গ্রহণ করতেন।'[৫৩১]

এবার আপনি বলুন, উমর রা. কি হাদিসের বিপরীত বা অনুত্তম আমল করেছেন?

৩. জুহাইর রাহ. বলেন, আমি আবু ইসহাককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমি সাহাবিগণকে পেয়েছি, তাঁরা রমজানের সাদাকায় খাদ্যের মূল্য-পরিমাণ দিরহাম আদায় করেছেন।'[৫৩২]

আপনি বলুন, সাহাবিগণ কি অনুত্তম কাজ করেছেন? তাঁরা কি হাদিস জানতেন না? তাদের আমল কি রাসুলের হাদিসবিরোধী?

৪. প্রসিদ্ধ তাবিয়ি হাসান বসরি রাহ. বলেন, 'সাদাকাতুল ফিতর দিরহাম দ্বারা প্রদান করতে কোনো সমস্যা নেই।'[৫৩৩]

এমন আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাবে। এবার আপনি বলুন, মাসআলাটি ইমাম

---

[৫৩০] *সহিহ বুখারি* : ১১৪৭।

[৫৩১] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ১০৫৩৯।

[৫৩২] প্রাগুক্ত : ১০৪৭২।

[৫৩৩] প্রাগুক্ত : ১০৪৭২।

আবু হানিফা রাহ. নিজে ইজতিহাদ করে বের করেছেন, নাকি অসংখ্য সাহাবি, তাবিয়ি এমন মত পোষণ করেছেন ও আমল করেছেন? এরপরও যারা প্রচার করেন, টাকা দ্বারা আদায় করা সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি নয়, তাদের আসল উদ্দেশ্য কী?

২. ইদগাহে যাওয়ার আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম

ইদ মুসলমানদের আনন্দের দিন। এই দিনে কেউ আনন্দ করবে, আবার কেউ করবে না, এমন হতে পারে না। এ জন্য রাসুল ﷺ ধনীদের সাদাকাতুল ফিতর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু গরিবের প্রয়োজন পূরণের জন্য সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ জন্য ইদগাহে যাওয়ার আগে আদায় করা উত্তম, যাতে ইদের আনন্দে গরিবও শরিক হতে পারে।

১. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ، وَتُطْعِمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

সুন্নাত হলো ইদের সালাতে যাওয়ার আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা।[৫৩৪]

২. ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

أَن النَّبِي ﷺ أَمر بِزَكَاة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى.

রাসুল ﷺ আমাদের ইদগাহে যাওয়ার আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৩৫]

৩. আমর ইবনু আউফ রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ.

রাসুল ﷺ ইদের সালাতে যাওয়ার আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৩৬]

যদি কোনো কারণবশত ইদের সালাতে যাওয়ার আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে পরে আদায় করতে হবে।

---

[৫৩৪] *আল-মুজামুল কাবির* : ১১২৯৬, তাবরানি।

[৫৩৫] *সহিহ বুখারি* : ১৫০৯; *সহিহ মুসলিম* : ৯৮৬।

[৫৩৬] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৪৪৩০।

নবম অধ্যায়

শাওয়াল : হজের প্রথম মাস

আরবি বর্ষপঞ্জিকার দশম মাস শাওয়াল। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাসের পর আসে শাওয়াল। এ মাসের প্রথম দিন ইদুল ফিতর। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর মুসলমানগণ মহা-আনন্দে ইদগাহে মিলিত হন। প্রথমে ইদ সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করছি।

এক. ইদগাহে হেঁটে যাওয়া ও ইদুল ফিতরে ইদগাহে যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া

ইদের দিন ইদগাহে হেঁটে যাওয়া ও ইদুল ফিতরের দিন ইদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে যাওয়া সুন্নাত।

১. আলি রা. বলেন,

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

সুন্নাত হলো ইদগাহে হেঁটে যাওয়া। ইদগাহে যাওয়ার পূর্বে কোনোকিছু খেয়ে যাওয়া।[৫৩৭]

ইমাম তিরমিজি রাহ. হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'অধিকাংশ আলিমের আমল এর ওপর। তারা ইদগাহে হেঁটে যাওয়া এবং ইদুল ফিতরের দিন কোনোকিছু খেয়ে ইদগাহে যাওয়াকে মুসতাহাব বলেছেন'[৫৩৮]

তবে ইদুল আজহার দিন মুসতাহাব হলো ইদগাহে যাওয়ার আগে কোনোকিছু না-খেয়ে সালাতের পর নিজের কুরবানির গোশত দ্বারা প্রথম খাওয়া।

---

[৫৩৭] *সুনানুত তিরমিজি* : ৫৩০।

[৫৩৮] প্রাগুক্ত : ৫৪২।

২. বুরায়দা রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُول الله ﷺ لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يَطعَمَ، وَلَا يَطعمُ يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

রাসুল ﷺ ইদুল ফিতরে কোনোকিছু না খেয়ে ইদগাহে যেতেন না; আর ইদুল আজহাতে ইদের সালাতের আগে কোনোকিছু খেতেন না।[৫৩৯]

দুই. ইদের দিন সাধ্যমতো ভালো কাপড় পরিধান করা

ইদের দিন নিজের সাধ্যমতো ভালো কাপড় পরিধান করা মুসতাহাব। নতুন কাপড় কেনার সামর্থ্য থাকলে কিনবে, সামর্থ্য না থাকলে নিজের ব্যবহৃত পোশাকের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যে কাপড়, সেটি পরিষ্কার করে পরিধান করবে।

১. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ.

রাসুল ﷺ ইদের দিন লাল চাদর পরিধান করতেন।[৫৪০]

ইমাম হায়সামি রাহ. হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি রাহ. *আল-মুজামুল আওসাতে* বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীগণ সিকাহ।'[৫৪১]

২. জাবির রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الأَحْمَرَ فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ.

রাসুল ﷺ ইদ ও জুমুআর দিন লাল চাদর পরতেন।[৫৪২]

৩. নাফি রাহ. বর্ণনা করেন,

ইবনু উমর রা. উভয় ইদের দিনে সবচেয়ে ভালো কাপড় পরিধান করতেন।[৫৪৩]

তিন. কোনো ওজর না থাকলে ইদগাহে সালাত পড়া

ইদের সালাত ইদগাহে পড়া সুন্নাত। তবে বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে ইদগাহে পড়া সম্ভব না হলে মসজিদে পড়া যেতে পারে।

---

[৫৩৯] *সুনানুত তিরমিজি* : ৫৩০।

[৫৪০] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৭৬০৯, তাবরানি।

[৫৪১] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩২০৮।

[৫৪২] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৬১৯৭, বায়হাকি।

[৫৪৩] প্রাগুক্ত : ৬৩৬৩।

১. আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত;

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

রাসুল ﷺ ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার দিন ইদগাহে যেতেন। ইদগাহে প্রথমে সালাত পড়তেন। এরপর মানুষের দিকে ফিরে ওয়াজ ও অসিয়ত করতেন। মানুষ কাতারে বসা থাকত। কোনো বাহিনী পাঠানোর থাকলে এখান থেকেই পাঠাতেন। কোনো নির্দেশ দেওয়ার থাকলে এখান থেকেই দিতেন।[৫৪৪]

২. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ.

একবার ইদের দিন বৃষ্টি হলে রাসুল ﷺ তখন মসজিদে ইদের সালাত পড়েন।[৫৪৫]

চার. ইদের দিন পরস্পরকে অভিবাদন জানানো

আমরা অনেকে ইদের দিন একে অপরকে 'ইদ মুবারক' বলে অভিবাদন জানাই। সাহাবিগণও ইদের দিন পরস্পরকে অভিবাদন জানাতেন। তবে 'ইদ মুবারক' বলে নয়; 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম' বলে।

জুবায়ের ইবনু নুফায়ের রাহ. বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

রাসুলের সাহাবিগণ ইদের দিন যখন পরস্পর দেখা করতেন, তখন একে অপরকে বলতেন, 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা'। অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের ও আপনার ভালো কাজ' লো (ইবাদত-বন্দেগি) কবুল করুন।[৫৪৬]

ইমাম বায়হাকি রাহ. তাঁর *আস-সুনানুল কু ়রায়* এ ব্যাপারে একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন এভাবে—**'ইদের দিন পরস্পরকে তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা**

[৫৪৪] *সহিহ বুখারি* : ৯৫৬।
[৫৪৫] *সুনানু আবি দাউদ* : ১১৬০।
[৫৪৬] *ফাতহুল বারি* : ২/৩৭১।

বলা সম্পর্কে'। সেখানে তিনি এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

খালিদ ইবনু মাদান বলেন, আমি ওয়াসিলা ইবনু আসকার সঙ্গে ইদের দিন সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলি, 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা।' তিনিও আমাকে বললেন, 'হ্যাঁ, তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা।' ওয়াসিলা বলেন, 'আমি রাসুলের সঙ্গে ইদের দিন সাক্ষাৎ করি। তাঁকে বলি, 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা।' তিনিও আমাকে বলেন, 'হ্যাঁ, তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা।'[৫৪৭]

উমর ইবনু আবদিল আজিজ রাহ.-এর গোলাম আদহাম বর্ণনা করেন, 'আমরা উমর ইবনু আবদিল আজিজকে ইদের দিন "তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা" বলি। তিনিও আমাদের এমনটি বলেছেন; অস্বীকার করেননি।'[৫৪৮]

এ জন্য চাইলে ইদের দিন পরস্পরকে অভিবাদন জানানো যাবে। এ ক্ষেত্রে হাদিসের শব্দ দ্বারা জানানো উত্তম। ইদ মুবারকের জায়গায় 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা' বলা যেতে পারে। তবে নিয়ত সঠিক রেখে ইদ মুবারক বলতে আপত্তি নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

পাঁচ. সহিহ হাদিসের আলোকে অতিরিক্ত ছয় তাকবির

সুন্নাহসম্মত মতপার্থক্য নিয়ে কখনো এত কাদা ছোড়াছুড়ি ছিল না সমাজে। ইদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির যেমন সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক তেমনি অতিরিক্ত ১২ তাকবিরও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবি ও তাবিয়িনের একটি জামাআত অতিরিক্ত ছয় তাকবির দিয়েছেন। আবার এক জামাআত অতিরিক্ত ১২ তাকবির দিয়েছেন; কিন্তু এক জামাআত অপর জামাআতের আমল বাতিল বা জাল আখ্যা দেননি। সবাই নিজ নিজ মতের ওপর আমল করেছেন। লা-মাজহাবি ভাইয়েরা প্রথম সুর ওঠালেন—'অতিরিক্ত ছয় তাকবির সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ছয় তাকবির সম্পর্কিত সব বর্ণনা জাল। আমাদের সহিহ হাদিসের আলোকে ইদের সালাতে ১২ তাকবির দিতে হবে।' এ জন্য এখানে অতিরিক্ত ছয় তাকবির-সংক্রান্ত হাদিসগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

১. প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আবু আবদির রাহমান কাসিম বলেন,

حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا، النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ

---

[৫৪৭] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৬৫১৯, বায়হাকি।

[৫৪৮] *আস-সুনানুল কুবরা* : ৬৫২১।

أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ.

আমার কাছে রাসুলের কিছু সাহাবি বর্ণনা করেছেন; তাঁরা বলেন, আমাদের নিয়ে রাসুল ﷺ ইদের সালাত পড়েন। তিনি চারটি করে তাকবির দেন। সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বলেন, 'তোমরা ভুলে যেয়ো না, ইদের তাকবির জানাজার তাকবিরের মতো।' রাসুল ﷺ তখন বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে অবশিষ্ট চারটি দ্বারা ইশারা করেন।[৫৪৯]

ইমাম তাহাবি রাহ. হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'হাদিসটি হাসান। হাদিসে বর্ণনাকারী সবাই সহিহ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ এবং ১২ তাকবিরের বর্ণনাকারীদের থেকে অধিক শক্তিশালী। সুতরাং যদি সমাধান সনদের বিশুদ্ধতা দিয়ে করতে হয়, তাহলে বিপরীত হাদিসের তুলনায় এ হাদিস গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসংগত।'

২. প্রসিদ্ধ তাবিয়ি মাকহুল রাহ. বর্ণনা করেন,

أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.

আমাকে আবু হুরায়রা রা.-এর সহচর আবু আয়েশা জানিয়েছেন যে, সায়িদ ইবনুল আস রা. আবু মুসা আশআরি ও হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.-কে জিজ্ঞেস করেন, 'রাসুলের ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার তাকবির কেমন ছিল?' আবু মুসা বললেন, 'তিনি জানাজার মতো চার তাকবির বলতেন।' হুজায়ফা রা. (আবু মুসার সমর্থনে) বললেন, 'তিনি সত্য বলেছেন।'

আবু মুসা আরও বলেন, 'আমি যখন বসরার আমির হিসেবে সেখানে ছিলাম, তখন চার তাকবির দিয়েছি।'[৫৫০]

---

[৫৪৯] *তাহাবি* : ২/৩৭১।

[৫৫০] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : [illegible] *সুনানু আবি দাউদ* : ১১৫০।

তবে মুসান্নাফের বর্ণনায় কিছুটা অতিরিক্ত রয়েছে। হাদিসের বর্ণনাকারী আবু আয়েশা বলেন, ‘সায়িদ ইবনুল আসের এই প্রশ্নের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আরও বলেন, ‘আবু মুসার বাক্য “জানাজার মতো চার তাকবির” এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে।’

আমাদের দেশে যারা ছয় তাকবিরের হাদিস জাল বলে থাকেন, তাদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি হলেন শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ.। তিনি বলেন, ‘হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ রাহ. ‘হাসান’সূত্রে বর্ণনা করেছেন।’[৫৫১]

৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেন,

التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ.

উভয় ইদের সালাতে জানাজার সালাতের মতো চার তাকবির দিতে হবে।[৫৫২]

ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, ‘হাদিসটি ইমাম তাবরানি রাহ. *আল-মুজামুল কাবিরে* উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী সবাই সিকাহ।’[৫৫৩]

৪. প্রসিদ্ধ তাবিয়ি মাসরুক রাহ. বলেন,

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. ইদের সালাতে আমাদের নয় তাকবির শিখিয়েছেন—প্রথম রাকআতে পাঁচটি ও দ্বিতীয় রাকআতে চারটি।[৫৫৪]

৫. জানাজার মতো দুই ইদের তাকবির চারটি হওয়ার ব্যাখ্যা খোদ ইবনু মাসউদের বিভিন্ন আলোচনায় রয়েছে। এখানে তাঁর একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি—

أَرْسَلَ الْوَلِيدُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا عِيدُ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ فَقَالُوا: سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْكَعُ فَتِلْكَ خَمْسٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ فِي آخِرِهِنَّ فَتِلْكَ تِسْعٌ فِي الْعِيدَيْنِ ، فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

---

[৫৫১] *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহিহা* : ২৯৯৭।

[৫৫২] *...-মুজামুল কাবির* : ৯৫২২, তাবরানি।

[৫৫৩] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩২৫১, হায়সামি।

[৫৫৪] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৫৭৪৬।

কুরদুস রাহ. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, ওয়ালিদ, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, হুজায়ফা, আবু মাসউদ ও আবু মুসা আশআরি রা.-এর কাছে ইশার সালাতের পর এ কথা জিজ্ঞেস করতে লোক পাঠান যে, 'মুসলমানদের ইদ অত্যাসন্ন। এর সালাতের নিয়ম কী হবে?' (সাহাবিগণ) সবাই আগত ব্যক্তিকে বলেন, 'আবু আবদির রাহমান (ইবনু মাসউদ)-কে জিজ্ঞেস করুন।' লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তিনি উত্তরে বলেন, 'সালাতে দণ্ডায়মান হবে ও চার তাকবির বলবে। এরপর সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা তিলাওয়াত করবে। তারপর রুকুর তাকবির দিয়ে রুকু করবে। (প্রথম রাকআতে এই পাঁচ তাকবির হলো)

সিজদা থেকে উঠে দ্বিতীয় রাকআতের শুরুতে সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা তিলাওয়াত করবে। তারপর চার তাকবির দেবে ও শেষ তাকবিরের সময় রুকু করবে। দুই রাকআতে মোট নয় তাকবির হলো। এটিই উভয় ইদের নিয়ম।' উপস্থিত সাহাবিগণ তখন কেউ তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেননি।[৫৫৫]

ইমাম হায়সামি রাহ. বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি রাহ. *আল-মুজামুল কাবিরে* উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারীগণ সিকাহ।'[৫৫৬]

এখানে অনেক সাহাবি ও তাবিয়ির আমল উল্লেখ করা যাবে। আল্লামা নিমাবি রাহ. *আসারুস সুনান* ও আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানি রাহ. *ইলাউস সুনানে*[৫৫৭] এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক গ্রন্থ দুটি থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা অধ্যয়ন করে নিতে পারেন।

মোটকথা, অতিরিক্ত ১২ তাকবির যেমন সহিহ হাদিসে রয়েছে, তেমনি অতিরিক্ত ছয় তাকবিরও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবিগণের বিশাল জামাআত ইদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের প্রবক্তা ছিলেন। এ জন্য ছয় তাকবিরকে জাল বলা ভুল ও ধৃষ্টতা। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

ছয়. শাওয়ালের ছয় রোজা এক বছর রোজা রাখার নামান্তর

শাওয়াল মাসের বিশেষ আমলের মধ্যে অন্যতম এ মাসে ছয়টি রোজা রাখা। হাদিসে শাওয়ালের ছয় রোজার বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

---

[৫৫৫] *আল-মুজামুল কাবির* : ৯৫১৪, তাবরানি।

[৫৫৬] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৩১৪৭।

[৫৫৭] *ইলাউস সুনান* : ৮/১২৭-১৪৫।

১. আবু আইয়ুব রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

যে রমজানের রোজা রাখল, এরপর শাওয়ালে আরও ছয়টি রোজা রাখল, তাহলে সে ছয় রোজা পুরো বছর রোজা রাখার নামান্তর।[৫৫৮]

২. সাওবান রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

যে ইদুল ফিতরের পর ছয়টি রোজা রাখবে, সে সারা বছর রোজা রাখার সাওয়াব পাবে।[৫৫৯]

৩. হাদিসটি *সাহিহ ইবনু হিব্বানে* এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ صَامَ رَمَضَان وَسِتًّا مِنْ شَوَّال فَقَدْ صَامَ السَّنَة.

যে রমজানের রোজা রাখল, এর পর শাওয়ালে ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।[৫৬০]

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ.

যে রমজানে রোজা রাখল, এর পর শাওয়ালে ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।[৫৬১]

৫. ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

যে রমজানে রোজা রাখল, এর পর শাওয়ালে ছয়টি রোজা রাখল, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হবে, যেন সে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।[৫৬২]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি ইমাম তাবরানি রাহ. *আল-মুজামুল আওসাতে* বর্ণনা করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী মাসলামা ইবনু আলি আল খুশানি। তিনি দুর্বল।'[৫৬৩]

---

[৫৫৮] *সহিহ মুসলিম* : ১১৬৪; *সুনানুত তিরমিজি* : ৭৫৯।

[৫৫৯] *ইবনু মাজাহ* : ১৭১৫।

[৫৬০] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩৬৩৫।

[৫৬১] *মুসনাদু বাজ্জার* : ৮৩৩৪।

[৫৬২] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৪৯৭৯, তাবরানি।

[৫৬৩] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫১০২।

৬. জাবির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا.

যে রমজানে রোজা রাখল, এর পর শাওয়ালে ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।[৫৬৪]

শাওয়ালের ছয় রোজা সম্পর্কিত অনেক হাদিস আছে, যেগুলোর মূল বক্তব্য হলো, শাওয়ালে কেউ যদি ছয়টি রোজা রাখে, আল্লাহ তাকে পুরো বছর রোজা রাখার সাওয়াব দান করেন। আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দিন।

সাত. ইদুল ফিতরের রাত ও দিনে বিশেষ সালাত

১. ইদুল ফিতরের রাতে বিশেষ সালাত

শাওয়ালের প্রথম চাঁদের রাত তথা ইদুল ফিতরের রাতে অনেকে বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত পড়ে থাকেন। এ বিশেষ সালাতের ফজিলত সম্পর্কে ইবনু মাসউদের সূত্রে একটি বর্ণনা পেশ করা হয়। প্রথমে বর্ণনাটি দেখুন, রাসুল ﷺ বলেন,

وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَخْبَرَنِي عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنْ ربه مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْفِطْرِ مِائَةَ رَكْعَةٍ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَة الْحَمد مرّة وَقل هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ مِائَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمهُمَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا إِلَهَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَتَقَبَّلْ صَوْمِي وَصَلاتِي، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ عزوجل لَهُ وَيَتَقَبَّلَ مِنْهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَتَجَاوَزَ عَنْ ذُنُوبِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَذْنَبَ سَبْعِينَ ذَنْبًا كُلُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنْ جَمِيعِ النَّارِ وَيَتَقَبَّلُ مِنْ كَوْرَتِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ. قَالَ قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ خَاصَّةً وَمِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِهِ عَامَّةً. قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا مِنْ مُصَلٍّ هَذهِ الصَّلاةَ وَاسْتَغْفَرَ هَذَا الاسْتِغْفَارَ فَإِنَّ الله عزوجل يَتَقَبَّلُ صَلاتَهُ وَصِيَامَهُ

[৫৬৪] *মুসনাদু আহমাদ*: ১৪৩০২।

لأَنَّ اللهَ عزوجل قَالَ فِي كِتَابِهِ (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّه كَانَ غفارًا) ثُمَّ قَالَ: (تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) وَقَالَ: (وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُور رَحِيم) وَقَالَ: (وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذهِ لأُمَّتِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لن يُعْطِهَا لِمَنْ كَانَ قَبْلِي.

যিনি আমাকে সত্য হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, জিবরিল আ. আমাকে ইসরাফিলের সূত্রে আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেন, 'যে ইদুল ফিতরের রাতে ১০০ রাকআত সালাত পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা একবার, সুরা ইখলাস ১০ বার, সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ১০ বার, নামাজান্তে ১০০ বার ইসতিগফার, এরপর সিজদায় গিয়ে এই দুআ পড়বে—আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, সে সিজদা থেকে মাথা তোলার আগে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তার রমজানের ইবাদত কবুল করে নেবেন। তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। যদিও সে ৭০ জন গুনাহগারের পরিমাণ গুনাহ করে এবং একেকটি গুনাহ পুরো জাহান্নাম থেকে বড় হয়। তাদের এলাকার সকলের রমজানের ইবাদত কবুল করে নেবেন।'

রাসুল ﷺ বলেন, আমি জিবরিলকে জিজ্ঞেস করি, 'এটি কি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট, নাকি সকল শহরের অধিবাসীদের জন্য?' জিবরিল বলেন, 'যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবার সালাত আল্লাহ কবুল করবেন এবং তাদের দুআয় সাড়া দেবেন। যে এই সালাত পড়বে ও ইসতিগফার করবে, আল্লাহ তার সালাত ও রোজা কবুল করবেন। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। এরপর বলেন, তোমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্তম পাথেয় দান করবেন। তিনি আরও বলেন, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়াবান। তিনি আরও বলেন, তোমরা তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।' রাসুল ﷺ বলেন, এটি আমার উম্মতের প্রত্যেক পুরুষ এবং মহিলার জন্য।'

যদি এ সালাত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে তো মাশাআল্লাহ এক সালাতে কেল্লা ফতেহ; কিন্তু এ বর্ণনা জাল। রাসুলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। দুষ্ট লোকেরা হাদিস জাল করে রাসুলের নামে চালিয়ে দিয়েছে।

ইমাম ইবনুল জাওজি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি যে জাল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর বর্ণনাকারীদের বড় একটি দল মাজহুল।'[৫৬৫] হাফিজ জালালুদ্দিন সুয়ুতি ও ইবনু আররাক কাত্তানি ইবনুল জাওজির বক্তব্য সমর্থন করেছেন।[৫৬৬] ইমাম শাওকানি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি জাল এবং বর্ণনাকারীগণ মাজহুল।'[৫৬৭]

মোটকথা, রাসুলের সঙ্গে এ বর্ণনার কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্য ইদুল ফিতর উপলক্ষ্যে বিশেষ কোনো সালাত পড়া পরিষ্কার বিদআত। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

২. ইদুল ফিতরের দিন বিশেষ সালাত

ইদুল ফিতরের রাতের মতো দিনের বিশেষ সালাতের কথা শোনা যায় অনেকের মুখে। প্রথমে এ-সংক্রান্ত বর্ণনাটি দেখুন। সালমান ফারসি রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

> مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْفطر بعد مَا يُصَلِّي عِيدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسبح اسْم رَبك الاعلى وفى الثَّانِيَة بالشمس وَضُحَاهَا، وفى الثَّالِثَة وَالضُّحَى، وَفِي الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ كُلَّ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَلَى أَنْبِيَائِهِ، وَكَأَنَّمَا أَشْبَعَ جَمِيعَ الْيَتَامَى وَدَهَنَهُمْ وَنَظَّفَهُمْ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَيُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً.
>
> যে ইদুল ফিতরের দিন ইদের সালাতের পর চার রাকআত সালাত পড়বে, প্রথম রাকআতে সুরা ফাতিহা ও সুরা আলাক, দ্বিতীয় রাকআতে সুরা শামস, তৃতীয় রাকআতে সুরা জুহা এবং চতুর্থ রাকআতে সুরা ইখলাস পড়বে; সে যেন নবিগণের ওপর যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, সবগুলো পড়ে নিল, সে যেন সমস্ত ইয়াতিমের পেট ভরে খাওয়াল। তাদের শরীরে তেল মালিশ করে দিলো এবং তাদের

---

[৫৬৫] *কিতাবুল মাওজুআত*: ২/১৩১।
[৫৬৬] *আল-লাআলিল মাসনুআ*: ২/৫০; *তানজিহুশ শারিয়াতিল মারফুআ*: ২/৯৩।
[৫৬৭] *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমুআ*: ১০৭।

পরিচ্ছন্ন করে দিলো। সূর্য উদয় হওয়ার পরিমাণ নেকি সে পাবে এবং তার জীবনের ৫০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

অন্যান্য বর্ণনার মতো এটিও সহিহ নয়। রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। এটি জাল ও বানোয়াট।

আল্লামা ইবনুল জাওজি রা. বলেন, 'বর্ণনাটি জাল। বর্ণনাকারী অনেকেই মাজহুল। আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ নামের একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান রাহ. বলেন, কিতাবাদিতে তাঁর নাম উল্লেখ করা জায়িজ নেই।'[৫৬৮]

আল্লামা ইবনু আররাক কাত্তানি রাহ. বলেন, 'জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. বলেছেন, সালামা ইবনু শাবিব একই সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা দায়লামি *মুসনাদুল ফিরদাউসে* উল্লেখ করেছেন।' ইবনু আররাক আরও বলেন, 'সালামা ইবনু শাবিব হলেন মুসলিমের বর্ণনাকারী; কিন্তু তাঁর থেকে বর্ণনাকারী ফাজল ইবনু মুহাম্মাদ আল জুনদি, তাকে আমি চিনি না। সম্ভবত সে চুরি করেছে এবং এ সনদ জুড়ে দিয়েছে।'[৫৬৯]

মোটকথা, ইদুল ফিতরের রাত ও দিনে কোনো বিশেষ সালাত রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। এ জন্য উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিশেষ সালাত আদায় করা শরিয়তসম্মত নয়; বরং বিদআত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আট. আমরা কেন সৌদির সঙ্গে ইদ করি না

বর্তমানে এ মাসআলা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। চাঁদপুরসহ আমাদের দেশের আরও কিছু অঞ্চলের মানুষ সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে ইদ উদ্‌যাপন করেন।

লা-মাজহাবিদের কিছু শায়খ সৌদির সঙ্গে মিল রেখে একই দিনে রোজা ও ইদ পালনের পক্ষে কথা বলেন। যদিও কিয়াসকে তারা থোড়াই কেয়ার করেন; কিন্তু এ মাসআলায় এসে তারা কিয়াসের স্রোত বইয়ে দেন।

প্রযুক্তির কল্যাণে জনসাধারণ অনেক কিছু চোখ বন্ধ করে গেলে। এ মাসআলা নিয়ে এখন হইচই হয়—কেন আমরা তাদের সঙ্গে মিলে ইদ করি না? অথচ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, সেখানে ইদের চাঁদ উদয় হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে কিছু কথা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

---

[৫৬৮] *কিতাবুল মাওজুআত* : ২/১৩১।

[৫৬৯] *তানজিহুশ শারিয়াতিল মারফুআ* : ২/১০৮।

এ মাসআলায় মূলকথা, পৃথিবীর কোথাও যদি চাঁদ উদয় হয়, তাহলে দূরদূরান্তের মুসলমানদের ওপর ইদ ও রোজা রাখা আবশ্যক হয় কি না। যেমন : সৌদিতে আজ চাঁদ উঠল, তাহলে বাংলাদেশের মুসলমানের ওপর পরদিন ইদ ও রোজা রাখা আবশ্যক হবে কি না? আমাদের মাজহাবমতো ওয়াজিব হবে না। বরং বাংলাদেশের আকাশে যখন চাঁদ দেখা যাবে, তখন আমাদের ওপর রোজা ও ইদ পালন ফরজ হবে। এটিই হানাফি মাজহাবের গ্রহণযোগ্য ফাতওয়া।

কোনো ব্যাপার সামনে এলে প্রথমে আমরা দেখব রাসুল ﷺ বা সাহাবিগণ থেকে এ ব্যাপারে কোনো দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় কি না। এখানে প্রথমে বিখ্যাত তাবিয়ি কুরাইব রাহ.-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, আমাকে আমার মালিক ইবনু আব্বাস মুআবিয়ার কাছে সিরিয়ায় পাঠান। আমি যখন প্রয়োজন শেষ করি, এমতাবস্থায় রমজান চলে এল। আমরা সিরিয়ায় জুমুআর রাতে চাঁদ দেখলাম। মাসের শেষ দিকে আমি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি। ইবনু আব্বাস রা. তখন আমাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমি বলি, 'আমরা জুমুআর রাতে চাঁদ দেখেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি নিজে দেখেছ?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি এবং লোকজনও চাঁদ দেখে রোজা রেখেছে। এমনকি মুআবিয়াও রোজা রেখেছেন।' ইবনু আব্বাস বললেন, 'কিন্তু আমরা চাঁদ দেখেছি শনিবার। সুতরাং আমরা মাস ৩০ দিন হওয়া পর্যন্ত অথবা ২৯ তারিখে চাঁদ না-দেখা পর্যন্ত রোজা ছাড়ব না।' তখন আমি তাঁকে বলি, 'আপনার জন্য কি মুআবিয়ার চাঁদ দেখা ও রোজা রাখা যথেষ্ট নয়?' তিনি বললেন, 'না, রাসুল ﷺ আমাদের এভাবে আমল করতে আদেশ দিয়েছেন।'[৫৭০]

লক্ষ করুন, শামবাসী চাঁদ দেখেছে মদিনার একদিন আগে। সে হিসেবে মদিনাবাসী নিশ্চিত প্রথম রোজা ভেঙেছে। কিন্তু ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন, আমরা শামবাসীর চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল নই; বরং আমরা ইদ করব মদিনায় চাঁদ দেখে। এ হাদিস থেকে স্পষ্ট হলো, সৌদি আরবে চাঁদ দেখা গেলে বাংলাদেশে রোজা ও ইদ কোনোটিই ফরজ হয় না। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের উদয়স্থলে চাঁদ দেখার পর ইদ করবে।

তাবিয়িনের একটি বড় দলের মত ছিল ইবনু আব্বাসের মতো। ইমাম ইবনু আবদিল বার আল মালিকি রাহ. লেখেন, 'ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; ইদ ও রোজার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরে চাঁদ দেখতে হবে। (এক জায়গায় দেখলে অন্য জায়গায়

---

৫৭০ *সহিহ মুসলিম* : ১০৮৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৭৮৯; *সুনানুত তিরমিজি* : ২৩৩২।

আবশ্যক হবে না) এমনটি বলেছেন ইকরিমা, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, সালিম ইবনু আবদিল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক, ইসহাক ইবনু রাহুয়াইহসহ অনেকে।'[৫৭১] অন্য জায়গায় তিনি বলেন, 'এমনটি আমারও মাজহাব। কেননা, এর পক্ষে রাসুল ﷺ থেকে আসার বর্ণিত আছে। হাদিসটি হাসান, দলিল দেওয়ার উপযুক্ত।'

ইমাম তিরমিজি রাহ. তাঁর *কিতাবুস সিয়ামের* নবম পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে—অর্থাৎ, **'এ পরিচ্ছেদ প্রত্যেক শহরে তাদের আকাশে চাঁদ দেখে রোজা ও ইদ করা সম্পর্কে'**। সেখানে তিনি ইবনু আব্বাসের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, যা প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'ইবনু আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি সহিহ। এর ওপর ইমামদের আমল। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক শহরে চাঁদ দেখা গেলে তাদের ওপর আমল জরুরি হবে। (যেকোনো এক জায়গায় দেখা গেলে অন্য সবার জন্য রোজা ও ইদ ফরজ হবে না।)'[৫৭২]

এবার আপনি বলুন, রাসুলের শিক্ষা, সাহাবি, তাবিয়ি ও অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমামের কথা হলো, কোনো এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে সবার ওপর রোজা ও ইদ আবশ্যক হয় না। তাহলে সৌদি আরবে চাঁদ দেখা গেলে বাংলাদেশিরা তাদের সঙ্গে রোজা ও ইদ করবে কেন?

নয়. সারা বিশ্বে একই দিনে ইদ করা কি ইমাম আবু হানিফার মাজহাব

আবদুর রাশিদ বুখারির *খুলাসাতুল ফাতাওয়ার* একটি বাক্যের কারণে দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছে। সে বাক্যের কারণে কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু হানিফার মত হলো, সারা বিশ্বে একই দিনে ইদ ও রোজা রাখা হবে। সেখানে বলা হয়েছে,

> কোনো শহরের লোকজন যদি চাঁদ দেখে ৩০টি রোজা পূর্ণ করে, অপর শহরের লোকজনও চাঁদ দেখে ২৯টি রোজা রাখে, তাহলে তারা একটি রোজার কাজা করবে। জাহিরুর রিওয়ায়াহ তথা হানাফি মাজহাবের মৌলিক ছয়টি গ্রন্থের কোনো একটির বর্ণনা অনুযায়ী চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়।[৫৭৩]

আবদুর রাশিদ বুখারি রাহ. ইনতিকাল করেছেন ৫৪২ হিজরিতে। তিনিই প্রথম জাহিরুর রিওয়ায়াহ হিসেবে এ মাসআলা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনু আবিদিন

[৫৭১] *আল-ইসতিজকার* : ৪/২১১।

[৫৭২] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৩৩২।

[৫৭৩] *খুলাসাতুল ফাতাওয়া* : ১/২৪৯, আবদুর রাশিদ বোখারি।

শামিসহ আরও অনেকে তাঁর অনুসরণ করে মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন।

চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া হানাফি মাজহাবের জাহিরুর রিওয়ায়াহ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ লিখিত ছয়টি গ্রন্থ—জাহিরুর রিওয়ায়াহ—*কিতাবুল আসল*, অপর নাম *আল-মাবসুত*, *আল-জামিউস সাগির*, *আল-জামিউল কাবির*, *আস-সিয়ারুস সাগির*, *আস-সিয়ারুল কাবির* ও *আজ জিয়াদাত*। আলহামদুলিল্লাহ, ছয়টি গ্রন্থই এখন পাওয়া যায়; কিন্তু ছয় গ্রন্থের কোনো গ্রন্থেই এ ধরনের মাসআলা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়াকে হানাফি মাজহাবের জাহিরুর রিওয়ায়াহ বলার সুযোগ নেই। বাকি ইমাম আবু ইউসুফের এ বক্তব্যটি কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকেন, 'আবু ইউসুফ রাহ. *আল-আমালি* গ্রন্থে বলেন, কোনো শহরবাসী যদি চাঁদ দেখে ২৯টি রোজা রাখে; আর অন্য শহরের লোকেরা চাঁদ দেখেই ৩০টি রোজা রাখে, তাহলে যারা ২৯টি রোজা রেখেছে, তাদের একটি রোজা কাজা করতে হবে।'[৫৭৪]

এখানে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা ও ইদ করার কথা বলেননি; বরং এক শহরের খবর অন্য শহরে গেলে যারা ২৯টি রোজা রেখেছে, তাদের একটি কাজা করার কথা বলেছেন। প্রশ্ন হলো, এ বিধান নিকটবর্তী শহরের জন্য, নাকি দূরবর্তী শহরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

ইমাম আবু ইউসুফের এ বক্তব্য নিকটবর্তী শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাজার বছর আগে হানাফি ফকিহগণ সেটির সমাধান করে দিয়েছেন।

ইমাম কুদুরি রাহ. বলেন, 'যদি দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব এই পরিমাণ হয় যে, উদয়স্থল ভিন্ন হয় না, তাহলে কাজা করবে। তবে দূরত্ব বেশি হলে এক শহরের বিধান অপর শহরে প্রযোজ্য হবে না। কারণ, শহরের উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে থাকে।'[৫৭৫]

ইমাম হুসামুদ্দিন শাহিদ রাহ. বলেন, 'কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ৩০ দিন রোজা রাখে; আর অন্য শহরের অধিবাসীরা ২৯ দিন রোজা রাখে, এরপর ২৯ রোজা আদায়কারীগণ যদি তা জানতে পারে, তাহলে তাদের একটি রোজা কাজা করতে হবে। কারণ, যারা ৩০ রোজা রেখেছে, তারা এক রাত আগে চাঁদ দেখেছে। আর আমল তো তাদের কথা অনুযায়ী হওয়া চাই, যারা (চাঁদ) দেখেছে।

---

৫৭৪ *উয়ুনুল মাসায়িল* : ৩৮।

৫৭৫ *শারহু মুখতাসারিল কারখি*, গ্রন্থটির মাখতুতা (পাণ্ডুলিপি) মক্কার উম্মুল কুরা লাইব্রেরিতে আছে। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দা.বা. মাওলানা তহা হুসাইন দানিশের মাধ্যমে মাখতুতাটি সংগ্রহ করেছেন ও মিলিয়ে দেখেছেন। বাবুল ইতিকাফের দুই পৃষ্ঠা আগে মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের কথা অনুসারে নয়, যারা দেখেনি। এ (বিধান) ওই ক্ষেত্রে, যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, এদের উদয়স্থল আলাদা না হয়। উদয়স্থল আলাদা হলে কোনো শহরের বিধান অন্য শহরের জন্য অনুসরণীয় হবে না।'[৫৭৬]

ইমাম ওয়ালওয়ালিজি রাহ. বলেন, 'এ বিধান এমন দুই শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে দুই শহরের উদয়স্থল অভিন্ন। যদি উদয়স্থল ভিন্ন হয়, তাহলে এক শহরের বিধান অপর শহরের ওপর প্রযোজ্য হবে না।'[৫৭৭]

হিদায়ার লেখক ইমাম মারগিনানি বলেন, 'ইমাম আবু ইউসুফের এ বক্তব্য নিকটবর্তী দুটি শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে দুই শহরের উদয়স্থল ভিন্ন হয় না। উদয়স্থল ভিন্ন হলে এক শহরের বিধান অপর শহরের ওপর প্রযোজ্য হবে না।'[৫৭৮]

মাওলানা আবদুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ হানাফি মাজহাবের কিছু প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান করে আবু ইউসুফের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। আবু ইউসুফ রাহ.-এর বক্তব্য দ্বারা এমন নিকটবর্তী দুটি শহর উদ্দেশ্য, যেগুলোর উদয়স্থল এক। দূরবর্তী শহরের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।'

এরপরও যদি কেউ বলেন, ইমাম আবু হানিফার মতে সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা ও ইদ পালন করতে হবে, তাহলে সেটা স্পষ্ট ভুল ও মিথ্যাচার। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন।

---

৫৭৬ *আল-ফাতাওয়াল কুবরা* : ১৬, মাখতুতা মাকতাবায়ে রেজা, রামপুর, হিন্দুস্থান, মাওলানা আবদুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ এ গ্রন্থের মাখতুতা সংগ্রহ করেছেন।

৫৭৭ *আল-ফাতাওয়া ওয়ালওয়ালিজিয়া* : ১/২৩৬।

৫৭৮ *আত-তাজনিসু ওয়াল মাজিদ* : ২/৪২৩।

দশম অধ্যায়

জিলহজ : করণীয় ও বর্জনীয়

আরবি বর্ষপঞ্জিকার শেষ মাস জিলহজ। এ মাসে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ আদায় করা হয়। মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ইদুল আজহা পালিত হয় এ মাসে। এ ছাড়া এ মাসের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও কিছু বিধান রয়েছে।

এক. জিলহজের প্রথম দশকের ফজিলত

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

শপথ প্রভাতের, শপথ ১০ রাতের। [সুরা ফাজর : ১-২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ১০ রাতের শপথ করেছেন। ইবনু আব্বাস রা.-সহ অনেক মুফাসসির বলেছেন, ১০ রাত দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজের প্রথম ১০ রাত।

আল্লামা ইবনু কাসির রাহ. বলেন, '১০ রাত দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজের প্রথম দশক; যেমনটা বলেছেন ইবনু আব্বাস, মুজাহিদসহ সালাফ ও খালাফের অনেক আলিম। কেউ কেউ বলেন, মুহাররামের প্রথম দশক। কেউ কেউ বলেন, রমজানের প্রথম দশক। ইবনু কাসির রাহ. বলেন, প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ।'[৫৭৯]

আল্লামা মাহমুদ আলুসি রাহ. বলেন, '১০ রাত দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজের প্রথম ১০ দিন; যেমনটা হাকিম নিশাপুরি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে সহিহ বলেছেন। এ ছাড়া জিলহজের প্রথম ১০ দিন হওয়ার কথা ইবনু আব্বাস রা. থেকে একটি জামাআত বর্ণনা করেছেন। এমনই বর্ণিত হয়েছে ইবনু জুবায়ের, মাসরুক, মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরিমা ও অন্যদের থেকে।'[৫৮০]

এ ছাড়া জিলহজের প্রথম দশকের ফজিলত সম্পর্কে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

---

[৫৭৯] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৪/২৬০।

[৫৮০] *রুহুল মাআনি* : ২০/৪২২, মাহমুদ আলুসি।

১. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

জিলহজের প্রথম দশকের আমলের মতো কোনো আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়। সাহাবিগণ বললেন, 'আল্লাহর রাস্তার জিহাদও'? তিনি বললেন, 'জিহাদও আল্লাহ কাছে অধিক প্রিয় নয়। তবে সে মানুষের কথা ভিন্ন, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। এরপর আর ফিরে আসে না।'[৫৮১]

২. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত;

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تُهَرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ.

আমি রাসুলের খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিলহজের প্রথম ১০ দিনের কথা উল্লেখ করি। তিনি বললেন, 'জিলহজের প্রথম দশকের আমলের মতো কোনো আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়।' তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আল্লাহর রাস্তার জিহাদও?' তিনি বললেন, 'জিহাদও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়। তবে সে মানুষের কথা ভিন্ন, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। এর পর আর ফিরে আসে না। এমনকি সে তার শরীরের রক্ত আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত করে দেয়।'[৫৮২]

ইমাম হায়সামি রাহ. হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, 'হাদিসটি ইমাম আহমাদ ও তাবরানি *আল-মুজামুল কাবিরে* দুটি সনদে উল্লেখ করেছেন। উভয়ের সনদ এক এবং বর্ণনাকারী সবাই সিকাহ।'[৫৮৩]

৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ. قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ

---

[৫৮১] *সহিহ বুখারি* : ৯২৬; *সহিহু ইবনি খুজায়মা* : ২৮৬৫।

[৫৮২] *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৫০৫।

[৫৮৩] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫৯০৫।

اللهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

জিলহজের প্রথম দশকের আমলের মতো কোনো আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আল্লাহর রাস্তার জিহাদও?' তিনি বললেন, 'জিহাদও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়। তবে সে মানুষের কথা ভিন্ন, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। এরপর আর ফিরে আসে না।'[৫৮৪]

৪. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ، وَالتَّكْبِيرَ، وَالتَّهْلِيلَ.

জিলহজের প্রথম ১০ দিনের চেয়ে অধিক মহান দিন এবং এ ১০ দিনের আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় আমল আল্লাহর কাছে আর নেই। সুতরাং তোমরা সে দিনগুলোতে বেশি বেশি তাসবি-তাহলিল, তাহমিদ ও তাকবির পড়ো।[৫৮৫]

৫. জাবির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ -يَعْنِي عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ- قِيلَ: وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ.

পৃথিবীর দিনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন জিলহজের প্রথম ১০ দিন—আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও না। তিনি বললেন, না। তবে যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে গিয়ে নিজের চেহারা ধুলোয় ধূসরিত করেছে, তার কথা ভিন্ন।[৫৮৬]

মোটকথা, জিলহজের প্রথম ১০ দিনের বিশেষ ফজিলত রয়েছে আল্লাহর কাছে। এ জন্য বান্দার উচিত, সে দিনগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগানো। নফল সালাত, রোজা, তাসবি-তাহলিলসহ জিকিরে বেশি সময় লাগানো।

দুই. আরাফার দিন : বরকতময় একটি দিন

জিলহজের ৯ তারিখ আরাফার দিন। শরিয়তে যেসব দিনের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, আরাফা সেগুলোর অন্যতম। এ দিন রাসুল ﷺ বিদায়হজের ভাষণে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামকে পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে দিন আল্লাহর পক্ষ

---

[৫৮৪] *আল-মুজামুল আওসাত* : ১৭৫৬।

[৫৮৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ৫৬৩২১।

[৫৮৬] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫৯৩৩।

থেকে আয়াত অবতীর্ণ হয়,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

আজ তোমাদের জন্য আমার দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়মাতকে পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করেছি। [সুরা মায়িদা : ৩]

রাসুল ﷺ বিদায়হজের ভাষণে আরাফার ময়দানে পুরো উম্মাহর ওপর দাওয়াতের মহান কাজ অর্পণ করেছিলেন।

১. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বিদায়হজের দিন বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مِرَارًا قَالَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّةٌ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ أَلَا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

'লোকসকল, আজ কোন দিন?' লোকেরা বলে, 'সম্মানিত দিন।' তিনি বলেন, 'এটা কোন শহর?' তারা বলে, 'সম্মানিত শহর।' তিনি বলেন, 'এটা কোন মাস?' লোকেরা বলে, 'সম্মানিত মাস।' রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমাদের পরস্পরের সম্পদ, রক্ত ও পাথেয় পরস্পরের জন্য এমনভাবে হারাম, যেমন এ দিনে, এই শহরে ও এই মাসে সবকিছু হারাম।' এ কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন।

এরপর মাথা আসমানের দিকে তুলে কয়েকবার বলেন, 'হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি?' ইবনু আব্বাস রা. বলেন, নিশ্চয় এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়ত।

এরপর বলেন, 'তোমাদের যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিতদের কাছে এ বার্তা পৌঁছিয়ে দেবে। আমার পরে তোমরা কাফিরদের মতো হয়ে যেয়ো না যে, একে অপরকে মারবে।'[৫৮৭]

আরাফার দিনে যেহেতু আল্লাহ দীনকে পরিপূর্ণ এবং আমাদের ওপর তাঁর

[৫৮৭] *মুসনাদু আহমাদ* : ২০৩৬; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৩৮৪২১।

নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করার ঘোষণা দিয়েছেন, এ জন্য এ দিনটির গুরুত্ব ইসলামে অবশ্যই রয়েছে। এ ছাড়া কিছু কিছু বর্ণা থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আরাফার দিনের শপথ করেছেন। সুরা বুরুজের তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ 'শাহিদ ও মাশহুদের' শপথ করেছেন। 'শাহিদ ও মাশহুদ' দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

اليَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ القِيَامَةِ، وَاليَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلاَ غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللهَ بِخَيْرٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ، وَلاَ يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ.

প্রতিশ্রুত দিন দ্বারা কিয়ামতের দিন, মাশহুদ দ্বারা আরাফার দিন এবং শাহিদ দ্বারা জুমুআর দিন উদ্দেশ্য। এই (জুমুআর) দিনের চেয়ে উত্তম কোনো দিন নেই, যার ওপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোনো মুমিন বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কোনো কল্যাণ কামনা করে, তবে আল্লাহ তা কবুল করেন। কোনো বিষয়ে যদি সে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়, তবে তিনি তা থেকে তাক পানাহ দেন।[৫৮৮]

ইমাম তিরমিজি রাহ. হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'বর্ণনাটি হাসান ও গারিব। মুসা ইবনু উবায়দার সনদ ছাড়া অন্য কোনো সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আর মুসা ইবনু উবায়দাকে ইয়াহইয়া ইবনু সায়িদসহ কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন।'

৩. আবু মালিক আশআরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الشَّاهِدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّ الْمَشْهُودَ يَوْمُ عَرَفَةَ،

ইয়াওমুল মাওউদ দ্বারা কিয়ামতের দিন, শাহিদ দ্বারা জুমুআর দিন; আর ইয়াউমুল মাশহুদ দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য।[৫৮৯]

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবি রাহ. বলেন, 'শাহিদ ও মাশহুদ দ্বারা কী উদ্দেশ্য—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আলি, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমর ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; "শাহিদ" দ্বারা উদ্দেশ্য জুমুআর দিন ও "মাশহুদ" দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফার দিন।'[৫৯০]

এ ছাড়া কিছু কিছু বর্ণনায় আছে, সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আরাফার দিন।

---

[৫৮৮] *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৩৩৯।

[৫৮৯] *আল-মুজামুল কাবির* : ৩/২৯৮, তাবরানি।

[৫৯০] *তাফসিরু কুরতুবি* : ১৯/২৮৩।

৪. জাবির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُنَّ أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: هُنَّ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ جَاءُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرُ عِتْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠতম দিনের মধ্যে অন্যতম জিলহজের প্রথম ১০ দিন। এক লোক জিজ্ঞেস করল, 'আল্লাহর রাসুল, এ দিনগুলো উত্তম নাকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের দিনগুলো উত্তম?' তিনি বললেন, 'জিহাদের দিনগুলো থেকেও এ দিনগুলো উত্তম।'

এরপর রাসুল ﷺ বলেন, শ্রেষ্ঠতম দিনের মধ্যে আল্লাহর কাছে আরাফাও অন্যতম। এ দিন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। দুনিয়াবাসী সম্পর্কে আসমানবাসীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'আমার বান্দাদের দেখো, এলোকেশী চুল, ধুলোমলিন চেহারায় তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে। তারা আমার রহমতের আশা করে এবং শাস্তি থেকে বাঁচতে চায়।' আরাফার দিনের মতো এত পরিমাণ জাহান্নামিকে আর কোনোদিন মুক্তি দেওয়া হয় না।[৫৯১]

৫. ইবনু মানদা রাহ. *কিতাবুত তাওহিদে* হাদিসটি উল্লেখ করেছেন,

আরাফার দিন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। দুনিয়াবাসী সম্পর্কে আসমানবাসীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'আমার বান্দাদের দেখো, এলোকেশী চুল, ধুলোমলিন চেহারায় তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' তখন ফেরেশতারা বলেন, 'হে আল্লাহ, অমুক তো পাপী?' আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' আরাফার দিনের মতো এত অধিকসংখ্যক জাহান্নামিকে আর কোনোদিন মুক্তি দেওয়া হয় না।[৫৯২]

ইবনু মানদা রাহ. হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, 'হাদিসটি হাসান ও মুত্তাসিল।'

---

[৫৯১] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩৮৫৩।

[৫৯২] *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ৩৭৭, ইবনু রজব।

১. আরাফার রোজার ফজিলত

আরাফার দিনের অন্যতম আমল হলো সে দিন রোজা রাখা। এ দিনের রোজার ফজিলত একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

১. আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন,

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ.

রাসুল ﷺ-কে আরাফার দিনের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আরাফার দিনের রোজা পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের কাফফারা হয়ে যায়।'[৫৯৩]

২. হাদিসটি *নাসায়ি* ও *আবু দাউদে* বর্ণিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থে হাদিসের বাক্য হলো,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

আরাফার দিনের রোজা—আমার ধারণা অনুযায়ী—আল্লাহর কাছে পূর্বের ও পরের এক বছরের কাফফারা হয়ে যায়।[৫৯৪]

৩. আতা খোরাসানি বর্ণনা করেন,

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَالْمَاءُ يُرَشُّ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفْطِرِي، فَقَالَتْ: أُفْطِرُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ الْعَامَ الَّذِي قَبْلَهُ.

আবদুর রাহমান ইবনু আবি বকর রা. আয়েশা রা.-এর ঘরে আরাফার দিন প্রবেশ করেন। আয়েশা রা. তখন রোজা ছিলেন। তাঁর পাশে পানি ছিল। আবদুর রাহমান বললেন, 'খাও'। তিনি বললেন, 'তুমি খাও। আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আরাফার দিনের রোজা পূর্বের এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।'[৫৯৫]

৪. সাহল ইবনু সাআদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ.

যে আরাফার দিনে রোজা রাখে, তার ধারাবাহিক দুই বছরের গুনাহ ক্ষমা

---

[৫৯৩] *সহিহ মুসলিম* : ১১৬২।

[৫৯৪] *সুনানুত তিরমিজি* : ৭৪৯।

[৫৯৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪৯৭০।

করে দেওয়া হয়।[৫৯৬]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'ইমাম আবু ইয়ালা ও তাবরানি রাহ. *আল-মুজামুল কাবিরে* হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। আবু ইয়ালার বর্ণনাকারী সবাই সিকাহ।'[৫৯৭]

৫. আবু সায়িদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ خَلْفَهُ.

যে আরাফার দিনে রোজা রাখবে, তার পেছনের ও সামনের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৫৯৮]

৬. প্রসিদ্ধ তাবিয়ি মাসরুক রাহ. বর্ণনা করেন,

أنه دخل على عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا يَوْم عَرَفَة فَقَالَ اسقوني فَقَالَت عَائِشَة يَا غُلَام اسْقِهِ عسلا ثمَّ قَالَت وَمَا أَنْت بصائم يَا مَسْرُوق قَالَ لَا إِنِّي أَخَاف أَن يكون يَوْم الْأَضْحَى فَقَالَت عَائِشَة لَيْسَ ذَلِك إِنَّمَا عَرَفَة يَوْم يعرف الإِمَام وَيَوْم النَّحْر يَوْم ينْحَر الإِمَام أوما سَمِعت يَا مَسْرُوق أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يعدله بِأَلف يَوْم.

তিনি আয়েশার ঘরে আরাফার দিনে প্রবেশ করে বলেন, 'আমাকে কিছু পান করান।' আয়েশা রা. তখন গোলামকে বলেন, 'তাকে মধু পান করাও।' এরপর তাকে বলেন, 'মাসরুক, তুমি আজকে রোজা রাখোনি?' তিনি বলেন, 'না, আমি আশঙ্কা করেছি, আজ কুরবানির দিন।' আয়েশা রা. বললেন, 'বিষয়টি এমন নয়। আজকে আরাফা। ইমাম চিনবেন। আর কুরবানির দিন ইমাম কুরবানি করবেন। মাসরুক, তুমি কি শুনোনি রাসুল ﷺ আরাফার দিনকে ১ হাজার দিনের মতো বলেছেন?'[৫৯৯]

৭. সায়িদ ইবনু জুবায়ের বর্ণনা করেন,

سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ، يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَعْدِلُهُ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ.

---

[৫৯৬] *মুসনাদু আবি ইয়ালা আল-মাওসিলি* : ৭৫৪৮।

[৫৯৭] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫১৪১।

[৫৯৮] *আল-মুজামুল কাবির* : ৮, তাবরানি।

[৫৯৯] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ১৫২১, মুনজিরি। ইমাম মুনজিরি রাহ. হাদিসকে 'হাসান' বলেছেন।

জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু উমরের কাছে আরাফার দিনের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'রাসুলের সঙ্গে আমরা আশুরার রোজাকে দুই বছরের রোজা মনে করতাম।'[৬০০]

এ ছাড়া আশুরার দিন রোজা রাখার ফজিলত সম্পর্কে আরও কিছু বর্ণনা আছে। সব হাদিসের মূলকথা হচ্ছে, আশুরার দিন রোজা রাখলে আল্লাহ পূর্বের ও পরের এক বছরের সগিরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ আমাদের আশুরার দিন রোজা রাখার তাওফিক দান করুন।

২. আরাফার রোজা সৌদির সঙ্গে মিলিয়ে, নাকি বাংলাদেশের ৯ তারিখে রাখবেন

আরাফার রোজা সৌদি আরবের সঙ্গে মিলিয়ে রাখার কথা ইদানীং খুব জোরেশোরে কেউ কেউ প্রচার করছেন। কেউ ইনিয়ে-বিনিয়ে সেটা প্রচার করছেন। তাদের দাবি অনুযায়ী সৌদি আরবে যে দিন হাজিগণ আরাফার মাঠে অবস্থান করবেন, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাদেশেও রোজা রাখা হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ কিছু দিনকে সম্মানিত করেছেন। সে দিনের বিশেষ কিছু আমল দিয়েছেন। আশুরা, আরাফা এর অন্যতম।

আশুরার দিন মুহাররামের ১০ তারিখ। এ তারিখে রোজা রাখার ফজিলতের কথা রাসুল ﷺ বলেছেন; আর মুহাররামের ১০ তারিখ পুরো পৃথিবীতে একই দিনে হয় না।

সৌদি আরবে যে দিন ১০ মুহাররাম, বাংলাদেশে সে দিন ৯ মুহাররাম হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কোনো শায়খই সৌদির সঙ্গে মিলিয়ে আশুরার রোজা রাখেন না; অথচ আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, আজ সৌদিতে আশুরার দিন অতিবাহিত হচ্ছে। তবে এখন কেউ কেউ রাখতে পারেন!

এর কারণ, তারিখের সম্পর্ক চাঁদের সঙ্গে। আর চাঁদের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ হলো. প্রত্যেকেই তাদের উদয়স্থলে চাঁদ দেখে চাঁদের তারিখ হিসাবে রোজা রাখবেন। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

১. কুরাইব রা. বর্ণনা করেন,

بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ

---

[৬০০] *আল-মুজামুল আওসাত* : ৭৫১।

الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ -رضى الله عنهما- ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

আমার মালিক একবার আমাকে মুআবিয়া রা.-এর কাছে শামে পাঠান। আমি আমার প্রয়োজন যখন শেষ করি, এমতাবস্থায় রমজান চলে এল। আমরা শামে জুমুআর রাতে চাঁদ দেখি। মাসের শেষ দিকে আমি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি। তখন ইবনু আব্বাস রা. আমাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি, 'আমরা জুমুআর রাতে চাঁদ দেখেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি নিজে দেখেছ?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি এবং লোকেরা দেখে রোজা রেখেছে। এমনকি মুআবিয়াও রোজা রেখেছেন।' তখন ইবনু আব্বাস বলেন, 'কিন্তু আমরা চাঁদ দেখেছি শনিবারে। সুতরাং আমরা মাস ৩০ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অথবা ২৯ তারিখে চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা ছাড়ব না।' আমি তাঁকে বলি, 'আপনার জন্য কি মুআবিয়ার চাঁদ দেখা ও রোজা রাখা যথেষ্ট নয়?' তিনি বললেন, 'না, রাসুল ﷺ আমাদের এভাবে আমল করতে আদেশ দিয়েছেন।'[৬০১]

হাদিসে লক্ষ করুন, সিরিয়াবাসী চাঁদ দেখেছে মদিনার একদিন আগে, সে হিসেবে মদিনাবাসী নিশ্চিত প্রথম রোজা ভেঙেছে। কিন্তু ইবনু আব্বাস রা. বলেন, 'আমরা সিরিয়ার চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল নই; বরং আমরা ইদ করব মদিনার উদয়স্থলে চাঁদ দেখে।' এ হাদিস থেকে স্পষ্ট হলো, সৌদি আরবে চাঁদ দেখার কারণে বাংলাদেশে কোনো বিধান আরোপিত হবে না; বরং বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ দেখা যেতে হবে।

২. এবার আরাফার রোজা প্রসঙ্গে একটু লক্ষ করি, রাসুল ﷺ বলেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

আরাফার দিনে রোজা রাখলে আল্লাহ তাআলা পূর্বের ও সামনের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেন।[৬০২]

---

[৬০১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১০৮৭; *সুনানুত তিরমিজি* : ২৩৩২।

[৬০২] *সহিহ মুসলিম* : ২৩১৭।

আরাফার রোজার ফজিলত ও আশুরার ফজিলতের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ একই ধরনের শব্দচয়ন করেছেন। আশুরার ক্ষেত্রে তারিখের হিসাব করলে আরাফার ক্ষেত্রে কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে এড়িয়ে যেতে চান।

৩. আরাফার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর আরেকটি হাদিস লক্ষ করুন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ.

রাসুল ﷺ জিলহজের ৯ তারিখ তথা আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোজা রাখতেন। মাসের প্রথম সোমবার, তারপর বৃহস্পতিবার এবং তার পরবর্তী বৃহস্পতিবার।[৬০৩]

এ হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলেন, 'রাসুল ﷺ যখন ইহরাম অবস্থায় থাকতেন না, তখন ৯ তারিখ রোজা রাখতেন। আরাফার ময়দানে থাকলে রোজা রাখতেন না।'[৬০৪]

এ হাদিস থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি, রাসুল ﷺ জিলহজের ৯ তারিখে রোজা রাখতেন। এখান থেকে সহজেই অনুমেয় যে, আমরাও আমাদের হিসাবে ৯ তারিখে রোজা রাখব।

৪. রাসুল ﷺ-এর আরেকটি হাদিস লক্ষ করুন। জাবির রা. বর্ণনা করেন,

وَكَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَيَقْطَعُهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

রাসুল ﷺ আরাফার দিনের ফজর থেকে আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত তাকবির বলতেন।[৬০৫]

আলি রা. থেকেও হাসান সনদে *কিতাবুল আসারে* এ মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের দেশের যে-সকল শায়খ যুক্তি দিয়ে সৌদির সঙ্গে মিলিয়ে আরাফার রোজা রাখেন, তারা কিন্তু সৌদির সঙ্গে মিলিয়ে আরাফার দিন থেকে তাকবিরে তাশরিকের আমল শুরু করেন না। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

৩. আরাফার দিন আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী বেশি বেশি দেওয়া

আল্লাহ তাআলা আশুরার দিনে ইসলামকে পরিপূর্ণ দীন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

[৬০৩] *সুনানু নাসায়ি* : ২৪১৭।

[৬০৪] *ইসলাম ওয়েব।*

[৬০৫] *আল-মুসতাদরাক* : ১১১১।

আর ইসলামের মূল কথার মধ্যে অন্যতম হলো, আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী দেওয়া। এ জন্য বান্দা এ দিন বেশি বেশি শাহাদাতের কালিমাগুলো পড়বে। নবিজিও এ দিন এগুলো বেশি বেশি পড়তেন।

১. ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

রাসুল ﷺ আরাফার দিনে এ দুআ বেশি পড়তেন—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, বিইয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির'—অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব ও যাবতীয় প্রশংসা তাঁর জন্য। সব কল্যাণ তাঁর কাছে। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[৬০৬]

২. ইমাম তিরমিজি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের বক্তব্য হলো,

خَيْرُ الدُّعاءِ دعاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ ما قُلْتُ أنا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আরাফার দিনের সর্বোত্তম দুআ, যে দুআ আমি ও আমার পূর্বের সকল নবি পড়েছেন, সেটা হচ্ছে—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, বিইয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির'—অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব ও যাবতীয় প্রশংসা তাঁর জন্য। সব কল্যাণ তাঁর কাছে। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[৬০৭]

হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম তিরমিজি বলেন, 'এই সনদে হাদিসটি গারিব। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হামমাদ ইবনু আবি হুমায়দ হাদিসবেত্তাদের কাছে শক্তিশালী নন।'

৩. আলি রা. বলেন,

ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة فأكثر فيه أن تقول: اللَّهُمَّ أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. فإنه عامة دعائي اليوم.

---

[৬০৬] *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৯৬১।

[৬০৭] *সুনানুত তিরমিজি* : ৪৫৮৫।

প্রত্যেক দিন আল্লাহ জাহান্নামিদের মুক্তি দেন। তবে আরাফার দিন সবচেয়ে বেশি জাহান্নামিকে মুক্তি দেন। এ জন্য তোমরা সে দিন এই দুআ বেশি বেশি পড়বে— 'হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করো। আমার জন্য হালাল রিজিক প্রশস্ত করো। জিন ও মানুষের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো।'[৬০৮]

৪. আরাফার দিনেও অহংকারীদের ক্ষমা নেই

১. জাবির রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

ما يري يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة من يوم عرفة لا يغفر الله فيه لمختال.

আরাফার দিনে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জাহান্নামিদের মুক্তি দেন। তবে আল্লাহ সে দিন অহংকারীদের ক্ষমা করেন না।[৬০৯]

২. ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

كَانَ فُلانٌ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ الْفَتَى يُلاحِظُ النِّسَاءَ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ مِرَارًا، قَالَ: وَجَعَلَ الْفَتَى يُلاحِظُ إِلَيْهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ابْنَ أَخِي، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ، وَلِسَانَهُ، غُفِرَ لَهُ.

আরাফার দিনে ফজল ইবনু আব্বাস রা. রাসুলের পেছনে ছিলেন। ফজল বার বার মহিলাদের দিকে তাকাতে লাগলেন; আর রাসুল ﷺ পেছন থেকে বার বার তার চেহারা ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'ভাতিজা, আজকের দিনে যে তার চোখ, কান ও জবান নিয়ন্ত্রণে রাখবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[৬১০]

মোটকথা, আশুরার দিন আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জাহান্নামিদের মুক্তি দিয়ে থাকেন। এ জন্য এ দিন বেশি বেশি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তির দুআ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দিন।

তিন. তাকবিরে তাশরিক : জিলহজের অন্যতম আমল

জিলহজের বিশেষ আমলের মধ্যে অন্যতম হলো তাকবিরে তাশরিক। আরাফার দিন

---

৬০৮ *লাতায়িফুল মাআরিফ* : ৩৮০।

৬০৯ প্রাগুক্ত : ৩৮০।

৬১০ *মুসনাদু আহমাদ* : ৩০৪১।

তথা ৯ তারিখ ফজরের পর থেকে নিয়ে আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন তথা ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর তাকবিরে তাশরিক পড়তে হবে।

তাকবিরে তাশরিকের পটভূমি সম্পর্কে *সহিহ বুখারির* ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহ. বলেন, 'ইবরাহিম আ. যখন স্বীয় পুত্র ইসমাইল আ.-কে জবাইয়ের উদ্দেশ্যে গলায় ছুরি রাখেন, এদিকে আল্লাহর নির্দেশে জিবরিল আ. আসমান থেকে একটি দুম্বা নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেন; কিন্তু জিবরিল আ.-এর আশঙ্কা ছিল, তিনি দুনিয়াতে পৌঁছার আগেই ইবরাহিম আ. জবাইপর্ব সমাপ্ত করে বসবেন। ফলে তিনি আসমান থেকে উঁচু আওয়াজে বলে ওঠেন—"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।" ইবরাহিম আ. আওয়াজ শুনে আসমানের দিকে নজর ফেরাতেই দেখতে পান জিবরিল আ. একটি দুম্বা নিয়ে আগমন করছেন। ফলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।" পিতার কণ্ঠে এই কালিমা শুনতেই ইসমাইল আ. উচ্চারণ করেন—"আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।" একজন ফেরেশতা আর দুজন প্রিয় নবির এ বাক্যমালা আল্লাহর খুব পছন্দ হয়। তাই কিয়ামত পর্যন্ত এই বাক্যমালা আইয়ামে তাশরিকে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর পড়া ওয়াজিব করে দিয়েছেন।'[611]

প্রত্যেক মুকিম, মুসাফির, গ্রামবাসী, শহরবাসী—জামাআতে বা একাকী সালাত পড়লে নামাজান্তে তাকবিরে তাশরিক পড়া ওয়াজিব।

প্রথমে তাকবিরে তাশরিক ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত, এ বিষয়ের দলিল তুলে ধরব। তারপর অন্য বিষয়ে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু হানিফার মতে, ১২ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলার সময়। ইমাম আবু হানিফা রাহ. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে, ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলার সময়। হানাফি মাজহাবে এ মাসাআলায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর মতের ওপর ফাতওয়া। এ জন্য এখানে শুধু গ্রহণযোগ্য মতের দলিল উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. আলি রা. থেকে বর্ণিত;

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ.

---

[৬১১] *ফাতাওয়ায়ে শামি* : ২/১৭৮; *ইনায়া শারহুল হিদায়া* : ১/৪৬৪।

তিনি আরাফার দিনের ফজরের পর থেকে নিয়ে আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন তথা ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলতেন।[৬১২]

২. হাদিসটি হাকিম নিশাপুরি রাহ. *আল-মুসতাদরাকে* এভাবে উল্লেখ করেছেন,

كَانَ عَلِيٌّ «يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ.

আলি রা. আরাফার দিন ফজরের পর থেকে তাকবিরে তাশরিক পড়তেন। আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক পড়তেন।[৬১৩]

হাকিম নিশাপুরি রাহ. হাদিসকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম জাহাবি তাঁর বক্তব্যের ওপর কোনো আপত্তি করেননি।

৩. উবায়েদ ইবনু উমায়ের বলেন,

উমর রা. আরাফার দিনের ফজর থেকে নিয়ে আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন তথা ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলতেন।[৬১৪]

হাকিম নিশাপুরি রাহ. এটিকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম জাহাবি সমর্থন করেছেন।

৪. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত;

তিনি আরাফার দিনের ফজর থেকে নিয়ে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলতেন।[৬১৫]

হাকিম নিশাপুরি রাহ. এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম জাহাবি সমর্থন করেছেন।

৫. উবায়েদ ইবনু উমায়ের বর্ণনা করেন;

ইবনু মাসউদ রা. আমাদের কাছে এলেন। তিনি আরাফার দিন ফজর থেকে আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন তথা ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলতেন।[৬১৬]

---

[৬১২] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৫৬৭৭।

[৬১৩] *আল-মুসতাদরাক* : ১১১৩।

[৬১৪] প্রাগুক্ত : ১১১২।

[৬১৫] প্রাগুক্ত : ১১১৪।

[৬১৬] প্রাগুক্ত : ১১১৫।

এ হাদিসকেও হাকিম নিশাপুরি সহিহ বলেছেন ও ইমাম জাহাবি সমর্থন করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে এর বিপরীতমুখী বর্ণনা রয়েছে। তবে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু মাসউদ রা. ১২ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলতেন। ইমাম আবু হানিফা রাহ. এ ক্ষেত্রে ইবনু মাসউদের মত গ্রহণ করেছেন।

৬. আসওয়াদ রা. বর্ণনা করেন;

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. আরাফার দিন ফজর থেকে কুরবানি শেষ দিন তথা ১২ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলতেন।[৬১৭]

৭. হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন,

তাশরিকের ব্যাপারে রাসুল ﷺ থেকে কোনো হাদিস প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে সাহাবিদের থেকে আলি ও ইবনু মাসউদ রা. থেকে সহিহ সনদে প্রমাণিত যে, তারা আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলতেন।’[৬১৮]

৮. আহওয়াস রা. বর্ণনা করেন;

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. আইয়ামে তাশরিকের সময় এই দুআ পড়তেন, ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।’[৬১৯]

তাকবিরে তাশরিক রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত না হলেও একাধিক সাহাবি থেকে সহিহসূত্রে প্রমাণিত। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. বলেন, ‘তাকবিরে তাশরিক বিধিবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আলিমগণ একমত। তবে এ বিষয়ে কোনো মারফু হাদিস নেই। শুধু সাহাবি ও তাঁদের পরবর্তীদের থেকে কিছু আসার বর্ণিত হয়েছে এবং এরই ওপর মুসলমানদের আমল রয়েছে।’[৬২০]

এরপর লেখেন, ‘অন্য কিছু হুকুমের সঙ্গে এই হুকুমও প্রমাণিত করে, যেসব বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে, তার মধ্যে কিছু বিষয় এমনও আছে, যে সম্পর্কে আমাদের কাছে রাসুল ﷺ থেকে স্পষ্ট কোনো নস তথা বক্তব্য বর্ণিত হয়ে আসেনি; বরং এ বিষয়ে শুধু আমলে মুতাওয়ারাসের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এ জন্য

---

[৬১৭] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা*: ৫৬৭৯।

[৬১৮] *ফাতহুল বারি*: ৬/২৬৫।

[৬১৯] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা*: ৫৬৭৯।

[৬২০] *ফাতহুল বারি*: ৬/১২৪, ইবনু রজব।

আরাফার দিন ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক বলতে হবে। তবে পাড়াগাঁয়ের অধিবাসীদের ওপর তাকবিরে তাশরিক ওয়াজিব নয়।'

৯. আলি রা. থেকে বর্ণিত;

لاَ تَشْرِيقَ، وَلاَ جُمُعَةَ إِلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.

শহর ছাড়া অন্য কোথাও জুমুআ ও তাশরিক নেই।[৬২১]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'ইমাম আবদুর রাজ্জাক তাঁর *মুসান্নাফে* আলি রা. থেকে মাওকুফসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসের সনদ সহিহ।'[৬২২]

চার. কুরবানির ইদ : ত্যাগের অনুপম নিদর্শন

জিলহজের আরেকটি বিশেষ আমল কুরবানির ইদ। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য দুটি ইদ নির্ধারণ করেছেন—একটি ইদুল ফিতর, অপরটি ইদুল আজহা। ইদুল ফিতর আমরা পালন করি দীর্ঘ এক মাস রমজানের রোজা রাখার পর শাওয়ালের প্রথম তারিখে; আর ইদুল আজহা জিলহজের ১০ তারিখে।

ইদুল আজহার ইতিহাস প্রায় সবারই জানা। ইবরাহিম আ.-এর বৃদ্ধ বয়সে ছেলে ইসমাইল আ.-এর জন্ম হয়। পরম আদরের ছেলে শিশু ইসমাইল যখন মোটামুটি কথা বলা ও বোঝার বয়সে উপনীত হন, তখন ইবরাহিম আ.-কে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন ছেলে ইসমাইল আ.-কে যেন আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করেন। ইবরাহিম আ. সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আল্লাহর আদেশ পালনার্থে ছেলে ইসমাইলের গলায় যখন ছুরি চালিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ জান্নাত থেকে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দেন। ফলে ইসমাইলের জায়গায় দুম্বা কুরবানি হয়। এখান থেকে কুরবানি শুরু।

আইয়ামে নাহর তথা জিলহজের ১০, ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যে যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তাঁদের ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

---

৬২১ *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৫১০৬।

৬২২ *আদ-দিরায়া ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়া* : ১/২১৪।

হে নবি, আপনি আপনার প্রভুর নামে সালাত পড়ুন ও কুরবানি করুন। [সুরা কাওসার : ২]

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. এ আয়াতের তাফসিরে লেখেন, 'হাসান বলেন, সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরবানির ইদের সালাত; আর নাহর দ্বারা উদ্দেশ্য পশু কুরবানি।'

আতা ও মুজাহিদ রাহ. বলেন, 'এখানে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য আপনি ফজরের সালাত পড়ুন মুজদালিফায় এবং কুরবানি করুন মিনায়।'

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. বলেন, 'এখান থেকে দুটি জিনিস প্রমাণিত হলো—একটি ইদের সালাত ওয়াজিব, অপরটি কুরবানি করা ওয়াজিব।'[৬২৩]

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

যার সামর্থ্য আছে কিন্তু কুরবানি করল না, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকটবর্তী না হয়।[৬২৪]

হাদিসটি সম্পর্কে হাকিম নিশাপুরি রাহ. বলেন, 'হাদিসের সনদ সহিহ। ইমাম বুখারি ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাদের গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেননি।' ইমাম জাহাবি রাহ. তাঁর *তালখিসে* হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, কুরবানি ওয়াজিব। যদি ওয়াজিব না হতো, তাহলে রাসুল ﷺ এত কঠোর হুঁশিয়ারি দিতেন না, শাস্তির কথা বলতেন না। এ ছাড়া রাসুল ﷺ সর্বদা কুরবানি করতেন। যদি কুরবানি ওয়াজিব না হতো, তাহলে তিনি নিয়মিত এ আমল করতেন না।

২. ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন;

أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي كُلَّ سَنَةٍ.

রাসুল ﷺ মদিনায় ১০ বছর অবস্থান করেন এবং প্রত্যেক বছর কুরবানি করেছেন।[৬২৫]

ইমাম তিরমিজি রাহ. হাদিসটি 'হাসান' বলেছেন।

---

[৬২৩] *আহকামুল কুরআন* : ৩/৪৭৫, জাসসাস।

[৬২৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮২৭৩; *আল-মুসতাদরাক* : ৭৫৬৫।

[৬২৫] *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫০৭।

১. কুরবানির ফজিলত

কুরবানির অনেক ফজিলত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেছেন,

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا.

কুরবানির দিনে রক্ত প্রবাহিত করা ছাড়া আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় কোনো ইবাদত নেই। কুরবানির পশু কিয়মাতের দিন শিং, চুল ও নখ নিয়ে আসবে। জমিনে পশুর রক্ত পড়ার আগে সেটা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়।[৬২৬]

হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন, 'এ সম্পর্কে ইমরান ইবনু হুসাইন ও জায়েদ ইবনু আরকাম রা. থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিজি এ হাদিসকে হাসান ও গারিব বলেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, কুরবানিদাতাকে পশুর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে সাওয়াব প্রদান করা হবে।'

ইমাম তিরমিজি রাহ. যে হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সে হাদিস ইমাম আহমাদ রাহ.-সহ অনেকে বর্ণনা করেছেন।

২. জায়েদ ইবনু আরকাম বর্ণনা করেন; সাহাবিগণ রাসুল ﷺ-কে উদ্দেশ করে বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ». قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ.

'আল্লাহর রাসুল, কুরবানি কী?' তিনি বললেন, 'তোমাদের পিতা ইবরাহিম আ.-এর সুন্নাত।' সাহাবিগণ বললেন, 'তাতে আমাদের জন্য কী রয়েছে?' তিনি বললেন, 'প্রতিটি পশমের বিনিময়ে সাওয়াব রয়েছে।' সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোট পশমের ব্যাপারে কী হবে'? তিনি বলেন, 'প্রত্যেকটি পশমের বিনিময় আল্লাহ নেকি প্রদান করবেন'।[৬২৭]

---

[৬২৬] প্রাগুক্ত : ১৪৯৩।

[৬২৭] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯২৮৩; *ইবনু মাজাহ* : ৩১২৭।

হাদিসটি সম্পর্কে হাকিম নিশাপুরি রাহ. বলেন, 'হাদিসটির সনদ সহিহ। বুখারি ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। যদিও তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।'[৬২৮]

ইমাম জাহাবি রাহ. হাকিম নিশাপুরির বক্তব্য সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, 'হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আয়িজুল্লাহকে ইমাম আবু হাতিম মুনকারুল হাদিস বলেছেন।'

৩. ইমরান ইবনু হুসাইন রা. বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ তাঁর মেয়ে ফাতিমাকে উদ্দেশ করে বলেন,

يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا، فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا أَنْ يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَنَا خَاصَّةً أَهْلَ الْبَيْتِ، أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ.

ফাতিমা, তুমি তোমার কুরবানির পশুর কাছে উপস্থিত থাকো। কেননা, কুরবানির পশুর রক্তের প্রথম ফোঁটা প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তোমার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেবেন। ফাতিমা রা. বললেন, 'এটা কি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট, নাকি আমাদের ও মুসলমানদের জন্য?' রাসুল ﷺ বললেন, 'আমাদের ও মুসলমানদের জন্য।'[৬২৯]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি ইমাম বাজ্জার উল্লেখ করেছেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আতিয়া ইবনু কায়েস। তাঁর ব্যাপারে অনেক কথা রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে সিকাহও বলেছেন।'

মুনজিরিও এমন কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেন, 'আবুল কাসিম ইসফাহানি রাহ. আলি রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।'

৪. আবুল কাসিম ইসফাহানি বর্ণিত হাদিসের ভাষ্য ছিল এমন—

রাসুল ﷺ ফাতিমাকে বলেন, 'হে ফাতিমা, দাঁড়াও এবং কুরবানির পশুর কাছে উপস্থিত হও। কেননা, কুরবানির পশু থেকে প্রবাহিত প্রথম ফোঁটা রক্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। পশুর গোশত ও রক্তকে ৭০ গুণ বাড়িয়ে কিয়ামতের দিন পাল্লায় তোলা হবে।' আবু সায়িদ বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, এটা কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের সঙ্গে নির্দিষ্ট, নাকি সকল মুসলমানের জন্য?' তিনি বললেন, 'এটি বিশেষত আমার পরিবারের জন্য এবং ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের জন্য।'

---

[৬২৮] *আল-মুসতাদরাক* : ৩৪৬৭।

[৬২৯] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫৯৩৪।

ইমাম মুনজিরি রাহ. বলেন, 'আমাদের কোনো কোনো শায়খ আলি রা.-এর হাদিসকে 'হাসান' বলেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।'[৬৩০]

৫. এভাবে বিষয়টি ইমরান ইবনু হুসাইন রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন,

يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ عِمْرَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً فَأَهَلَّ ذَاكَ أَنْتُمْ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.

রাসুল ﷺ ফাতিমা রা.-কে উদ্দেশ করে বলেন, 'ফাতিমা, তুমি কুরবানির পশুর কাছে উপস্থিত হও এবং এ দুআটি পাঠ করো—নিশ্চয় আমার সালাত, কুরবানি, জীবন এবং মরণ আল্লাহর জন্য। তার কোনো শরিক নেই। আমি কুরবানির জন্য এটার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি মুসলমানদের দলভূক্ত। কেননা, কুরবানির পশুর প্রথম ফোঁটা রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তোমার সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।'

ইমরান বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, এটা কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের সঙ্গে নির্দিষ্ট, নাকি সকল মুসলমানের জন্য?' তিনি বললেন, 'এটা বিশেষত আমার পরিবারের জন্য এবং ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের জন্য।'

হাকিম নিশাপুরি রাহ. হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, 'হাদিসটির সনদ সহিহ। ইমাম বুখারি-মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ, তবে তাঁরা এটি উল্লেখ করেননি। এ ছাড়া এর পক্ষে আতিয়ার সূত্রে আবু সায়িদ খুদরির হাদিস রয়েছে।'

ইমাম জাহাবি রাহ. হাকিম নিশাপুরির বক্তব্য সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, 'হাদিসের বর্ণনাকারী আবু হামজা অধিক দুর্বল।'

৬. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، أَفْضَلَ مِنْ دَمٍ يُهَرَاقُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَحِمًا مَقْطُوعَةً تُوصَلُ.

কুরবানি দিন পশুর রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো ইবাদত আল্লাহর কাছে নেই। তবে কেউ যদি ছিন্ন হয়ে যাওয়া আত্মীয়তা আবারও

[৬৩০] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব*: ২/১০০, মুনজিরি।

স্থাপন করে, তাহলে ভিন্ন কথা।[৬৩১]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন, 'হাদিসের একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু হাসান আল খুশানি। তিনি দুর্বল। তবে একদল তাঁকে সিকাহ বলেছেন।'[৬৩২] প্রসিদ্ধ তাবিয়ি তাউস রাহ. থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।[৬৩৩]

২. কুরবানির রাতে বিশেষ সালাত ভিত্তিহীন

*বারো চান্দের ফজিলত*সহ এ ধরনের অনির্ভরযোগ্য কিছু গ্রন্থে কুরবানির রাতে বিশেষ পদ্ধতির সালাতের কথা উল্লেখ করে সেগুলোর ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম কথা, রাসুল ﷺ থেকে ইদুল আজহার রাতে বিশেষ কোনো সালাত প্রমাণিত নয়। এ-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো জাল। এ ধরনের একটি বর্ণনা হলো, আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

> مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النَّحْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب خمس عشرَة مرّة وَقل هُوَ اللهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مرّة وَقل أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ خَمْسَ عَشْرَةَ مرّة وَقل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، جَعَلَ اللهُ اسْمَهُ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَغَفَرَ لَهُ ذُنُوبَ السِّرِّ وَذُنُوبَ الْعَلانِيَةِ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ قَرَأَهَا حِجَّةً وَعُمْرَةً، وَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ سِتِّينَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى مَاتَ شَهِيدًا.
>
> যে কুরবানির ইদের রাতে দু-রাকআত সালাত পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে ১৫ বার সুরা ফাতিহা, ১৫ বার সুরা ইখলাস, ১৫ বার সুরা ফালাক ও ১৫ বার সুরা নাস পড়বে, এরপর সালাত শেষ করে তিনবার আয়াতুল কুরসি ও ১৫ বার ইসতিগফার পড়বে, আল্লাহ জান্নাতে তার নাম লিখে দেবেন। তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। এ ছাড়া প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে হজ ও উমরার সাওয়াব দেবেন। ৭০ জন দাস মুক্ত করার সাওয়াব দেবেন। সে যদি ওই সপ্তাহে মারা যায়, তাহলে সে শহিদের মর্যাদা পাবে।

---

[৬৩১] *আল-মুজামুল কাবির*: ১০৯৪৮।

[৬৩২] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ*: ৫৯৩৯।

[৬৩৩] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা*: ৮১৬২।

এটি জাল বর্ণনা। ইমাম ইবনুল জাওজি রাহ. বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেন, 'এ বর্ণনার সনদ সহিহ নয়। এর একজন বর্ণনাকারী কাসিম।' ইমাম আহমাদ বলেন, 'সে মুনকারুল হাদিস।' আরেকজন বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু গালিব, সে হাদিস জাল করত।'[৬৩৪] শাওকানি রাহ. বলেন, 'বর্ণনার সনদে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু গালিব নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, সে হাদিস জালকারী।'[৬৩৫]

মোটকথা, বর্ণনাটি জাল। রাসুলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্য এ রাতের বিশেষ সালাত আদায় থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. কুরবানির সঙ্গে আকিকা আদায় করা যাবে

সম্প্রতি এ মাসআলা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশে অনেকেই বলছেন, কুরবানির সঙ্গে আকিকা আদায় করার কথা সহিহ হাদিসে নেই। এ জন্য কুরবানির সঙ্গে আকিকা আদায় হবে না।

এখানে প্রথমেই বলে রাখি, কুরবানি ও আকিকা দুটি স্বতন্ত্র ইবাদত। এ জন্য দুটি আলাদাভাবে আদায় করা উত্তম। তবে কেউ যদি একসঙ্গে আদায় করে, তাহলে আদায় হয়ে যাবে। কেননা, উভয় ইবাদতের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন—আল্লাহর নৈকট্যলাভ। এ জন্য হাদিসে উভয় ইবাদতকে এক শব্দ 'نُسك' বলা হয়েছে। ফকিহগণ বলেছেন, কুরবানির পশুতে অন্যজন আকিকার নিয়তে শরিক হতে পারে; অথবা নিজের এক ভাগ দ্বারাও আকিকা আদায় করতে পারে।

১. এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি দেখুন,

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ قَالَ: لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، مَنْ وُلِدَ لَهُ مِنْكُمْ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

রাসুল ﷺ-কে আকিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'আমি অবাধ্যতা পছন্দ করি না। তোমাদের যার সন্তান হয়, সে যদি তার সন্তানের পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় করতে চায়, তাহলে যেন কুরবানি করে ফেলে। ছেলে হলে দুটি ছাগল; আর মেয়ে হলে একটি ছাগল দ্বারা।'[৬৩৬]

এখানে লক্ষণীয় বিষয়, রাসুল ﷺ আকিকাকে কুরবানি বলেছেন। বোঝা গেল,

---

[৬৩৪] *কিতাবুল মাওজুআত* : ২/১৩৪।

[৬৩৫] *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমুআ* : বর্ণনা নং-১১৩, শাওকানি।

[৬৩৬] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৮৪২।

উভয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সুতরাং উভয়টি একসঙ্গে আদায় করা যাবে। এ বিষয়ে ফকিহগণ কী বলেছেন, নিচে তা উল্লেখ করছি :

২. ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. বলেন, 'যখন প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর নৈকট্যলাভ, যদিও তাদের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন কেউ হজের হাদি, কেউ হজ্জে কিরানের পশু, কেউ কুরবানির নিয়ত করল, তাহলে সবার আদায় হয়ে যাবে। কেননা, সবার উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্যলাভ।'[৬৩৭]

আমরা দেখতে পেলাম, প্রত্যেকের কুরবানি ভিন্ন ভিন্ন, কেউ ওয়াজিব কুরবানি, কেউ হজ্জে কিরানের পশু, কেউ হজের হাদি—সবাই মিলে একই পশুতে অংশগ্রহণ করলে সবার কুরবানি আদায় হয়ে যাবে। কারণ ভিন্ন হলেও সবার উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্যলাভ; আর আকিকার উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য লাভ, এ জন্য কুরবানির সঙ্গে আকিকাও আদায় হবে।

৩. ইমাম সারাখসি রাহ. বলেন, 'একই পশুতে শরিক সবার উদ্দেশ্য হয়তো কুরবানি হবে; অথবা কারও অন্য কোনো ইবাদত উদ্দেশ্য হবে, সবার কুরবানি আদায় হয়ে যাবে।'[৬৩৮]

৪. ইমাম মালিকুল উলামা কাসানি রাহ. বলেন, 'যদি কেউ কুরবানির সঙ্গে আকিকার নিয়ত করে, তাহলে আদায় হয়ে যাবে। কেননা, আকিকা দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সন্তান দানের মাধ্যমে আল্লাহ তার ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য আকিকা করা হয়। এমনটি বলেছেন ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.।'[৬৩৯]

৫. ইমাম ইবনু কুদামা মাকদিসি রাহ. বলেন, 'অংশগ্রহণকারী—চাই ফরজ কুরবানি আদায়কারী হোক; অথবা অন্য কোনো ইবাদতের নিয়তে কুরবানিতে শরিক হোক, সবার আদায় হবে।'[৬৪০]

৬. *ফাতওয়া আলমগিরিতে* আছে, 'যদি কেউ কুরবানির সঙ্গে আকিকার ইচ্ছা করে, তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে।'[৬৪১]

৭. আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রাহ. লেখেন, 'এভাবে যদি কেউ কুরবানির

---

[৬৩৭] *শারহু মুখতাসারিত তাহাবি* : ৭/৩৫২।

[৬৩৮] *মাবসুত* : ১১/১৫।

[৬৩৯] *বাদায়িউস সানায়ি* : ৬/২৯১।

[৬৪০] *আল-মুগনি* : ১৩/১২৪, ইবনু কুদামা।

[৬৪১] *ফাতাওয়া আলমগিরি* : ৫/৩৫১।

সঙ্গে আকিকার ইচ্ছা করে, তাহলেও আদায় হয়ে যাবে। কেননা, আকিকাও আল্লাহর নৈকট্যলাভের একটি ইবাদত।'[৬৪২]

এ বিষয়ে আরও কিছু গ্রন্থ দেখা যেতে পারে : *ফাতাওয়ায়ে কাজিখান*, ৩/২৪৬, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ; *ফাতাওয়ায়ে বাজ্জাজিয়া*, ৩/১৫৭, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ; *ফাতহু বাবিল ইনায়া*, ৩/৭৭, এইচ. এম. সায়িদ কোম্পানি; *আল-মুহিতুল বুরহান*, ৮/৪৭৭, ইদারাতুল কুরআন; *তাবয়িনুল হাকায়িক*, ৬/৪৮৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া; *আল-জাওহারাতুন নাইয়িরা*, ২/৪৫১, আল-মাকতাবাতুল হাক্কানিয়া।

এখন যদি কেউ এর বিপরীতে মত পোষণ করে বলে, কুরবানির সঙ্গে আকিকা আদায় হবে না, তাহলে তাকে অবশ্যই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে হবে যে, রাসুল ﷺ বলেছেন কুরবানির সঙ্গে আকিকা আদায় হবে না। কেবল হাদিসে নেই, এই অজুহাতে যদি বলা হয়, তাহলে শরিয়তের বহু মাসআলা এমন আছে, যেগুলো হাদিসে নেই; মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে সমাধান দিয়েছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের ওই ভাইয়েরা কী বলবেন? আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

সমাপ্ত

---

[৬৪২] *ফাতাওয়া শামি* : ২/৩২১।

পাঠকের পাতা

কালান্তর প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

সিরাত

ক্র.	নাম	লেখক	মুদ্রিত মূল্য
১	সিরাতুন নবি সা. (তিন খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	১,৮০০
২	শ্রেষ্ঠমানব	শায়খ হারুন মুহাম্মাদ আজহারি রাহ.	৬০ ফিক্সড
৩	নবিজির যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	

খলিফাদের জীবনী

৪	আবু বকর সিদ্দিক রা.	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৬৯০
৫	উমর উবনুল খাত্তাব রা. (১ম খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৪৮০
৬	উমর উবনুল খাত্তাব রা. (শেষ খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৫২০
৭	উসমান ইবনু আফফান রা.	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৬৯০
৮	আলি ইবনু আবি তালিব রা. (১ম খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৬০০
৯	আলি ইবনু আবি তালিব রা. (শেষ খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৬০০
১০	হাসান ইবনু আলি রা.	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৬৪০
১১	হুসাইন ইবনু আলি রা.	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	২০০

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস

১২	মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	
১৩	আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	
১৪	আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	
১৫	উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৪৮০
১৬	উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস (শেষ খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	

ক্রুসেড বিশ্বকোষ

১৭	সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৮০০
১৮	জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	
১৯	সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি (১ম খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৪৭০
২০	সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি (২য় খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৪৭০
২১	আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ইতিহাস (২)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	
২২	মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	

২৩	উসমানি খিলাফতের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৪৩৫
২৪	উসমানি খিলাফতের ইতিহাস (শেষ খণ্ড)	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৪৩৫

সুলতান ও মনীষীদের জীবনী

২৫	শায়খ আবদুল কাদির জিলানি রাহ.	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	২০০
২৬	শায়খ ইমাম গাজালি রাহ.	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	১৮০
২৭	ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম রাহ.	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	২০০
২৮	সুলতান মালিকশাহ সেলজুকি	আসলাম রাহি	৩০০
২৯	দ্য লিজেন্ড : সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি	আসলাম রাহি	১০০
৩০	সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ	ইসমাইল রেহান	৩০০
৩১	দ্য প্যান্থার : সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স	ইমরান আহমাদ	২৭০
৩২	দ্য প্যান্থার : সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স	ইমরান আহমাদ	২৭০
৩৩	খাইরুদ্দিন বারবারুসা : সমুদ্র ঈগল	আসলাম রাহি	৩০০
৩৪	সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	৩২৫
৩৫	সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগির	ফাহাদ আবদুল্লাহ	৩০০
৩৬	সুলতান আবদুল হামিদ খান	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	২৩৪
৩৭	লায়ন অব দ্য ডেজার্ট : শহিদ উমর মুখতার	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	২৩০
৩৮	ক্যারিশম্যাটিক এরদোগান	ড. রাগিব সিরজানি	৩০০

ইতিহাস ও গবেষণা

৩৯	ফিলিস্তিন ও বায়তুল মাকদিসের ইতিহাস	আবু লুবাবা শাহ মানসুর	৩৬০
৪০	হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্মের ইতিহাস	ড. জিয়াউর রাহমান আজমি	২৩০
৪১	রেশমি রুমাল আন্দোলন	সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানি রাহ.	২৩০
৪২	আমেরিকা মুসলিমদের আবিষ্কার	মুসা আল হাফিজ	১৪০
৪৩	স্পেন টু আমেরিকা	আবু লুবাবা শাহ মানসুর	২৩০
৪৪	উসমানি খিলাফতের স্বর্ণকণিকা (১)	আইনুল হক কাসিমী	২২০
৪৫	সিলেটে বঙ্গবন্ধু	সৈয়দ আব্দুল্লাহ	৩০০

আকিদা, ফিতনা ও সমকালীন ভাবনা

৪৬	ইসলামি আকিদা (১)	আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রাহ.	৩৬০
৪৭	কুফর ও তাকফির	আলী হাসান উসামা	৩৮০
৪৮	জান্নাতের সবুজ পাখি	আলী হাসান উসামা	৩৮০
৪৯	মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী	আলী হাসান উসামা	২৮৪
৫০	ফিতনার বজ্রধ্বনি	আলী হাসান উসামা	২৩০

৫১	তাওহিদের মর্মকথা	ইবনু রজব হাম্বলি রাহ.	৯০
৫২	খারেজি	ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি	২৩০

রশীদ জামীল

৫৩	বিশ্বাসের বহুবচন	রশীদ জামীল	৩৪০
৫৪	আহাফি	রশীদ জামীল	২৬০
৫৫	মমাতি	রশীদ জামীল	২০০
৫৬	হুমুল্লাজিনা	রশীদ জামীল	২৩০
৫৭	ইলাইহিল ওয়াসিলা	রশীদ জামীল	২০০
৫৮	জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান	রশীদ জামীল	২২০
৫৯	পাগলের মাথা খারাপ	রশীদ জামীল	১৮০
৬০	কাচের দেয়াল	রশীদ জামীল	২০০
৬১	যে কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো	রশীদ জামীল	২২০
৬২	বিরাট ওয়াজ মাহফিল	রশীদ জামীল	২৩০
৬৩	সুখের মতো কান্না	রশীদ জামীল	২০০
৬৪	একটি স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা	রশীদ জামীল	২০০
৬৫	সেদিনও বসন্ত ছিল	রশীদ জামীল	১৮০
৬৬	মুমিনের নামাজ	রশীদ জামীল	৭৫ ফিক্সড

আত্মশুদ্ধি ও অন্যান্য

৬৭	বারো মাসের করণীয় বর্জনীয়	মুফতি রেজাউল কারীম আবরার	৩৫০
৬৮	দাজ্জাল : ফিতনা ও পর্যালোচনা	মুফতি রেজাউল কারীম আবরার	২০০
৬৯	উম্মাহর প্রতি আহ্বান	ড. শায়খ আলি তানতাবি রাহ.	২৫০
৭০	পারিবারিক কলহ ও প্রতিকার	আল্লামা তাকি উসমানি	১৬০
৭১	বিয়ে ও ডিভোর্স	ড. গওহার মুশতাক	১৮০
৭২	জীবন গড়ার কিছু কথা	নাজমুল ইসলাম কাসিমী	১১০
৭৩	বিস্ময়বালক হামমাদ সাফি	নাজমুল ইসলাম কাসিমী	২০০
৭৪	মাসাদিবুল কুরআন	মাওলানা ছাদিকুর রহমান	১৪০
৭৫	ইখলাস	ড. শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ	৮০
৭৬	উলামাচরিত	আবু বকর আজুররি বাগদাদি	১২০
৭৭	রাগ করবেন না	ড. আবদুর রহমান আরিফি	৫০
৭৮	জুমুআ-দিবসের বিধান	খতিব তাজুল ইসলাম	১০০
৭৯	বিবেকের জবানবন্দি	আল্লামা আমিন সফদর রাহ.	৩৫
৮০	বিপ্রতীপ (নাস্তিকদের যুক্তি খণ্ডন)	হাসান আনহার	১৪০

মানুষের কাজের সুবিধার্থে আল্লাহ তাআলা সময়কে দুভাগে ভাগ করেছেন। সময়ের একটি অংশকে আমরা দিন; আরেক অংশকে বলি রাত। দিন-রাতের আবর্তে ৭ দিনে হয় এক সপ্তাহ। ৩০ দিনে ১ মাস। ৩৬৫ দিনে ১ বছর। ১ বছরে মোট ১২ মাস।

আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে বিশেষ কিছু দিন আর রাতকে আমাদের জন্য সম্মানিত করে দিয়েছেন, যে দিন বা রাতের মর্যাদা তাঁর কাছে অন্যান্য দিন এবং রাত থেকে অনেক বেশি। যেমন : শবেকদর হাজার মাস থেকে উত্তম। আরাফার দিনের রোজা আগের ও পরের ২ বছরের গুনাহের (সগিরা) কাফফারা হয়ে যায়। কিছু মাসের বিশেষ আমল যেমনভাবে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের সমাজে কিছু মাসে এমন বহু আমল প্রচলিত, যেগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট; কুরআন-হাদিসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

বিশেষ কোনো মাস বা দিনের কোন ফজিলত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, কোনটা প্রমাণিত নয়; এ গ্রন্থ আপনাকে সে সম্পর্কে পথপ্রদর্শন করবে ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়ে লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। গ্রন্থটিতে প্রতিটি আয়াত, হাদিস, আসারের তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে, হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আমাদের প্রত্যেকের কাছে থাকা উচিত।

Kalantor Prokashoni

ISBN : 978-984-96590-8-2

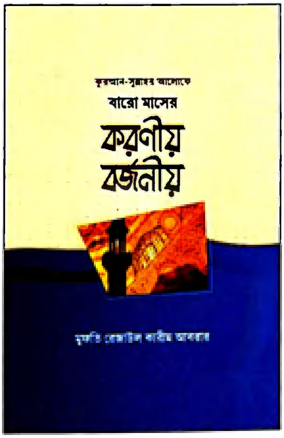

Baro Maser Koronio Borjonio
by Rezaul Karim Abrar
Kalantor Prokashoni
Price : ৳ ৫০০, US $ 15, UK £ 10
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ